অরণ্য-কুহেলী

শ্রীকালীপদ ঘটক

পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমতী তৃপ্তি দেবী
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ
মহালয়া
১৩৫৬

মূল্য চার টাকা

প্রকাশিকা—
শ্রীমতী তৃপ্তি দেবী
ভারত বুক এজেন্সি
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মুদ্রা
শ্রীগৌরচ
নিউ মহাম
৬৫।৭, ক
ক

সুধী সাহিত্যিক

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এম, এ, (ক্যান্টাব্)

শ্রীচরণকমলেষু

যে স্বপ্ন ছিলো মোর মানসের কুহেলিকাতে
আরণ্যকের অন্তরালে,
হে গুণি, তোমার রসিকচিত্ত-আলোকপাতে
সেই স্বপ্নের দীপ জ্বালালে।
রসের স্রষ্টা, রসিকবন্ধু, তোমার হাতে
দিলাম এ দীপ সমর্পিয়া ;
আমার মনের পুষ্পাঞ্জলি দিলাম সাথে,
দিলাম আমার মুগ্ধ হিয়া॥

স্নেহধন্য
কালীপদ

পূর্ববঙ্গ প্রকাশনী

মানুষের জীবনে প্রেম শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, পরমার্থ লাভের পথও। সভ্যতার আলোকে বা অসভ্যতার অন্ধকারে, নাগরিক বিলাসে বা আরণ্যক আবাসে প্রেম অবাধগতি; কিন্তু মানুষের আচারগত আইন আর হৃদয়গত বৃত্তিতে যে বিরোধ, তার সুনিপুণ অভিব্যক্তিই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী।

বর্তমান উপন্যাস 'অরণ্য কুহেলী' আরণ্যক অধিবাসিদের প্রেমজীবনের সেই সংঘাত-আলেখ্য ;—হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে প্রেমের বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা,—মানুষের অন্তর-মাহাত্ম্যের অবিনশ্বর ইঙ্গিত।

এক

সাঁওতাল পাড়ার সর্দার রাবণ মাঝি, তার মেয়ের বিয়ে। নাচ-গানের হুল্লোড় পড়ে গেছে আজ ক'দিন থেকে, সারা পাড়া বিয়ের আনন্দে মেতে উঠেছে। আঁটা অবস্থা রাবণ মাঝির, দস্তুর মত জমি-জমার মালিক; তার উপর সে রামপুর মৌজার 'প্রধান'; মস্তাজীরিসত্বে যে কয়েক বিঘা জোলজমি এরা তিনপুরুষ ধরে ভোগ ক'রে আসছে তারও আয় বড় কম নয়। খাঁটী লোক এই রাবণ মাঝি, সাঁওতাল হ'লে যথেষ্ট তার নাম ডাক আছে, দু' পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তাদের মোড়ল বলে রাবণ মাঝিকে মান্য ক'রে চলে। তারই মেয়ের বিয়ে, জাঁকজমক একটু হবে বৈকি! মেয়ের বিয়ের চূড়ান্ত আয়োজন করেছে রাবণ। আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে নেই, জীবনের যা-কিছু সখ-আহ্লাদ—যা-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা—একমাত্র ওই মেয়েটাকে নিয়েই। তার বিয়ে কি যা-তা ক'রে সেরে দেওয়া চলে!—নিন্দের কাজ রাবণ মাঝি করে না।

জ্ঞাতি-কুটুম্ব যে যেখানে ছিলো সকলকেই যথারীতি নিমন্ত্রণ ক'রে নিজে গিয়ে তাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে' কয়েকদিনের জন্য ধরে' নিয়ে এসেছে রাবণ মাঝি, বাদ দেয়নি সে কাউকেই। রাবণ মাঝির ঘর-বার

গম্‌ গম্‌ করছে লোকের ভিড়ে। পাড়া-প্রতিবেশী মাঝি-মেঝেনের দল মজলিস জমিয়েছে বিয়ে-ঘরে এসে; নাচগান আর হাড়িয়া * চলছে পুরাদমে। লোকজনের হাঁক ডাক, নাচগানের সোরগোল, আর রকমারি বাজনার শব্দে সাঁওতালপাড়া আজ গুলজার।

বরপক্ষ এসে পৌঁছে গেছে সময় থাকতে। গাঁয়ের বাইরে প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায় দুপুর বেলা থেকেই আস্তানা গেড়েছে এসে বরিয়াতের † দল। সন্ধ্যার আগে তাদের গাঁ ঢুকবার নিয়ম নাই, কনেবাড়ীর জলসওয়া শেষ হলে তবে তাদের অভ্যার্থনার ব্যবস্থা করা হবে; সে পর্যন্ত বরপক্ষকে গাঁয়ের বাইরে অপেক্ষা ক'রে থাকতেই হবে। অবশ্য বরযাত্রীদের রীতিমত ভোজের আয়োজন ক'রে দিয়েছে রাবণ মাঝি, কলমকাঠি চালের ভাত—তরি-তরকারি রসুন পেঁয়াজ—আর সেই সঙ্গে গোটাতিনেক খাসিকরা তাজা শূয়োর। হাঁড়া হাঁড়া পচুই মদ যথাসময়ে পৌঁছে গেছে বরিয়াতদের ডেরায়। কুড়ি-চারেক বরযাত্রী ফূর্তির নেশায় মশ্‌গুল হয়ে চারদিক থেকে বরকে ওরা ঘিরে রেখেছে। বটতলায় রীতিমত হল্লা চলছে দুপুর থেকেই, মাঝে মাঝে বাজনা বাজছে জোর শব্দে—মাদল, লাগরা, জয়ঢাক, চড়পটি, রামশিঙা, মদনভেড় ‡। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ হাত পা নেড়ে বাজনার বোল আউড়ে যাচ্ছে মুখে মুখে, কেউ কেউ বা অতিরিক্ত নেশা ক'রে মাতাল হয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। বরকর্তা চাঁদরায় মাঝি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বরযাত্রীদের—এবার তাদের তৈরি হতে হবে, বিয়ের 'লগন' কাছিয়ে আসছে।

---

* হাড়িয়া—পচুই মদ।

† বরিয়াত—বরযাত্রী।

‡ মদনভেড়—একরকমের বৃহদাকার ভেঁপু।

চৈত্রের সন্ধ্যা। 'সুরুয বংহা' * বহুক্ষণ ঢলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশ বেয়ে; দূরে ওই ঝাঁটিপাহাড়ের আড়াল থেকে ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে তার রোশনাই ঝিলিক। পাহাড়ের চূড়াগুলো কে যেন সিন্দুর দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে। মহুল ফুলের গন্ধ মেখে ফুর ফুর ক'রে বয়ে যাচ্ছে চৈতালী মিঠে হাওয়া।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ, সময়টি বড় মনোরম। গাঁয়ের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট নদীটা কালো পাথরের চাতাল ভেঙ্গে ঝির ঝির ক'রে বয়ে গেছে একেবারে কাটি-জঙ্গলের গা ঘেঁষে,—তারই কিনার থেকে একটানা মাদলের শব্দ ভেসে আসছে তালে তালে যেন তাল দিয়ে,—দিং দাহাতাং—দিং দাহাতাং—হিঁতাড় দিং দাহাতাং···।

কনেবাড়ী থেকে মেয়েরা সব জল সইতে গেছে নদীধারের টেঁড়ামূলে।† নানাবয়সী সাঁওতালদের মেয়ে,—ভিড় ক'রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সব ছোট্ট নদীর শুকনো বালির বুকে; অসংখ্য তাদের পায়ের দাগ ধ্যাবড়া হয়ে ফুটে উঠেছে শাদা ধপ্ধপে বালির উপর। মেঝেনদের আমোদ-আহ্লাদ আর হাসি-খুশিতে নদীর ঘাট কলমুখর। মহা আনন্দে চলছে তাদের 'দা-বাপলা' ‡ উৎসব। মেয়েদের আজ সাজসজ্জাই কত। পরণে ওদের হলুদ রঙের শাড়ী, খোঁপায় গোঁজা হরেক রঙের ফুল, চোখে কাজল, কপাল ভরা লাল সিন্দুরের টিপ। হাসি যেন ঠোঁটে ওদের লেগেই আছে। বিশেষতঃ ওই লজ্জাভীরু কোমলস্বভাব তরুণ বয়সী সাঁওতালীনের দল, পাহাড়ী দেশের মূর্তিমতী বাহুকরী এরা; চোখে

---

* সুরুয বংহা—সূর্যদেব।

* টেঁড়া—নীচে থেকে উপরে জল তুলবার জন্ত লোহার তৈরী পাত্র বিশেষ।

† টেঁড়ামূল—জল সরবরাহের জন্ত তৈরী ছোট্ট খাল।

‡ দা-বাপলা—জল সওয়া।

শ্রীকালীপদ ঘটক

এদের মায়া, বুকে এদের মধু। এরা জানে মনের কোণে সুন্দরকে কেমন ক'রে জিইয়ে রাখতে হয়, এরাই জানে কিসের জোরে আনন্দকে আলো-হাওয়া-ফুলের মতই চারদিক থেকে অনায়াসে লুটে নেওয়া যায়। এদের দেখে মনে হয় যেন দুঃখ এদের জীবন থেকে বাতিল।

বর্ষীয়সী একটি মেঝেন তরুণীদের তাড়া দিয়ে বললে,—চটপট এবার 'দা-বাপলা' শেষ করতে হবে। এখানকার স্ত্রী-আচার শেষ না হলে বর-কনের বিয়েই হবে না। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার আগেই মাড়োয়ায় * তাদের ফিরতে হবে। বরিয়াতদের বাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ওরাও হয়ত তৈরী হয়ে গেছে এর মধ্যে।

'দা-বাপলা' শেষ ক'রে 'দংসিরিং' † গাইতে গাইতে মেঝেনের দল নদীধার থেকে ধীরে ধীরে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চললো। মঘরা ডোমগুলো আর একবার জয়ঢাকে কাঠি দিলে জোর, একজোড়া রামসিঙ্গা আর গোটাকয়েক মদনভেড় জোরশব্দে একসঙ্গে বেজে উঠলো, —ভোঁ—ভোঁ—ভুর্-র্-র্—।

।

গাঁ বাইরে বটগাছের তলায় বর তখন গা-ঝাড়া দিয়ে পালকীর উপর উঠে বসেছে।

রাবণ মাঝি অত্যন্ত ব্যস্ত। একমাত্র মেয়ে তার দুলালী, আজ তার বিয়ে। মেয়েটি ডাগর হয়েছে, বয়স এখন আঠারো। রূপ আর স্বাস্থ্য কানায় কানায় ভরে উঠেছে দুলালীর সারা অঙ্গ বেয়ে। দস্তুরমত খরচ খরচা ক'রে ভাল ঘরে ভাল বরে দুলালীর বিয়ের ব্যবস্থা করেছে রাবণ

---

* মাড়োয়া—ছাঁদনাতলা।

† দংসিরিং—বিয়ের গান।

মাঝি, মেয়ে তার সুখে থাকবে। বিয়ের লগন ক্রমশঃ কাছিয়ে আসছে, সজাগ হয়ে উঠলো রাবণ মাঝি; বরিয়াতদের ঘরে তুলতে হবে।

জল সয়ে এয়োরা সব বাড়ী ফিরছে। রাবণ মাঝি সদর দোরে দাঁড়িয়ে জোরে একটা হাঁক দিলে,—কিষ্টু—হেই কিষ্টু!

কিষ্টু মাঝি রাবণেরই প্রতিবেশী, রাবণ মাঝির একান্ত অনুগত। চুটি খেতে খেতে পাশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো কিষ্টু। রাবণ মাঝি বললে,—শীগ্‌গির যা দেখি, বরিয়াতদের এগিয়ে নিয়ে আয়, কুলিমুড়ায় খেল্ করবার ব্যবস্থা কর এবার। তীর, ধনুক, ঢাল, তরোয়াল লাঠি-সোঁটা ঠিক আছে ত সব?

কিষ্টু মাঝি জবাব দিলে,—সবই ঠিক আছে সর্দ্দার, আমি শুধু একটা কথা ভাবছি,—ওরা যদি সত্যি সত্যি এসে পড়ে···

রাবণ মাঝি বললে,—ওরা কারা? ভালুকপোতার লোক? তাদের ত আমি জবাব দিয়েছি—ভালুকপোতায় বেটীর বিয়ে আমি দিব না।

কিষ্টু মাঝি বললে,—ওরা কিন্তু বলে সর্দ্দার, আগে নাকি ওইখানেই বিয়ের কথা হয়েছিলো, দুলালী তখন ছোট। তোর শ্বশুর নাকি নিজে ওদের কথা দিয়েছিলো।

রাবণ মাঝি জবাব দিলে,—বিলকুল সব বাজে কথা, আমি ওসব মানি না। সকালবেলা আজ ভালুকপোতার লোককে আমি জানিয়ে দিয়েছি—এ-বিয়ে আমি বন্ধ করতে পারি না। তুই যা—বরিয়াতদের এগিয়ে নিয়ে আয়।

কিষ্টু মাঝি একটু চিন্তিতভাবে বললে,—আমি খবর পেলুম সর্দ্দার, বিয়ে বন্ধ না করলে ওরা নাকি বখেড়া করবে।

রাবণ মাঝির ভ্রূদু'টো কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, বললে,—বখেড়া! তুই ক্ষেপে গেলে নাকি কিষ্টু, রাবণ মাঝির সামনে এসে বখেড়া করবে কোন্ বেটা?

কিষ্টু মাঝি মাথা চুলকে বললে,—কিন্তু সর্দার, উস্তাজ টুরাই মাঝি লোকটা ভয়ানক একরোখা, ইস্তক সে দাবি ক'রে আসছে তার নাতির বিয়ের কথাবার্ত্তা নাকি এইখানেই ঠিক হয়ে আছে ঢেরদিন আগে থেকে; এই কথাটাই জোর গলায় সে গেয়ে বেড়াচ্ছে আর পাঁচজনের কাছে।

রাবণ মাঝি হো হো ক'রে হেসে উঠলো, বললে,—টুরাই মাঝি—তীর-ধনুকের উস্তাজ টুরাই মাঝি! কিন্তু কোনো জোরই খাটবে না তার রাবণ মাঝির কাছে; আমাকে সে ভালরকমই চেনে। যা তুই—সে-সব আমি বুঝবো এখন, বরিয়াতদের ঘরে তোল্ এনে।

মেয়েরা সব নদীধার থেকে জল সইতে সইতে এসে গাঁ ঢুকলো। সরিয়াত বা কন্যাপক্ষের আরও কতকগুলি মাঝি-মেঝেন ঢাল, তরোয়াল, তীর, ধনুক, লাঠি, বর্শা হাতে নিয়ে 'দা-বাপলা' উৎসবে গিয়ে যোগ দিলে। বরপক্ষ সদলবলে কুলিমুড়ায় এসে পৌঁছে গেছে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে। কন্যাপক্ষের মাঝি মেঝেনরা অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে অদ্ভুত এক নাচের ভঙ্গিমায় পা ফেলতে ফেলতে বরপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দল দু'টি পরস্পর সম্মুখীন হতেই কন্যাপক্ষ জোর গলায় বলে উঠলো—'হরিবল—হরিবল হে'—।

বরপক্ষও গেয়ে উঠলো একই সুরে—'পাওরা বল—পাওরা বল হে'—

কন্যাপক্ষ—'হরিবল—পাওরা বল হে'—।

বরপক্ষ—'শিব বল—শিব বল হে'—

দুই দলের বাজনদারদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে। বরিয়াতদের মদনভেড় বেজে উঠতেই সরিয়াত বা কন্যাপক্ষ

রামসিঙায় ফুঁ দিলে খুব জোরে, সিঙার শব্দে মদনভেড় একেবারে তলিয়ে গেল। বরিয়াত পক্ষের দশখানা পালক লাগানো মঘয়া ঢাক চড়বড় শব্দে ঢাকীর কাঁধে লাফাতে লাগলো, সরিয়াত পক্ষের ঢাকের আওয়াজকে একেবারে ঢেকে দিলে এরা। কোনপক্ষই কিন্তু হার মানবে না, ঢাকীদের লম্ফ ঝম্ফ ক্রমশঃই বেড়ে উঠতে লাগলো। মাদল আর নাগরা বাজছে সমান তালে তাল দিয়ে। সমবেত বাদ্যের তালে তালে বরিয়াত আর সরিয়াত দল অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে কুলির মাঝে খেলতে আরম্ভ করেছে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। এও একরকম সাঁওতালদের নাচ, এ নাচের তাৎপর্য্য—বরপক্ষ যেন জোর ক'রে কনেবাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে চায়, কনেকে তারা গায়ের জোরে ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সামনা-সামনি লড়াই দিয়ে। কন্যাপক্ষ তা বরদাস্ত করতে রাজি নয় মোটেই; তীর, ধনুক, লাঠি, সোঁটা নিয়ে বরপক্ষকে তারা বাধা দিতে আরম্ভ করেছে। এ এক রকমের যুদ্ধাভিনয়, বিয়ের সময় সাঁওতালদের এই রেওয়াজ, এটা তাদের শাস্ত্র-মতে বিয়েরই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের বাড়ী ঢুকবার আগে এইভাবেই তাদের অভ্যর্থনা করবার নিয়ম।

লড়াই করার ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কয়েক পাক খেলার পর উভয় পক্ষে 'জোহার' * হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দুই দলই পরস্পরকে সাঁওতালী কায়দায় নমস্কার জানালে। রাবণ মাঝি যথারীতি 'সালাম' দিলে বরকর্ত্তাকে। বরকে নিয়ে বরিয়াত দল রাবণ মাঝির সদর দোরে গিয়ে দাঁড়ালো। টুশকী মেঝেন—রাবণ মাঝির বৌ—কতকগুলি মেয়ের সঙ্গে গুড়-জল হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো,—জামাইকে মিষ্টিমুখ

---

* জোহার—সন্ধি।

করাতে হবে। জামাই দেখে ভারি খুশি মাঝি-মেঝেনরা। যেমন তার দোহারা শক্তপোক্ত চেহারা, তেমনি তার মুখের গড়ন, বয়সও খুব বেশি নয়—এক কুড়ি চার। সকলের মুখেই এক কথা—জামাই খুব ভাল হয়েছে, দুলালীর মত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এই ছেলেকেই মানায়। বরের নামটিও খুব চমৎকার,—মোহন টুডু।

মেয়েরা সব চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালো বরকে। বরের পা ধোয়ানো থেকে আরম্ভ ক'রে কন্যাদান পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সদর দোরেই শেষ করতে হবে। কন্যাদানের পর গাঁটছড়া বেঁধে বরকনে যাবে মাড়োয়ায়, তিনপাক ঘুরবে ছাঁদনা তলায়, তারপর হবে 'গুড়ভাত' বা মিষ্টিমুখ।

মিঠে সুরে আড়বাঁশী আর মাদল বাজছে। একদল মেঝেন পরস্পরের হাতে হাতে ছাঁদ লাগিয়ে 'দংসিরিং' গাইতে গাইতে বাজনার তালে তালে নেচে চলেছে সাঁওতালী নাচ। এয়োদের স্ত্রী-আচার শেষ হতেই একটি দশ বারো বছরের ছেলে,—সম্পর্কে সে বরের শালা,—বরের মাথায় দিলে একটা হলুদ রঙের পাগড়ী বেঁধে। চারদিক থেকে আনন্দে সব হৈ হৈ শব্দে চীৎকার ক'রে উঠলো, বাজনদাররা হঠাৎ বাজনার আওয়াজ আর একটুখানি বাড়িয়ে দিলে।

রাবণ মাঝি ঘুরে ফিরে চারিদিক তদ্বির করে বেড়াচ্ছে। বরকর্তার পাশে বসে খানিকটা পচুই মদ সে চোঁ চোঁ করে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি আবার উঠে পড়লো,—কন্যাদানের সময় হয়েছে।

কিষ্টু মাঝি ওদিক থেকে চুপি চুপি এগিয়ে এসে রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ালো। কিষ্টুর মুখে চোখে কি যেন একটা আশঙ্কার ভাব। চাপা গলায় বলে উঠলো কিষ্টু,—সর্দ্দার, ওরা এসে পড়েছে। ভালুকপোতার প্রায় তিনকুড়ি সাঁওতাল এসে জমা হয়েছে মহুল বাগানে। ওরা বলে…

রাবণ মাঝি চোখ তেড়ে বললে,—বলুক, যা খুশি তাই বলতে দে ওদের,—রাবণ মাঝি পরোয়া করে না।

রাবণ মাঝির মুখের চেহারা দেখে হঠাৎ চমকে গেল কিষ্টু, পরক্ষণেই আবার সে বলে' উঠলো—কিন্তু সর্দ্দার, একদল লাঠিয়াল ওরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে, হয়ত গায়ের জোরেই বিয়ে ওরা বন্ধ করতে চাইবে।

রাবণ মাঝির কপালের রেখাগুলো ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে নিলে রাবণ, তারপর ধীরকণ্ঠে বললে,—সুখন মাঝিকে একবার ডাক দেখি।

এ পাড়ার দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় সুখন মাঝি, রাবণের অনুগত। তাকে ডেকে এনে দল পাকিয়ে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানো বখেড়া বিরোধী কিষ্টু মাঝির মনঃপূত নয়। তাই সে আমতা আমতা ক'রে বললে,—ওদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিলে হতো না সর্দ্দার!

রাবণ মাঝি জবাব দিলে,—সুখনকে আগে ডাক ত—তারপর বোঝা যাবে, ততক্ষণ বিয়েটা আমি চটপট সারিয়ে দি।

রাবণ মাঝি বরিয়াতদের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে বিনীত ভাবে বললে,—এবার তাহলে কনে আনতে আজ্ঞে করা হোক।

বরকর্ত্তা খুশী হয়ে বললে,—হঁ ত—আর বিলুম কেনে, কৈ হে বাঁবড়ে ঠাকুর। *

রতু মাঝি সাঁওতালদের পুরোহিত, ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বরের কাছে দাঁড়ালো সে। ওরই কাঁধের উপর চড়ে কন্যা গ্রহণ করতে হবে বরকে। কনেকে সাজিয়ে গুজিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে আছে একদল

---

* বাঁবড়ে ঠাকুর—পুরোহিত, বামুন।

মেঝেন। তাদের মধ্যে একদল এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললে,—কৈ হে ভেস্থর কই—ভেস্থর,—ডর লাগছে নাকি ?

ডর ভয়ের কারণ কিছু নাই। বরপক্ষ থেকে তিন জন মাঝি একটি ডালা হাতে ক'রে কনের দিকে এগিয়ে এলো হাসতে হাসতে, সম্পর্কে এরা তিনজনেই কনের ভাস্থর। কনেকে এরা ডালার উপর বসিয়ে তিন জনে ধরাধরি ক'রে কাঁধের উপর তুলে' বরের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রাবণ মাঝির মেঝেন বরণ ডালা হাতে নিয়ে দাঁড়ালো একপাশে। রাবণ মাঝি বাবড়ে ঠাকুরকে তাড়া দিয়ে বললে,—দাও দাও,—এবার মেল ক'রে দাও।

সাঁওতালদের পুরোহিত রতু মাঝি খানিকটা গুঁড়ি বেয়ে কাঁধের উপর চাপিয়ে নিলে বরকে। ভাস্থরের ঘাড়ে কনে এবং পুরুতের ঘাড়ে বর, আসমানেই ওদের চারচক্ষুর মিলন হলো। মেঝেনরা সব হুল্লোড় ক'রে উলু দিয়ে উঠলো।

রাবণ মাঝি আর বরকর্ত্তা পূর্ণঘট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'লোটা-দা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবার জন্য। সেই লোটার জলে আমের শাখা চুবিয়ে বর কনে পরস্পরকে তিনবার জল ছিটিয়ে দিলে। মেঝেনরা সব একসঙ্গে চারদিক থেকে শব্দ করে উঠলো,—সিঁদুর দান—সিঁদুর দান—

বর তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ডগায় কড়ে আঙুলটা ঠেকিয়ে সিঁদুরের থান থেকে খানিকটা সিঁদুর তুলে নিলে। সিঁদুর দান শেষ হলেই বিয়ে একবারে পাকা। চারদিক থেকে সকলেই এই বিশেষ মুহূর্ত্তটির অপেক্ষায় একদৃষ্টে চেয়ে আছে বরকনের দিকে। মাদল লাগরায় সিঁদুর দানের বাজনা ধরেছে। পিছন দিক থেকে কে একটা লোক জোর গলায় হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো,—হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার, রাবণ মাঝি! ভাল চাস ত সিঁদুর দান বন্ধ ক'রে দে'।

দূরে একদল সাঁওতাল এসে জমা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ক্ষিপ্রবেগে ছুটতে ছুটতে এসে রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ালো। বরের হাত থেকে শালপাতে মোড়া সিঁদুরের থানটা হঠাৎ ছিটকে পড়লো মাটির উপর। রাবণ মাঝি পিছন ফিরে চেয়ে দেখে—ভালুকপোতার টুয়াই। টুয়াই মাঝির দিকে খানিক এগিয়ে এসে রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—তার মানে?

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—এ মেয়ের হরকবাঁদি হয়ে গেছে বারো বছর আগে, ভালুকপোতার গোটা গাঁয়ের লোক সাক্ষী আছে। বেটীর বিয়ে তোকে সেইখানেই দিতে হবে, কথা দিয়ে গেছে তোর শ্বশুর।

রাবণ মাঝি চোখ তেড়ে বললে,—ছ' বছরের মেয়ের হরকবাঁদি, কেউ কোথাও শুনেছে! ও শুধু একটা ছেলে খেলা, ও সব আমি মানি না।

টুয়াই মাঝি জোর গলায় বললে,—আমরা কিন্তু মানি; ভালুকপোতার টুংরা মাঝির সঙ্গে বেটীর বিয়ে তোকে দিতেই হবে, এ বিয়ে তুই বন্ধ করে দে।

বছর পঁচিশের রোগা লিকলিকে একটা কুৎসিৎ ধরণের লোক-লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা ভালুকের একটা বাচ্ছাকে টানতে টানতে টুয়াই মাঝির কাছে এসে দাঁড়ালো। দুলালীর দিকে চেয়ে হিহি ক'রে একবার হেসে উঠলো লোকটা, হাসতে হাসতে বললে,—আমি—আমি তোর বর, ও নয়—আমি।

রাবণ মাঝি ভ্রূ কুঁচকে বললে,—এ কে?

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—এরই নাম টুংরা মাঝি, এই আমার নাতি—তোর আসল জামাই।

রাবণ মাঝির সর্ব্বাঙ্গ রিঘিয়ে উঠলো, তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ,—এরি হাতে আমাকে বেটী দিতে হবে?

টুয়াই বললে,—নিশ্চয়ই, আজই—এই মজলিসেই।

রাবণ মাঝির আর সহ্য হলো না, হাতের পূর্ণ ঘটটা একপাশে নামিয়ে রেখে হুঙ্কার করে উঠলো রাবণ মাঝি,—সুখন! সুখন!

খেলোয়াড় সুখন মাঝি প্রকাণ্ড এক লাঠি হাতে দাঁড়ালো এসে টুয়াই মাঝির সামনে। টুয়াই মাঝি বুক ফুলিয়ে বলে' উঠলো, —খবরদার।

দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে এলো রাবণ মাঝি নিজে। টুয়াই মাঝি বললে,—আজ তুই ধরম খেয়ালি রাবণ মাঝি, কিন্তু আমাদেরও জান কবুল—এ বিয়ে আমরা কিছুতেই হতে দিব না।

পিছন দিকে চেয়ে জোরগলায় একটা ডাক দিলে টুয়াই মাঝি, —লপ্‌সা, লপ্‌সা!

টুয়াইয়ের সাড়া পেয়ে কুড়ি তিনেক সাঁওতাল ঝড়ের বেগে ছুটে এলো তীর ধনুক লাঠি সোঁটা হাতে নিয়ে। টুয়াই মাঝি হুকুম দিলে,—দাঁড়া সব এইখানটায় সার দিয়ে। ভাল কথায় যদি না হয়, কনে আমরা জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে যাব।

চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল সিঁদুর দানের মুখে। আকস্মিক এই সোরগোলের মধ্যে নাচ-গান আর মাদলের আওয়াজ থেমে গেল হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে।

রাবণ মাঝি এতখানি ভাবতে পারেনি। সাঁওতালদের সর্দ্দার সে, এ তল্লাটের পাঁচখানা গাঁয়ের মাথা। তার মেয়েকে জোর করে' বিয়ের আসর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে,—রাবণ মাঝি বেঁচে থাকতে! খেলোয়াড় সুখন মাঝির দিকে চেয়ে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ,—হাটা এদের

এখান থেকে, ঠেঙিয়ে বেবাক দূর ক'রে দে, টুয়াই মাঝিকে জানিয়ে দে যে রাবণ মাঝি কারো চোখ-রাঙানিকে ভয় করে না, দরকার হলে দাঙ্গা হাঙ্গামা করতেও সে জানে।

সুখন মাঝি দলবল নিয়ে রুখে দাঁড়ালো; রীতিমত লাঠিসোঁটা আমদানি হয়ে গেছে এদের মধ্যেও। টুয়াই মাঝির দল আরও খানিকটা এগিয়ে এলো সদর্পে, আজ তাদের জান কবুল, মান খুইয়ে কেউ বাড়ী ফিরে যাবে না।

চারি দিকে হঠাৎ একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। বরপক্ষও রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, এ অপমান শুধু রাবণ মাঝির একলার নয়, তাদেরও। চালুকপোতার বিরুদ্ধে বরিয়াত পক্ষও ক্ষেপে উঠলো, দুলালীর সঙ্গে মোহনের বিয়ে তাদেরকে দিতেই হবে, যেমন ক'রে হোক। বরিয়াত আর সরিয়াত পক্ষ একসঙ্গে রুখে দাঁড়ালো। রাবণ মাঝির দল বাঘের মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো টুয়াই মাঝির দলের উপর।

বরকর্ত্তা বৃদ্ধ চাদরায় মাঝি একপাশে চুপচাপ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো। ব্যাপারটা বুঝতেই তার কিছুক্ষণ কেটে গেছে। শশব্যস্তে ছুটে গিয়ে দুই দলের মাঝখানে হঠাৎ দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল চাদরায় মাঝি, জোর গলায় সে বলে' উঠলো,—খবরদার।

উভয় পক্ষই থম্‌কে গেল হঠাৎ। রাবণ মাঝি মরিয়া হয়ে উঠেছে, বরকর্ত্তার সামনে গিয়ে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো সে, চাঁদরায় মাঝি বাধা দিয়ে বললে,—আমরা চাই বিচার; লড়াই আমি হতে দিব না।

টুয়াই মাঝি সোৎসাহে বলে উঠলো,—সাবাস হাড়াম—সাবাস! আমরা শুধু বিচার চাই,—হোক বিচার—এই মজলিসেই।

চাঁদরায় মাঝি প্রবীণ লোক, সাঁওতাল মহলে তার যথেষ্ট মান-খাতির আছে। রাবণ মাঝি বা টুয়াই মাঝির চেয়ে সামাজিক সম্ভ্রম তার কম কিছু

নয়। মোহন মাঝির কাকা এই চাঁদরায় মাঝি, এ অঞ্চলের নামকরা একজন বিচক্ষণ লোক। এতবড় একটা অপ্রীতিকর ঘটনা তার সামনে সে কোনমতেই ঘটতে দেবে না। দুই দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চাঁদরায় মাঝি আর একটা হাঁক দিলে,—খবরদার।

সুখন মাঝির হাতের লাঠি আসমান থেকে নেমে এলো মাটির উপর। ভালুকপোতার নাম করা লাঠিয়াল লপ্‌সা মাঝি মুখ নীচু করে দাঁড়ালো একপাশে। রাবণ মাঝি একটু আশ্চর্য্য হলো, টুয়াই মাঝি একদৃষ্টে চেয়ে আছে চাঁদরায় মাঝির মুখের দিকে। চাঁদরায় মাঝির ইঙ্গিতে উভয় দলই ক্ষণ কালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

রাবণ মাঝি জিজ্ঞাসা করলে,—বিয়ে কি তা হলে বন্ধ থাকবে?

চাঁদরায় কিছু বলবার আগেই টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—নতুন ক'রে লগণ বেঁধে ও মেয়ের আবার বিয়ে দিতে হবে, এই হলো সাঁওতালী আইন।

দুলালীর মামার বাড়ী ভালুকপোতায়। রাবণ মাঝির শ্বশুর বেঁচে থাকতে কোন্ কালে নাকি দুলালীর হরকবাঁদি করে গেছে ভালুকপোতায়। রাবণ মাঝি কিন্তু বিশ্বাস করে না ও সব কথা, এতবড় একটা অন্যায় দাবি সে মেনে নিতে পারে না। চাঁদরায় মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠলো রাবণ,—তুই কি বলিস কুটুম্ব, এরি নাম কি সাঁওতালী আইন?

চাঁদরায় মাঝি হঠাৎ কোন জবাব দিলে না। টুয়াই মাঝি বলে' উঠলো,—তোকেই আমরা মেনে নিচ্ছি, দে' তুই এর বিচার ক'রে।

চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—আমার কথা কি শুনবি তোরা?

রাবণ মাঝি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে,—আলবাৎ শুনবো।

টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—তোকে আমরা ভেরে দিলুম, নেহ্ তুই বিচার ক'রে দে'।

চাঁদরায় মাঝি সমবেত আর সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললে,—তোরা কি বলিস, তোরাও এতে রাজি ত ?

সকলেই একবাক্যে সম্মতি জানালে,—চাঁদরায় মাঝির বিচার তারা চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে। চাঁদরায় বললে,—বস্ তাহলে চুপচাপ সব শান্ত হয়ে, আমাকে একটু ভেবে দেখতে দে।

রাবণ মাঝির সদর দোরে বিরাট এক মজলিস বসলো। চাঁদরায় মাঝিকে বসিয়ে দেওয়া হলো মাঝখানে একটা খাটিয়ার উপর। টুয়াই আর রাবণ মাঝি মাচুলির উপর বসে পড়লো চাঁদরায়ের দু' পাশে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কিষ্টু মাঝি রাবণের ঘর থেক দুটো বগবাতি জেলে এনে মজলিশের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিলে কাঁটাল গাছের ডালে। ভিন্ন দলের মাতব্বরদের মধ্যে যুক্তি তর্ক ও বাকবিতণ্ডা আবার সুরু হয়ে গেল, কোন পক্ষই অপর পক্ষকে স্বীকার ক'রে নিতে চায় না। টুয়াই মাঝির এক কথা, রাবণ মাঝির মেয়ে নাকি বাগদত্তা, সুতরাং টুংরার সঙ্গেই তার বিয়ে দিতে হবে। রাবণ সে কথা স্বীকার করবে না, মেয়ের বিয়ে সে আজই দেবে—মোহন মাঝির সঙ্গে, চাঁদরায় মাঝির অনুমতির অপেক্ষা মাত্র। অন্যান্য বরপক্ষীয়েরাও রাবণ মাঝির সঙ্গে একমত, দুলালীর সঙ্গে মোহনের বিয়ে, আজ—এই রাত্রেই।

চাঁদরায় মাঝি গম্ভীর ভাবে বসে আছে খাটিয়ার উপর। সমস্যা খুব গুরুতর, কোন্ পক্ষের অনুকূলে সে রায় দেবে স্থির করা কঠিন। নেহ্য কথা বলতে গেলে কোন পক্ষের দাবীকেই হঠাৎ একেবারে অসঙ্গত বলে' উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চাঁদরায় মাঝি কান খাড়া ক'রে শুনে যেতে লাগলো উভয় পক্ষের বক্তব্য। যেমন করেই হোক এ সমস্যার সমাধান তাকে করতেই হবে।

উভয় পক্ষের বাকবিতণ্ডা ও চাঞ্চল্যের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো। বরের নাম ধরে উভয় পক্ষই চীৎকার করতে আরম্ভ করেছে,—মোহন, না, টুংরা? টুংরা, না মোহন? এরা বলে—মোহন ওরা বলে—টুংরা। চারিদিকে হল্লা ক্রমশঃ বেড়ে চললো। চাঁদরায় মাঝি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, হঠাৎ সে জোরগলায় বলে উঠলো —মোহন!

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। মোহনের নাম শুনে রাবণ মাঝি ও বরিয়াত পক্ষ কিছু খুশী হয়ে উঠেছে। টুয়াই মাঝি কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলো,—মোহন, না, টুংরা?

চাঁদরায় মাঝি মোহনকে লক্ষ্য ক'রে ডাক দিলে,—ইদিকে আয়।

চাঁদরায় মাঝির রায় সকলে মেনে নিতে বাধ্য, উভয় পক্ষ কথা দিয়েছে, টুয়াইয়ের দল কিছু হতাশ হয়ে পড়লো।

বিয়ের বর মোহন মাঝি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে চাঁদরায় মাঝির সামনে দাঁড়ালো। চাঁদরায় মাঝি আর একটা হাঁক দিলে, —টুংরা,—ই দিকে।

উৎসুক জনতা আর একবার চোখ ফেরালো চাঁদরায় মাঝির দিকে। টুংরা ভালুকের বাচ্চাটাকে টানতে টানতে চাঁদরায় মাঝির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো—মোহন মাঝির পাশে।

সমাগত সকলকে লক্ষ্য ক'রে চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—এদের দু'জনের মধ্যে থেকে দুলালীর বর আমাকে বেছে দিতে হবে,—কেমন?

রাবণ মাঝি একটা ঢোক গিলে বল্লে,—হঁ কুটুম্ব!

টুয়াই মাঝি শুধু ঘাড় নাড়লে একবার।

চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—দু'জনকেই এদের পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় যে জিততে পারবে—দুলালীকে বিয়ে করবে সেই।

রাবণ ও টুয়াই মাঝি একসঙ্গে বলে উঠলো,—পরীক্ষা ?

চাঁদরায় বললে,—হাঁ—তীর ধনুকের পরীক্ষা, নিশান আমরা ঠিক ক'রে দিব, দূর থেকে তীর দিয়ে বিঁধতে হবে সেই নিশানকে। শেষ পর্য্যন্ত ঠিকমত নিশান যে বিঁধতে পারবে—রাবণ মাঝি মেয়ে দেবে তার হাতে।

এরপর আর কথা নাই, টুয়াই মাঝি সানন্দে সম্মত হলো, রাবণ মাঝি একটু গম্ভীরভাবে বললে,—বেশ, তাই হোক।

মোহনের দিকে এবার চোখ ফেরালে চাঁদরায় মাঝি, বললে,—তোরা এ সম্বন্ধে রাজি আছিস ত ?

মোহন মাঝি হঠাৎ কোন জবাব দিলে না। দুলালীকে সে ভালবাসে, ...র আগে থেকেই ভালবাসে। মনে মনে সত্যই একটু চিন্তিত হয়ে ...ড়লো মোহন। টুংরাকে সে ভাল করেই জানে, রোগা লিকলিকে ...বা-গোবা কুৎসিৎ ওই চেহারা, কিন্তু কাঁড়ধেনুকে হাত তার পাকা। ...স্তাজ টুয়াই মাঝির চেলাদের মধ্যে সব থেকে সেরা শিকারী ওই টুংরা ...ঝি। ওর সঙ্গে কাঁড়ধেনুকে পাল্লা দেওয়া মোহনের পক্ষে সহজ কথা ...য়। কিন্তু তবু সাঁওতালের ছেলে হয়ে কাপুরুষের মত কাজ করবে না ...াহন, পরীক্ষা তাকে দিতেই হবে। ঘাড় নেড়ে মোহন সম্মতি জানালে, ...াদরায় মাঝির প্রস্তাবে সে রাজি আছে।

চাঁদরায় মাঝি খুশী হয়ে বলে উঠলো,—বহুত আচ্ছা।

তারপর সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালো একবার টুংরা মাঝির দিকে, ...ললে,—তুইও এতে রাজি আছিস ত ?

টুংরা মাঝির কিছুমাত্রই আপত্তি নাই এতে, ওর মিটমিটে চোখ ...'টো খুশিতে ভরে উঠলো, সাগ্রহে বলে উঠলো টুংরা,—কাঁড়ধেনুকটা ...য়ে আসবো নাকি ?

চাঁদরায় মাঝি বললে,—আজ না, পরীক্ষা হবে আজ থেকে ঠিক একমাস পরে, তোরা এর মধ্যে যতটা পারিস তৈরি হয়ে নে। বৈশাখ মাসের শেষদিন 'পঞ্চ গেরামী' সাঁওতাল ডেকে ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে দুলালীর আমি বিয়ে দিব তার সঙ্গে—সেইদিন যে তীর ছোঁড়ায় জয়ী হতে পারবে।

ভালুকপোতার সাঁওতালরাই খুশী হলো বেশি। কন্যাপক্ষও বিনা দ্বিধায় মেনে নিলে চাঁদরায় মাঝির রায়। রাবণ মাঝি একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছে, এতক্ষণ ধরে' কি যেন সে ভাবছিলো। চাঁদরায় মাঝি রাবণের দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—তুই যে কোন কথা কইছিস না রাবণ, এতে তোর কোন আপত্তি নাই ত?

রাবণ মাঝি সজাগ হয়ে উঠলো, মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে' উঠলো রাবণ,—কি যে তুই বলিস কুটুম্ব, তোর কথার উপর কথা কইতে যাবে রাবণ মাঝি! একবার যখন তোকে মেনে নিয়েছি, তখন আর কথা কি! পিথিমী উল্টে গেলেও রাবণ মাঝি ধরম খোয়াবে না; কথা কয়ে কথার খেলাপ আজ পর্য্যন্ত করেনি কখনো রাবণ মাঝি।

চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—বেশ, তবে হাতে মেলা টুয়াই মাঝির সঙ্গে।

চারিদিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে' গেল। রাবণ মাঝি খানিকটা চুন তামাকুল গুঁজে দিলে টুয়াই মাঝির হাতে। টুয়াই মাঝি কাণে গোঁজা শালপাতার চুটিটা রাবণ মাঝির ঠোঁটের কাছে ধরে' দিলে। টুংরা সাঁওতাল মোহন মাঝিকে ভালুকের নাচ দেখাতে আরম্ভ করেছে। মাটির উপর ছোট্ট একটা লাঠি নিয়ে ঠুকতে ঠুকতে নিজের মনেই আউড়ে যাচ্ছে টুংরা,—ধুতুক ধুতুক ধুতুক ধুতুক—নাচ রে বেটা···ধুতুক ধুতুক······

টুংরার টানা হেঁচড়ায় ভালুকের বাচ্চাটা একবার কোঁ কোঁ শব্দে ডেকে উঠলো।

রাবণ মাঝি চাঁদরায় আর টুয়াই মাঝির সামনে হাতজোড় করে বললে,—আজ আর কাউকে ছেড়ে দিব না আমি, আমার ঘরে আজ খুদকুঁড়ো দু'টো খেয়ে যেতে হবে সকলকেই।

চাঁদরায় মাঝি হাসতে হাসতে বললে,—ভোজ? তা ভোজের যোগাড় ত হয়েই আছে, কি বল উস্তাজ!

টুয়াই মাঝি হো হো ক'রে হেসে উঠলো। রাবণ মাঝি বাজনদারদের তাড়া দিয়ে বললে,—বাজা রে সব বাজা, লাগরা বাজা—মাদল বাজা—চলুক তার সঙ্গে সারারাত ধরে নাচ-গান আর হাড়িয়া।

বাজনার শব্দে সাঁওতালপাড়া আবার গুলজার হয়ে উঠলো। দুলালী তখন হলুদরাঙা বিয়ের শাড়ীখানা পাল্টে ঘরের মধ্যে একটা খাটিয়ার উপরে চুপচাপ মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে।

দুই

কুরুলিয়া নদীর এপার আর ওপার। এপারে রামপুর, ওপারে সিরুকাটা; এপারে দুলালী, ওপারে মোহন। মাঝখানে ব্যবধান ক্রোশখানেকের মধ্যেই। এপারের কয়েকটি সাঁওতালী গ্রাম ওপারের কয়েকটি পল্লীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দীর্ঘকালের আত্মীয়তাসূত্রে। এপার আর ওপার নিয়ে এদের এক পঞ্চায়েৎ বা 'পঞ্চ গেরামী'—এ অঞ্চলের বৃহত্তর সাঁওতালী সমাজে তার মান-মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বড় কম নয়। সামান্য দিনমজুর থেকে আরম্ভ ক'রে অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থ পর্যন্ত অনেকগুলি সাঁওতালের বাস কাছাকাছি এই কয়খানা গাঁয়ের

মধ্যে। ঘুসরুকাটা গ্রামখানা ছোট, কয়েকঘর মাত্র সাঁওতালের বাস; কিন্তু অবস্থা কারো খারাপ নয়, দু'দশ বিঘা জমি-জায়গা সকলেরি আছে। এ গাঁয়ের শ্যামরায় মাঝি, মোহন মাঝির বাবা, এ অঞ্চলের নামকরা লোক ছিলো। নিজের হাতে মাটি কেটে, হাল বেয়ে তিন তিনখানা লাঙ্গলের জমি একলা সে খামাল ক'রে গেছে। কোনকিছুর অভাব ছিলো না তার, লক্ষ্মী ছিলো শ্যামরায় মাঝির ক্ষেত খামারে বাঁধা। ছেলেটাকে গড়ে'-পিটে মানুষ ক'রে তুলবার জন্য কি আগ্রহই না ছিলো শ্যামরায় মাঝির, কিন্তু ছেলে তার মনের মত হয়ে উঠেনি। শ্যামরায় ছিলো পাকা চাষা, গায়ে-গতরে খেটে-খুটে মাটির বুকে সে সোনা ফলাতে জানতো। কিন্তু ছেলেটা তার অন্য ধরণের, চাষবাসে তার ঝোঁক ছিলো না মোটে, সাংসারিক কাজকর্ম্মে নিষ্ঠা ছিলো একেবারে কম। মোহন মাঝির স্বভাবটা বরাবর একটু সৌখীন ধরণের। হয়ত বা শ্যামরায় মাঝি গোড়ার দিকেই একটু ভুল করেছিলো, মোহনকে সে ছেলেবেলায় লাঙ্গল ধরা না শিখিয়ে পাশের গাঁয়ের একটা পাঠশালে তাকে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলো। বই-পুঁথি বগলে নিয়ে প্রত্যহ সে এক-দেড়ক্রোশ পথ হেঁটে বছরখানেক আনাগোনাও করেছিলো, কিন্তু লেখাপড়া ভালরকম শিখতে পারেনি মোহন, প্রথম ভাগের দু'একখানা পাতা উল্টেই পাঠশাল যাওয়া সে বন্ধ করে দেয়। অবশ্য শ্যামরায় মাঝির তাতে আপসোসের বিশেষ কোন কারণ ঘটেনি, ছেলে যে তার দিকু পিড়াদের * ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলো এবং ছাপা পুঁথির বাংলা আখরগুলো একে একে বিলকুল সে চিনে ফেলেছিলো বছরখানেকের মধ্যেই, এইটাই তার পক্ষে ঢের। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বেশি দরকার, অর্থাৎ গরু-বাছুরের তত্ত্বাবধান থেকে আরম্ভ করে ক্ষেত-খামারের যাবতীয় কাজকর্ম্মে

* দিকু পিড়া—বাঙালী ভদ্রলোক।

বিশেষভাবে মনযোগ দেওয়া,—সেই দিকটাই একেবারে এড়িয়ে গেল মোহন। আক্কেল বুদ্ধির অভাব ছিলো না তার, কিন্তু এসব কাজে বরাবরই ঝোঁক কিছু কম ছিলো। ছেলেবেলা থেকেই মোহন একটু আমোদপ্রিয়, আড়বাঁশী আর মাদল নিয়েই হরদম সে মেতে থাকতো।

সাংসারিক বিষয়কর্ম্মে ছেলের অমনোযোগ দেখে শ্যামরায় মাঝি সে-বার বেশ খানিকটা শাসিয়ে দিলে মোহন মাঝিকে। জোয়ান ছেলে, বাপের বুড়ো বয়েসে বিশেষ যদি কোন কাজেই না এলো, তাহলে তার থাকা না থাকা সমান কথা। অবশ্য নিজের জন্যে কোনদিনই ভাবতে হয়নি শ্যামরায় মাঝিকে, মোহনেরি ভবিষ্যৎ ভালোর জন্যে গড়ে পিটে তাকে মানুষ করে নিতে চেয়েছিলো সে। কিন্তু মোহন ছিলো একেবারে খামখেয়ালী, সংসারের ধরাবাঁধা নিয়ম কানুনের মধ্যে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে কোন মতেই চলতে পারতো না। এইসব নিয়ে বাপ বেটার মধ্যে মাঝে মাঝে বাকবিতণ্ডা হতো প্রায়ই। শ্যামরায় মাঝির কাছ থেকে বেশ একচোট ধমক খেয়ে রাতারাতি সেদিন বাড়ী থেকে চম্পট দিলে মোহন। তিনটি বছর মোহনের আর খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাণীগঞ্জের একটা কয়লাকুঠি থেকে শ্যামরায় মাঝি নিজে গিয়ে বহুকষ্টে ধরে নিয়ে আসে মোহনকে। মোহন সেখানে কয়লা কাটতো, মালকাটার কাজে মোহন পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘুসরুকাটার শ্যামরায় মাঝির ছেলে—দু পাঁচটা মুনিশ-মান্দের খাটিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে যার বসে খেতে কুলোয়, দেশ ছেড়ে সে ভিন মুলুকে কয়লা কাটতে যাবে কোন্ দুঃখে। বুড়ো বাপের অনুরোধ শেষ পর্য্যন্ত ঠেলতে পারেনি মোহন, মালকাটার কাজে ইস্তফা দিয়ে আবার তাকে বাড়ী ফিরতে হয়েছে।

শ্যামরায় মাঝি মারা যাওয়ার পর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব মোহন মাঝির ঘাড়ে পড়লো। একটু একটু করে সব কিছুই আবার গুছিয়ে নিলে মোহন। শ্যামরায় মাঝির ভাই চাঁদরায় মাঝির সংপরামর্শে মোহন আবার দেখতে দেখতে ভাল ছেলে হয়ে উঠলো। রামপুরের রাবণ মাঝির মেয়ের সঙ্গে মোহনের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে ওই চাঁদরায় মাঝি। ছেলেটাকে কোনরকমে একবার সংসারী করে দিতে পারলে কতকটা সে নিশ্চিন্ত হতে পারে। শ্যামরায় মারা যাওয়ার আগে মোহন মাঝির ভালমন্দের ভার সে চাঁদরায় মাঝির হাতে সঁপে দিয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে দুলালীর সঙ্গে মোহনের পরিচয় হয় কুলডাঙ্গার হাটে। মোহন গিয়েছিলো একজোড়া দামড়া কিনতে, হাটে গিয়ে তার রাবণ মাঝির সঙ্গে দেখা, সঙ্গে ছিলো দুলালী। রাবণ মাঝিকে মোহন চিনতো, মোহন মাঝির বাপের সঙ্গে রাবণ মাঝির জানাশোনা ছিলো খুবই। এ অঞ্চলের নামকরা লোক রাবণ মাঝি, মোহন ওদের বরাবরই জানে। একটা কথা শুধু জানা ছিল না মোহন মাঝির, রাবণ মাঝির মেয়েটা যে এর মধ্যে এতখানি বড় হয়ে গেছে, কোন দিন তা লক্ষ্য করেনি মোহন। ছোটবেলা থেকেই দুলালীকে সে দেখে আসছে, রামপুরের মেঝেনদের সঙ্গে ভোর বেলা উঠে ছোট একটা চুপড়ি হাতে নদীর ধারে ছাতু তুলে বেড়াতো সে বর্ষার দিনে, মোহন যেতো নদীর মানায় কাড়া চরাতে, মোহনের বয়স তখন চৌদ্দ কি পনেরর বেশি নয়, চোখোচোখি ওদের দেখা হতো প্রায়ই। তারপরেও হাটে ঘাটে মেলায় ময়দানে আরও কতবার দেখা হয়েছে তার দুলালীর সঙ্গে, আর পাঁচজনের সঙ্গে যেমন ধারা হয়। পরক্ষণেই আবার তাকে ভুলে যেতেও কিছুমাত্র আটকায়নি মোহনের, বহুদিন থেকে দুলালীর কথা সে একবারেই ভুলে গিয়েছিলো। কুলডাঙ্গার হাটে বহুদিন পরে দেখা, মোহন হঠাৎ চিনতে পারেনি

দুলালীকে, রাবণ মাঝি নতুন করে আবার আলাপ করিয়ে দেয়। দুলালীকে দেখে মোহন যেন অবাক হয়ে গেল। রোগা লিক্‌লিকে পেটমোটা ছোট্ট একটা মেয়ে, মাথায় খাটো চুল, পরনে একটা জোলাঘরের কেড়ানী, ঝুনঝুম শব্দে বাঁকমল বাজিয়ে সারাবর্ষা নদীর ধারে ছাতু তুলে বেড়াতো। তার মধ্যে আজ এতখানি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে সত্যই যেন বিস্মিত হলো মোহন। দুলালীর সারা অঙ্গ বেয়ে বয়সের বান যেন কুলে কুলে ছেপে উঠেছে। সুন্দর মুখখানি তার ছাপ মেরে বসে গেল মোহন মাঝির মনে।

দামড়া কিনতে হাটে গেছে মোহন। পাছে তাকে আনাড়ি ভেবে পাইকাররা চড়া দর হাঁকে—তাই রাবণ মাঝিকেও সে সঙ্গে নিয়ে নিলে। অভিজ্ঞ লোক রাবণ মাঝি, গরু কাড়ার মর্ম্ম তার ভালরকমই জানা আছে। পাইকারদের কাছ থেকে বেশ ভাল দেখে একজোড়া দামড়া গরু সে পছন্দ করে কিনে দিলে মোহন মাঝিকে। দামড়া দুটো খুব চমৎকার, বয়েস্ মোটে ছ'দাঁত, লক্ষণ বেশ ভাল আছে, একটা বছর পিছুহালে চলিয়ে নিলে আট দশ বছর আর দেখতে হবেনা, একদেড় খানা লাঙ্গলের জমি অনায়াসে এরা চযে মেড়ে খামাল ক'রে দেবে। দামড়া দুটো খরিদ ক'রে ভারি খুশী মোহন মাঝি, হালের হেতের এমন না হলে কি চলে! দামও ঢের শস্তা হয়েছে, রাবণ মাঝির সঙ্গে দেখা না হলে মোহন হয়ত আজ ঠকেই যেত।

একসঙ্গে ওরা ঘুরে ঘুরে হাটবাজার সারতে লাগলো, ঘুরতে ঘুরতে বেলা হয়ে গেল অনেকখানা। "এটা ওটা কেনা কাটার মাঝ খানে আড় চোখে চোখে চেয়ে দেখে দুলালী—মোহন যেন আবাক হয়ে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। নিজের মনেই দুলালী শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে। কিন্তু ভয়নক এ অন্যায় কথা, দুলালীর দিকে বার বার এমন ভাবে

তাকাতে এতটুকু লজ্জা করেনা মোহনের! দুলালী আবার তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়।

হাট থেকে বেরোবার আগে সাঁওতালী মাদল একটা কিনে নিলে মোহন, সেই সঙ্গে মকর বাঁশের গোটা তিনেক আড়বাঁশীও। কিনবার আগে মাদলটা সে নিজের হাতে বাজিয়ে একবার পরখ ক'রে নিলে, চমৎকার আওয়াজ উঠছে। একটা মনিহারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বেলমালা কিনছিলো দুলালী, মাদলের আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে সে চেয়ে দেখে বাজনদার স্বয়ং মোহন মাঝি। দুলালীর চোখে চোখ মিলতেই মাদলে আর একটা ঘা দিয়ে ফিক ক'রে হেসে উঠলো মোহন। বেলমালার দাম দিয়ে দুলালী ওখান থেকে সরে পড়লো।

হাট থেকে ওরা বাড়ী ফিরলো এক সঙ্গেই। কুরুলিয়া নদীর বাঁকে এসে ডান হাতি ঘুসরুকাটার পথ ধরলে মোহন, রাবণ মাঝির পিছু পিছু এগিয়ে চললো দুলালী—রামপুর দিকে যাবার বাঁ-হাতি শুড়ি পথটা ধরে'। মোহনের মনটা হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল, পা যেন তার গাঁয়ের দিকে এগোতে চায় না। কিছু দূর গিয়ে পিছন ফিরে একবার তাকালো মোহন, দুলালীও মাঝে মাঝে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দূর থেকে কাকে যেন লক্ষ্য করছে। মোহনের বুকটা যেন দুলে দুলে উঠতে লাগলো। দূরে একটা পলাশ বনের মাঝখানে ওরা আড়াল হয়ে যেতেই নদীর ধারে থমকে খানিক দাঁড়ালো মোহন—ছোট একটা মহুল গাছের নীচে। মোহনের চোখে যেন স্বপ্নের ঘোর, কি যেন একটা তীব্র নেশার ঘোরে মনটা তার মাতাল হয়ে উঠেছে।

—আরে হই, ধানক্ষেতে গরু লাগলো যে।

দূর থেকে কার ডাক শুনে চমক ভাঙ্গলো মোহনের। পিছন ফিরে সে চেয়ে দেখে তার নতুন কেনা দামড়া দুটো হাঁসদাদের বাকুড়িতে

নেমে বেপরোয়া ধান খেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। হাতের লাঠি-গাছটা উঁচিয়ে ধরে চীৎকার ক'রে উঠলো মোহন,—যাই—যাই শালার দামড়াকে, কুথাকার বেওড়া গরুরে!

গরু দুটোকে আবার পথ ধরিয়ে মাদলে আর একবার চাঁটি দিলে মোহন। গরুর গলায় ঘুঙুর গাঁথা চামড়ার পেটি জড়ানো। মাদলের আওয়াজ পেয়ে দামড়া দুটো জোর কদমে হাঁটতে আরম্ভ করলে। ঝম্ ঝম্ শব্দে গরুর গলায় ঘুঙুর বাজছে, মোহন তাদের পিছু পিছু মাদল বাজিয়ে গুন্ গুন্ শব্দে একটা গান গাইতে গাইতে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চললো।

মোহনকে সংসারী করবার জন্য কিছু দিন থেকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা ক'রে আসছে চাঁদরায় মাঝি। অভিভাবক হিসেবে চাঁদরায় মাঝির এটা কর্তব্য, ভাইপো আর ছেলে ধরতে গেলে পৃথক নয়। যদিও তাদের ঘর সংসার জমিজমা মায় হাঁড়ি হেঁসেল পর্য্যন্ত বহুদিন আগেই পৃথক হয়ে গেছে—শ্যামরায় মাঝি বেঁচে থাকতেই, তবু আজো লোকে জানে ওরা এক গুষ্টি, একই বাড়ীর সামিল। মোহনের একটা বিয়ে দিয়ে সংসারের খোঁটায় যতক্ষণ না তার মনটাকে শক্ত ক'রে বেঁধে দেওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বস্তি নাই চাঁদরায় মাঝির। দু'চারটে মেয়েও এর আগে দেখা হয়ে গেছে, কিন্তু মোহনের তরফ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি বলেই চাঁদরায় মাঝি বেশি দূর আর এগুতে পারেনি। কুলডাঙ্গার হাট থেকে ফিরে আসার পর মোহন একদিন নিজে'থেকেই জানিয়ে দিলে চাঁদরায় মাঝিকে —বিয়ে করতে সে রাজি আছে, আর বিয়ে যদি করতেই হয় ত ওপারের ওই রামপুর গাঁ খানাই প্রশস্ত, রাবণ মাঝির মেয়েটাও দেখতে শুনতে এমন কিছু মন্দ নয়।

চাঁদরায় মাঝি মনে মনে এঁচে নিলে সবই। পরের দিনই রাবণ মাঝির কাছে লোক পাঠানো হলো। রাবণ মাঝি একটি ভাল ছেলের সন্ধানে ছিলো, মোহনের মত ছেলে পেয়ে বর্তে গেল সে। কয়েক দিনের ভিতরেই রামপুর আর ঘুসরুকাটার মধ্যে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল।

চাষের কাজে নতুন ক'রে মন দিয়েছে মোহন। ক্ষেত ভর্তি সোনার ফসল থৈ থৈ করছে মোহন মাঝির জোলজমিতে। দু' বেলা সে নদীর ধারে ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে বেড়ায় আল কেটে কেটে জল ধরিয়ে। ঘন সবুজ ধানের শীষে থেকে থেকে দোল দিয়ে যায় দমকা হাওয়া, মোহনের মন সেই সঙ্গে দুলতে থাকে দুলালীর কথা স্মরণ ক'রে।

ওপার থেকে বেলা পড়লে মেয়েরা সব কলসী কাঁকে জল ভরতে আসে এই নদীর ঘাটে, দূর থেকে চেয়ে থাকে মোহন। এর মধ্যে আরও কয়েকবার চোখোচোখি দেখা হ'য়ে গেছে তার দুলালীর সঙ্গে, এই ঘাটেই সে জল নিতে আসে। ইচ্ছা থাকলেও লোকের ভিড়ে দুলালীর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পায় না মোহন, দুলালী তাকে দূর থেকেই চোখের ভাষায় জানিয়ে দিয়ে যায়—মোহনকে সে ভালবাসে, মোহনকে সে চায়।

মোহনের যেদিন 'পাগড়ী খোলা' হয়, দুলালীর সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সেই দিনই। নির্দিষ্ট ব্যবস্থামত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে হাটে গিয়েছিলো মোহন, দুলালীকেও ওর আত্মীয় স্বজনেরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। হাটের এক প্রান্তে মাথায় একটা হলদে রঙের পাগড়ী বেঁধে চুপচাপ একধারে বসে ছিল মোহন। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে মোহনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুলালী তার মাথা থেকে হলদে রঙের সেই পাগড়ীটা খুলে দিলে নিজের হাতে। এর মানে—মোহনকে তার পছন্দ। কনে

যতক্ষণ নিজের চোখে বরকে দেখে পছন্দ না করছে, ততক্ষণ ওদের বিয়ে হতে পারে না। এই ভাবে তাই বিয়ের আগে পরস্পরের দেখাশুনা আর পাগড়ী খোলার ব্যবস্থা, সাঁওতালদের এই নিয়ম।

সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে মোহনের বাড়ীতে নাচগানের হুল্লোড় পড়ে গেল, উৎসব চললো সারারাত ধরে। মোহন মাঝির কাকা চাঁদরায় মাঝি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কুটুম্বদের ভোজ খাওয়ালে প্রচুর। পরের মাসে 'নোয়া' ডেকে 'লগন বাঁধা' হলো, চৈত্রের শেষ দিন রাবণ মাঝির মেয়ের সঙ্গে মোহন মাঝির বিয়ে।

বিয়ের দিন কিন্তু আকস্মিক ভাবে ওলট পালট হয়ে গেল সবই। চন্দনপোতার সাঁওতালরা এসে এমন এক বখেড়া বাধালে যে সিঁদুর দানের মুখে বিয়েটাই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। এমনটা যে ঘটতে পারে ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারেনি মোহন। কোথাকার এক অপদার্থ অপোগণ্ড বখেড় একটা ছোকরা এসে দুলালীকে হঠাৎ বিয়ে করতে চায়। সেইখানেই মনে হয়েছিল মোহনের টুংরা মাঝির গলাটা চেপে ধরে গালে তার ঠাই ঠাই করে গোটা কয়েক চড় কষে দিয়ে দুলালীকে বিয়ে করার সখ তার জন্মের মত মিটিয়ে দেয়। কিন্তু মোহন সেখানে বিয়ের বর, সব দিক দিয়েই হাত পা তার বাঁধা। বিশেষতঃ চাঁদরায় মাঝি নিজে যখন মধ্যস্থ হয়ে মজলিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যা হোক একটা বিচার করে দিলে, তখন তার উপর আর কোন কথাই চলতে পারে না। মোহনের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক না কেন, আর পাঁচজনের মতই চাঁদরায় মাঝির ব্যবস্থা তাকে মেনে নিতে হলো। সাঁওতালের ছেলে হয়ে তীর ধনুকের পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করবে সে কেমন ক'রে!

বিয়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রামপুর থেকে ফিরে এসে ধনুকে একটা নতুন করে ছিলা পরিয়ে নিলে মোহন। তীর আর হাবড়গুলোর

পালক পাল্টে বেশ শক্ত ক'রে কোঙার সুতো দিয়ে আগাগোড়া বেঁধে নিলে। লাঙলের একটা তীক্ষ্ণ ফালকে টুকরো ক'রে কাটিয়ে কামার-শালা থেকে গোটা কয়েক নতুন তীরও গড়িয়ে নিলে মোহন; শরকাঠি বাড়ীতেই ছিলো, কাঁড়ধেনুকের যাবতীয় সরঞ্জাম একদিনের মধ্যেই ঠিক ক'রে নিলে বেবাক। এই একমাসের মধ্যে যেমন ক'রে হোক তৈরি হতে হবে মোহনকে, নিশান তাকে বিঁধতেই হবে। টুংরায় হারাতে না পারলে দুলালী একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে মোহনের। মোহন সে-কথা ভাবতেও পারে না। যতবড় তীরন্দাজই হোক টুংরা—পরীক্ষায় মোহনকে জিততেই হবে, যেমন ক'রেই হোক।

নদীর ধারে ছোট্ট একটা পাহাড়ের নীচে নির্জ্জন মাঠের এক প্রান্তে একটা নিম গাছকে নিশান ক'রে তীরধনুক নিয়ে মোহন মাঝি সুরু করে কঠোর সাধনা। সকাল বিকাল নিঃশব্দে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, তীরধনুক হাতে নিয়ে, একাগ্র মনে নিমগাছের গুঁড়িটাকে লক্ষ্য করে দূর থেকে সে তীরের পর তীর ছুঁড়তে থাকে। সংসারের কাজকর্ম একেবারে ভুলে গেল মোহন, তীরধনুক হয়ে উঠলো তার একমাত্র সঙ্গী। নিশান যে তাকে বিঁধতেই হবে।

বৈশাখের মাঝামাঝি, বেলা আর বেশী নাই, সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে; সারাদিন তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে আঙুলের ডগায় টনটনে ব্যথা হয়ে গেছে মোহনের, তবুও সে নিশানা লক্ষ্য ক'রে পাহাড়ের ধারে বসে বসে ক্রমাগত তীর ছুঁড়ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, মানবের সাড়াশব্দ নাই। মোহন ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়লো। মাটির উপর হাঁটু গেড়ে নিমগাছের মগডালটাকে লক্ষ্য ক'রে ধনুকের ছিলায় জোর ভক্তি সে দিলে আর একটা টান, ডালটাকে বিঁধতে হবে। তীরের ডগা থেকে নিশান পর্য্যন্ত মোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন চুম্বকের মত সেঁটে গেছে কাল্পনিক এক সরল

ায়। ছিলা থেকে মোহন তীরটা যেমন ছাড়তে যাবে, অমনি হঠাৎ
ছন দিক থেকে মোহনের চোখ দুটো কে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলে।
হন হঠাৎ চমকে উঠলো, তীরটা আর ছাড়া হলো না। তাড়াতাড়ি
হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে, দুলালী তার মুখের
ক চেয়ে খিল খিল করে হাসছে। মোহনও একচোট হেসে
লো দুলালীকে দেখে, তারপর সে একটু চিন্তিত ভাবে বলে উঠলো,
কোন্ দিক দিয়ে এলি, কেউ দেখতে পায়নি ত?

দুলালী বললে,—না, জল ভরতে এসে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি।

মোহন একটু গম্ভীর ভাবে বললে,—এমন করে তুই আসিস না
লী, তোর বাপ যদি কোন রকমে জানতে পারে—ভয়ানক কিন্তু
ল হবে তখন।

দুলালী বললে,—মা সেদিন জানতে পেরেছে, পাড়ার একটা মেয়ে
মি ক'রে বলে দিয়েছিলো।

মোহন বললে,—বিয়ের আগে আমাদের মেলামেশা কোন রকমেই
বে না, সমাজের নিষেধ। টুয়াই মাঝি জানতে পারলে এই নিয়ে
ত একটা গোলমাল করতে পারে।

দুলালী একটু নাক সিটকে বললে,—বয়ে গেল, টুয়াই মাঝিকে ডরাই
কি!

মোহন একটু গম্ভীর ভাবে বললে,—কিন্তু দুলালী—

দুলালী হাসতে হাসতে বলে উঠলো,—থাঁড় চালা, থামলি যে?

মোহন বললে,—আজ আর, থাকগে, ছিলা টানতে টানতে
আঙুলগুলো ক্ষয়ে গেল। টুংরাকে আমি হারিয়ে দিব দুলালী, নিশ্চয়
হারিয়ে দিব।

দুলালী খুশী হয়ে বললে,—পারবি ত—ঠিক পারবি?

সগর্ব্বে জবাব দিলে মোহন,—পারবো না? সকাল বিকেল নদীর ধারে এসে করছি কি তবে! টুংরাকে যে হারাতেই হবে।

দুলালী বললে,—কদ্দূর তোর অভ্যেস হলো আজ একবার পরীক্ষা দে দেখি। মাটির এই কলসীটা মাথায় নিয়ে হুইখানে গিয়ে দাঁড়াই আমি, দূর থেকে তুই তীর মেরে কলসিটা কই ভাঙ দেখি।

মোহন একটু বিস্মিত ভাবে বললে,—কলসি, তোর মাথার উপর?

দুলালী বললে,—নিশ্চয়ই, নৈলে কেমন ক'রে জানবো যে টুংরাকে তুই হারাতে পারবি?

মোহন বললে,—না—না—তোর মাথার উপর দিয়ে তীর আমি কোন মতেই ছুঁড়তে পারবো না; তার চেয়ে বরং একটা কিছু নিশান—

দুলালী বললে,—এই আমার নিশান; এই নিশান তোকে বিঁধতে হবে, আমার হুকুম।

মোহন আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলো,—কি যে তুই বলিস দুলালী দৈবাৎ যদি কোন রকমে—

দুলালী একটু হেসে বললে,—তীরটা আমাকে বিঁধে ফেলে? ভালই ত, তীর খেয়ে আমি মাটির উপর লুটিয়ে পড়বো তোর চোখের সামনে মরবার আগে হাসতে হাসতে তোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাব। অন্য একটি মেয়ে এসে তোর গলায় আবার মালা দেবে, আমাকে তখন ভুলে যাবিনা ত?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—তোকে না পেলে আমি বাঁচবো না দুলালী, এ কথা তুই ভাল করেই জানিস, তবু তুই আমাকে এমন কথা বলতে পারলি!

হাসতে হাসতে দুলালী বললে,—সত্যি? সত্যি তুই বাঁচবি না মাকে না পেলে? কিন্তু টুংরাকে যদি হারাতে না পারিস? তাহলে ন্তু বিষ খেয়ে মরবো আমি, এই তোকে বলে রাখলুম।

দুলালী মোহনের ডান হাতটা চেপে ধরলে, তারপর আবার ল যেতে লাগলো,—পরীক্ষায় তোকে জিততে হবে মোহন, যেমন ক'রে াক হারাতে হবে টুংরা মাঝিকে, নৈলে আমাদের কোন উপায় ই।

দুলালীর স্পর্শে মোহনের দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। দুলালীর খর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে উঠলো মোহন,—জানি দুলালী, আমাদের রা জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা সব কিছু নির্ভর করছে সেই নকার ফলাফলের উপর। তুই শুধু একটিবার আমার চোখের সামনে ড়াস, তোর ওই সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে নিশান আমি ক ক'রে নেব, টুংরা মাঝির সাধ্য নাই সেদিন আমাকে টলায়, মি জিতবো—নিশ্চয় জিতবো।

দুলালী সায় দিয়ে বললে,—নিশ্চয়ই জিতবি, আমি জানি তুই নিশ্চয়ই তবি।

দুলালীর কথায় মোহনের মনের জোর আরও খানিকটা বেড়ে ল। দুলালী বললে,—কিন্তু তার আগে আমার সামনে তোকে ীক্ষা দিতে হবে একদিন, ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে।

মোহন বললে,— তাই দিব, বিয়ের ঠিক আগের দিন। তুই দেখে স দুলালী, যে হাতে মোহন মাঝি মাদলে চাটি মেরে গানের আসর মাত র দেয়, যেহাতে সে আড় বাঁশীর ফুটো দিয়ে রকমারি সুর ভাঁজতে রে,—সেই হাতে সে কাঁড় চালাতেও জানে। এমন কাঁড় আমি াব—যা দেখে তুই অবাক হয়ে যাবি।

নির্জ্জন নদীতীর। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে দুলালী আর মো
পরস্পরের মুখের দিকে। বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, সূর্য্যের সো
আলোয় রঙিন হয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশ। পাহাড়ের উপর থে
কুঁড়চি ফুলের মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে ফুরফুরে হাওয়ায়। দুলালী মোহ
কাঁধের উপর ডান হাতটা এলিয়ে দিয়ে বললে,—মোহন, চল্ না এ
পাহাড়ের উপর ঘুরে আসি।

মোহন বাঁহাত দিয়ে দুলালীকে জড়িয়ে নিলে, বললে,—যাবি, চল্। থাক্ এই খানে আমার কাঁড় দেনুকটা পড়ে, তোর কলসি ততক্ষণ পাহারা দিক, কি বল্?

হো হো করে হেসে উঠলো দুজনেই।

নদীতীরে ছোট্ট একটি পাহাড়। রকমারি গাছপালায় নীচে থে উপর পর্যন্ত সমস্তটা ঢাকা। পাহাড়ে উঠবার সঙ্কীর্ণ সরুপথ বিলকুল এদের চেনা। পাহাড়ের প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি পুরা গাছ, ছায়ায় ঢাকা কালো পাথরের বেদী, সব কিছু এরা চোখবুজে দেখতে পায়। পাথরের চাতাল ভেঙ্গে কিছুটা দূর উপর দিকে উ গিয়ে দুলালী হঠাৎ বসে পড়লো একটা কুসুমগাছের নীচে, বললে —আর আমি হাঁটতে পাচ্ছি না, এইখানে একটু বসি।

মোহন বললে,—সেকি, উপরে উঠবি না?

দুলালী কুসুমগাছে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লো, বললে,—উঃ পা দুটো কনকন করছে।

মোহনের দিকে আড়চোখে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে দুলালী। মোহন বললে,—না—সেটি হবেক নাই, উপরে তোকে উঠতেই হবে এদ্দূর যখন এসেছি তখন টুই পর্য্যন্ত তোকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে আমি!

মোহন হঠাৎ দু'হাত দিয়ে পাঁজাকোলা ক'রে দুলালীকে তুলে পাহাড়ের সরু পথ দিয়ে উপর দিকে উঠে যেতে লাগলো। ী মোহনকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে হাসতে হাসতে বলে উঠলো, াড়—ছাড়—করিস কি মোহন, ছাড়।

মোহন বললে,—ছাড়বো কিস্কে, একেবারে হুইখানে গিয়ে ছাড়বো। দুলালীকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় একটা কালো পাথরের লের উপর বসিয়ে দিলে মোহন। দুলালী তাড়াতাড়ি বুকে পিঠে ড় টেনে দিয়ে বললে,—তুই যেন একেবারে কি, একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান ক।

মোহন শুধু একবার ফিক্ ক'রে হেসে উঠলো। তারপর সে কগুলো কুঁড়চি ফুল তুলে এনে নিজের হাতে গুঁজে দিলে দুলালীর পায়। মোহন বললে,—একটা গান গা'না দুলালী, বেশ ভাল দেখে টা 'দং সিরিং'।

দুলালী বলে উঠলো,—ইঃ—দং সিরিং না আর কিছু, দং সিরিং আমি ইতে পারবো না। লাগ্ড়ে সিরিং শুনবি? বাহা, ডাহার, শালুই, শুনবি বল্?

মোহনের কোলে মাথা রেখে ঝুপ ক'রে শুয়ে পড়লো দুলালী থরের চাতালটার উপর। মোহন ধীরে ধীরে দুলালীর মাথায় হাত লিয়ে দিতে লাগলো, বললে,—লাগা তবে একটা লাগড়ে সিরিং।

গুন্ গুন্ ক'রে একটা গান ধরলে দুলালী, গলাখানি তার চমৎকার। ালীর গানের সুর মোহনের অন্তরের প্রত্যেকটি কেন্দ্রকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পূর্ব্ব এক পুলক দোলায় মোহনকে যেন দোল খাওয়াতে লাগলো। াহন হঠাৎ বলে উঠলো,—বড্ড ভুল হয়ে গেছে দুলালী, আড়বাঁশীটা ী আজ নিয়ে আসতুম।

দুলালীর গানের সঙ্গে মোহনের আড়বাঁশী, সত্যিই চমৎকা হতো।

স্বপ্নাবিষ্টের মত দুলালীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একদ চেয়ে আছে মোহন। বাইরের জগৎ যেন হারিয়ে গেছে ওদের কাছে হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে সামনের গাছপালা গুলোকে শোঁ শব্দে দুলিয়ে দিয়ে গেল; ঈশান কোনে মেঘ উঠেছে, মোহনের হঠা চমক ভাঙ্গলো। আকাশের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল মোহন,—এই বেলা চল্ পালাই।

দুলালী তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। কালবৈশাখীর মেঘ তখ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে নেমে এ পাহাড় থেকে। মাটির কলসিটা কাঁকের উপর তুলে নিয়ে দুলালী ব উঠলো,— তাড়াতাড়ি এবার ঘরে ফিরতে হবে, সন্ধ্যে হয়ে গেছে—আ পালাই।

কাঁড় ধেনুকটা কাঁধের উপর তুলে নিলে মোহন। ঝম্ ঝম্ শ হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এলো। কলসি কাঁকে দুলালী তখন ছুটতে আর করেছে, ঝড়বৃষ্টির গতিক দেখে মোহন আবার পিছন থেকে ডাক দি দুলালীকে। দুলালী একটু থমকে দাঁড়ালো, মোহন তাড়াতাড়ি ছু গিয়ে বললে,—আর, একটুখানি থেমে যা,—ভিজে যাবি যে; ঐ কুঁড়েটায় গিয়ে ঢুকে পড়ি চল্।

দুলালী মাথায় খানিক কাপড় টেনে দিয়ে বললে,—তাই চল্, ঝ না ছাড়লে আর যেতে লারবো।

নদীর ধারে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। ধানক্ষেতে পাহারা দেবার জ কয়েক মাস আগে ওটা তৈরি করা হয়েছিলো। ধান উঠে যাওয়া পর থেকে এমনি ওটা ফাঁকাই পড়ে আছে। মোহন আর দুলা

তে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়লো কুঁড়ের মধ্যে। ঝড়ের দোলায় থেকে
ক দুলে উঠতে লাগলো কুঁড়েখানা, আশপাশের ফুটো দিয়ে
শোঁ শব্দে বৃষ্টির ছাট ঢুকতে আরম্ভ করেছে। দরজার আগুড়টা
র থেকে টেনে ধরে' একটা খুঁটির সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধে দিলে
ন। কালবৈশাখীর ঝড়, কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক আবার ফরসা
গেল। দুলালী যেন এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, এবার তাকে
ফিরতে হবে,—ভয়ানক দেরি হয়ে গেছে।

দোরের আগুড়টা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে মোহন। বাইরে তখন
কার ঘনিয়ে এসেছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে তখনো।

নদীর ওপার থেকে জোরগলায় হঠাৎ কে হেঁকে উঠলো,—দুলালী—
লী আছিস—ও দুলালী!

দুলালী আর মোহন চমকে উঠলো দু'জনেই। রাবণ মাঝির গলার
য়াজ, দুলালীকে সে খুঁজতে এসেছে।

কুঁড়েঘরের বাইরে এসে দুলালীকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো মোহন।
ছা সেই অন্ধকারে দূর থেকে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। কিন্তু
াবে চুপ চাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত ধরা পড়ে যেতে
। দুলালী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—আমি এবার পালাই—ওই
দিয়ে, তুই ও শিগ্‌গীর বাড়ী চলে যা।

মোহন বললে,—অন্ধকারে একলা যাবি কেমন করে, আমি না
খানিক দাঁড়িয়ে দিয়ে আসি।

দুলালী বাধা দিয়ে বললে,—না—না—একলা আমি ঠিক যেতে
বো।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়লো দুলালী।
ভুঁইয়ের পাশ দিয়ে শরমানার ধারে ধারে গুঁড়ি বেয়ে সে এগিয়ে

চললো বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে। এপারে মোহন মাঝি ধান ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠলো গিয়ে সদর রাস্তায়।

ওপার থেকে রাবণ মাঝি থেকে থেকে ডাক দিচ্ছে,—দুলালী—দুলালী!

দুলালী তখন রামপুরের ধারে, মোহনও প্রায় ঘুসরুকাটার কাছাকাছি।

তিন

টুশকী মেঝেন, দুলালীর মা। দুলালীর বিয়েটা হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে টুশকী একটু মনমরা হয়ে পড়েছে। মোহনের মত ছেলে দৈবাৎ যদি হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে আর আপসোসের শেষ থাকবে না। টুশকী মেঝেন জানে—দুলালী আর মোহন দু'জনেই ভালবাসে দু'জনকে। টুংরার সঙ্গে দুলালীর বিয়ে হলে কল তার কোন দিক দিয়েই ভাল হবে না। দুলালীর মুখে হাসি নাই, সংসারের কাজ-কর্ম্মে উৎসাহ তার দিন দিন যেন কমে আসছে। দুলালীর মনের ভাব টুশকী মেঝেন বুঝতে পারে সবই, দুলালীর সে মা। কিন্তু বুঝেও কিছু করবার তার উপায় নাই, রাবণ মাঝির গোঁ, যে কথা সে মুখ দিয়ে একবার বের করবে, তার আর নড়চড় হবার উপায় নাই। সেদিন যদি জোর করে মোহনের সঙ্গে দুলালীর বিয়ে দিয়ে দিতো রাবণ, কি করতো টুয়াই মাঝি! কিন্তু সালিসের বিচার রাবণ মাঝি মেনে নিয়েছে, ব্যস্—আর তাকে টলায় কে। ভুলেও সে একবার ভেবে দেখলে না মেয়েটার কথা। টুংরার সঙ্গেই যদি শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে দিতে হয় দুলালীর, মেয়েটা যে কোনমতেই সুখী হতে পারবে না—রাবণ মাঝি সে কথাটা

একবারও ভেবে দেখলে না। টুশকী মেঝেন এর জন্য কত ঝগড়া করেছে রাবণ মাঝির সঙ্গে, রাবণ মাঝি কিন্তু নির্ব্বিকার, টুশকীর কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না রাবণ; যা করবার সে ঠিকই করে যাবে।

দুলালীর বিয়ের দিন আবার কাছিয়ে আসছে। নতুন ক'রে উদ্যোগ আয়োজন সব কিছুই আবার করতে হচ্ছে টুশকী মেঝেনকে; মেয়ের বিয়েতে নিশ্চেষ্ট থাকা তার কোন রকমেই চলে না, মেয়ের যে সে মা, সংসারের সকল দায়িত্ব যে তারই উপর।

কতকগুলো নোয়ান ধান সিদ্ধ ক'রে এক জায়গায় শুকিয়ে রেখেছে টুশকী মেঝেন, ধান ভেনে চাল করতে হবে বরিয়াতদের ভোজের জন্য। লোকজনের সমারোহ আগেরবারের চেয়ে এবার অনেক বেশি হবে, বরযাত্রী আসবে প্রায় ডবল, ঘুঘরুকাটা আর ভালুকপোতা—লোক-সংখ্যায় কোন দলই কম হবে না। রাবণ মাঝি তাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করছে ডবল মাত্রায়, সে দিক দিয়ে কোন ত্রুটী করা চলবে না। টুশকী মেঝেন রাবণ মাঝির ব্যবস্থা মত উদ্যোগ আয়োজন ক'রে যাচ্ছে সবই, কিন্তু ভিতর থেকে সে যেন বেশ সাড়া পাচ্ছে না। ক'দিন থেকে বাঁ-চোখটা তার নাচছে, লক্ষণ বেশ ভাল মনে হয় না শকীর; কে জানে, মেয়েটার বরাতে যে শেষ পর্য্যন্ত কি আছে!

পাড়ার দু'টি মেয়ে রাবণ মাঝির ঢেঁকিশালায় ঢেঁকির উপর চড়ে ন ভানছে, ঢেঁকির গড়ে হাত বুলুচ্ছে দুলালী। টুশকী মেঝেন ঢেঁকির ক পাশে বসে কুলো দিয়ে চাল ঝাড়ছে, সামনে তার রাশিকৃত হয়ে ঠেছে তুষ আর কুঁড়ো। ক্যাঁক ক্যাঁক ক'রে শব্দ উঠছে ঢেঁকির য়া দুটো থেকে। তারই তালে তাল দিয়ে ভানাড়ীরা গান ধরেছে,— াওতালদের ডাঙ্গালিয়া গান। দুলালীও গেয়ে যাচ্ছে ওদের সুরে সুর মিলিয়ে। টুশকী মেঝেন একমাত্র শ্রোতা, গান শুনতে শুনতে

কত কথাই ওর মনে হচ্ছে। তারও একদিন ছিলো, বয়েস কালে নাচ আর গান নিয়ে সেও একদিন মেতে থাকতো। 'ছাতা পরবের' মেলায় টুশকী মেঝেনের নাচ দেখে রাবণ মাঝি তাকে পছন্দ ক'রে এসেছিলো। সেই বছরই ফাগুন মাসের শেষের দিকে শালুই পূজোর ঠিক আগের দিন রাবণ মাঝির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যায়। রাবণ মাঝি তখন কি সুন্দর মাদল বাজাতো। সে আজ প্রায় দেড়কুড়ি বছর আগের কথা, টুশকী যেদিন নতুন বৌ সেজে রাবণ মাঝির ঘর করতে এসেছিলো। টুশকীর শ্বশুর বুড়োর আমলে পাঁচ বিঘা ডাঙ্গা জমির চাষ ছিলো মোটে। রাবণ মাঝি নিজের হিম্মতে আজ পাঁচ খানা লাঙ্গলের মালিক। বড় কোঠাঘরখানা যেখানে তোলা হয়েছে ওখানটায় আগে শূয়োরের খোঁয়াড় ছিলো, ছোট একটা চালাঘরের পাশে। উঠানের একধারে কদম গাছের ছায়ায় ছোট ছোট দু'টি কালো রঙের দামড়া বাঁধা থাকতো, হালের হেতের। গোয়াল ঘরের পিছন দিকটা ছিলো ফাঁকা ডাঙ্গা। বুড়ো মাঝি—রাবণ মাঝির বাপ—কুত্তি কলাই বুনতো ওই ডাঙ্গাটায়। কোন বছর বা খেটে খুটে দু'পাঁচসের পাওয়া যেতো, কোন কোন বছর মুরগী চ'রেই সাবাড় ক'রে দিতো বীজ শুদ্ধ। বুড়ো মাঝি শেষে ঝিক মেরে ছেড়ে দিয়েছিলো কুত্তি বোনা, বাড়ীর পিছনে খাঁ খাঁ করতো শুকনো ডাঙ্গাটা। সেই ডাঙ্গার চারিদিকে দেওয়াল তুলে মস্তবড় খামার ক'রে নিয়েছে রাবণ মাঝি, আজ আর তাদের অভাব কিছু নাই। ঘরসংসার গড়ে তুলতে কি খাটনিই না খেটেছে একদিন টুশকী মেঝেন। টুশকী নৈলে রাবণ মাঝির ঘর চলতো না একটি দিনও, টুশকী মেঝেনের কর্ত্তৃত্ব বরাবর মেনে এসেছে রাবণ মাঝি। আজ কিন্তু দুলালীর বিয়ের ব্যাপারে কোন কথাই শুনলে না সে টুশকী মেঝেনের, পাঁচজনের সাক্ষাতে যে স্বত্ব একবার মেনে নেওয়া হয়েছে—তার

আর কোন নড়চড় হবার উপায় নাই, মেয়ের ভাগ্যে তাতে যাই না ঘটুক।

বৈশাখ মাসের কাঠফাটা রোদ্দুর খাঁ খাঁ করছে সারা উঠান জুড়ে, বেলা প্রায় দুপুর। দো-বাড়ীতে লাঙ্গল দিয়ে রাবণ মাঝি বাড়ী ফিরলো। বলদ দুটোকে দোর গোড়ায় খুলে দিলে রাবণ মাঝি, তারপর সে হাল জোঁয়াল আর জুড়নের দড়িগাছটা তুলে দিলে গিয়ে গোয়াল ঘরের আড়াচে। রাবণ মাঝির সাড়া পেয়ে ঢেঁকিশাল থেকে বেরিয়ে এলো দুলালী, পাতকুয়া থেকে এক ঘটী জল তুলে তাড়াতাড়ি সে রাবণ মাঝির হাতে দিলে। হাত পা ধুয়ে বড়ঘরের চালায় একটা চাটাই পেতে বসে পড়লো রাবণ, গা দিয়ে তার কল্ কল্ ক'রে ঘাম ঝরছে। দুলালী একখানা গামছা রাবণ মাঝির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, —খানিক বাওড় ক'রে দিব বাবা, গা-টা রোদে পুড়ে গেল যে।

রাবণ মাঝি গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললে,—না—ত, কিসকে উসব, আমাদের আবার রোদ আর বিষ্টি।

রাবণ মাঝি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললে,—হঁ ভাল কথা, তোর বেড়ি কাঁকুড়ে জালি ধরেছে; কাঁকুড় যা এবার ফলবে দুলালী—জালি পড়েছে একেবারে ঘুঙুর গাঁথা হয়ে। যাস কাল একবার মাঠদিকে, কাঁকুড়গুলো তোর দেখে আসবি।

দুলালীর মুখখানা খুশির আমেজে ভরে উঠলো। আখবাড়ীর ধারে ধারে সখ ক'রে সে বেড়ি কাঁকুড়ের বীচি পুতেছে এবার নিজের হাতে। দুলালী খুব খুশী হয়ে বললে,—গোড়াগুলো খানিক কুঁড়ে দিয়ে এলি ত ?

রাবণ মাঝি হাসতে হাসতে বললে,—বা রে, তুই খাবি কাঁকুড়, আর বুড়োহাবড়া গতর নিয়ে আমি মরবো মাটি কুঁড়ে! সেটি হবেক নাই, তোর গাছ তুই নিজে কুঁড়বি।

রাবণ মাঝি হো হো ক'রে হেসে উঠলো নিজের মনেই। হাল্লের কাজ ফেলে হৈ হৈ ক'রে ছুটে এলো টুশকী মেঝেন, পাক্‌নার ভিজে ধানে মুখ ডুবিয়ে বলদ দুটো ধান খেতে আরম্ভ করেছে, কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। দুলালী তাড়াতাড়ি বলদ দুটোকে তাকিয়ে নিয়ে গিয়ে গোয়াল ঘরে বেঁধে দিয়ে আঁটি কয়েক খড় ফেলে দিলে মুখের সামনে। টুশকী মেঝেন হেঁসেল ঘরে ঢুকলো গিয়ে রাবণ মাঝির পান্তা ভাতের ব্যবস্থা করতে।

'দা-মাড়ি' খাওয়া শেষ ক'রে রাবণ মাঝি একটা শালপাতার চুটি ধরিয়ে বসে বসে টানছে। কিষ্টু মাঝি গোটা কয়েক ছাগলের গলায় লেয়ালির দড়ি দিয়ে বেঁধে পিছন দিক থেকে তাড়া করতে করতে রাবণ মাঝির বাড়ী ঢুকলো এসে, দুলালীর বিয়ের দিন এগুলো কাজে লাগবে। রাবণ মাঝি ছাগল গুলোর দিকে চেয়ে মনে মনে গুনে নিয়ে বললে, —আর দুটো? সাতটার যে আমি দাম দিয়ে এসেছিলাম মাতলাকে।

কিষ্টু বললে,—ছাগল দুটো কম পড়ে গেল সদ্দার, কাল রাত্তির বেলা মাতলা মাঝির দুটো ছাগল বাঘে ধরে নিয়ে গেছে, পাহাড় থেকে নাকি বাঘ নামছে রোজই।

রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—এঁ্যা—বলিস কিরে! সেদিন শুনলুম বাবুপুরের কলুদের একটা দামড়া মেরেছে, রথতলার চৌকিদারকে বাঘে নাকি আগুলেছিলো সেদিন সন্ধ্যার সময়—মদ দোকান থেকে ফিরবার পথে। বাঘটাকে মারতে না পারলে ত বিলকুল ডামাডোল ক'রে দিবেক দেখছি।

কিষ্টু বললে,—ও গাঁয়ের মাঝিরা সেদিন উঠেছিলা পাহাড়ে, বাঘ কিন্তু মারতে পারে নাই। বাঘটা শুনছি ঝিঙেফুলি!

রাবণ মাঝি একটু চিন্তিত ভাবে বললে,—এঁ্যা—ঝিঙেফুলি, তাহলে

-ত মানুষ মারবেক। চল্ একদিন জুটে পুটে সব, যেমন করে হোক ওটাকে শেষ করতে হবে।

কিষ্টু মাঝি কাপড়ের খুঁট থেকে কয়েকটি টাকা বের ক'রে রাবণ মাঝির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—ছাগল দুটোর দাম মাতলা ফিরে দিয়েছে।

রাবণ মাঝি বললে,—তাহ্‌লে ? ছাগল যে আরও চাই।

কিষ্টু মাঝি জবাব দিলে,—ছাগল আমি দুটো ঠিক করে এসেছি সদ্দার, ধবোনার লছো মাঝির ঘরে ; কালই গিয়ে নিয়ে আসবো !

রাবণ বললে,—টাকা গুলো তবে তোরই কাছে রেখে দে।

কিষ্টু মাঝি আবার যত্ন ক'রে টাকা কয়েকটা বেঁধে রাখলে কাপড়ের খুঁটে। রাবণ মাঝি খানিকটা শুকনো তামাক পাতার টুকরো আর শালপাতার গোটা দুই ফালি কিষ্টুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, —চুটি খা।

খইনির টুকরোটাকে গুঁড়ো করে শালপাতার নলের মধ্যে গুঁজে গুঁজে চুটি বানাতে লাগলো কিষ্টু। আগুন ঠেকিয়ে চুটিটা ধরিয়ে টানতে টানতে বললে—ডিংলে বেচবি সদ্দার ? ভাঙ্গাহীড়ের কায়েত ঘরে বিয়ে লেগেছে, কুড়ি দেড়েক ডিংলে চাই ওদের, কাল তোর কাছে ওরা লোক পাঠাবে।

রাবণ মাঝি চুটির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে,—ডিংলে ত আমার দেওয়া চলবেক নাই, কুড়ি তিনেক ডিংলে পড়ে আছে মাঠে, দুলালীর বিয়েতেই বেবাক শেষ হয়ে যাবে।

কিষ্টু বললে,—আমিও ত সেই কথাই বললুম। কায়েতরা কি বলে জানিস ডিংলেকে ? বলে কুমড়ো, ডিংলেকে বলে কুমড়ো !

নিজের মনেই হিহি করে হেসে উঠলো কিষ্টু। রাবণ মাঝি হাসতে হাসতে বললে,—বল্লিস কিরে, ডিংলেকে বলে কুমড়ো; কুমড়ো ত তুগ্‌গো পূজোর সময় বলিদান দেয় বাঁবড়ে ঠাকুররা।

হো হো ক'রে আর এক চোট হেসে উঠলো তুজনেই। রাবণ মাঝি টুশকী মেঝেনকে একটা হাঁক দিয়ে বললে,—মদের ভাঁড়টা একবার আন দেখি।

পচুই মদ এরা বাড়ীতেই তৈরি ক'রে খায়। টুশকী মেঝেন একটা ভাঁড় হাতে ক'রে হেঁসেল ঘরে ঢুকলো গিয়ে মদ তৈরি করতে।

কিষ্টু মাঝির বৌ মহুল দিয়ে কয়েক সের ধান নিয়ে গেল টুশকী মেঝেনের কাছ থেকে, রাবণ মাঝি দূর থেকে সেটা লক্ষ্য করেছে। কিষ্টুর দিকে চেয়ে রাবণ মাঝি বলে' উঠলো,—এখন থেকে মহুল বেচছিস কেনে কিষ্টু? বর্ষায় যে ওর দাম উঠবে ডবল।

কিষ্টু মাঝি অভাবী লোক, অনেকগুলি কাচ্ছা বাচ্ছা ছেলে পিলে নিয়ে কিষ্টু একটু কাবু হয়ে পড়েছে। মহুল না বেচে উপায় কি তার! ধরতে গেলে আজ কাল ওদের মহুল বেচেই কোনরকমে দিন চালাতে হয়। রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে কিষ্টু,—কি করবো সদ্দার, মহাজনের দেড়ি শুধতেই ধান ক'টা সব ফুরিয়ে গেল বেবাক্, ভয়ানক টানাটানি চলছে কিছু দিন থেকে।

রাবণ মাঝি একটু উষ্ণ কণ্ঠে বললে,—আমাকে সে কথা জনাস নাই কেনে?

কিষ্টু মাঝি একটা ঢোক গিলে বললে,—গত বছরের দেনা তোর এখনো শুধতে পারি নাই, তার উপর—

রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—তা বলে কি ছেলে পিলে গুলোনকে না খাইয়ে মারবি। মাপ খানেক ধান কাল নিয়ে যাবি এসে, আগন মাসে শোধ ক'রে দিস।

কিষ্টু মাঝির মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। সময় অসময় বহু লোককেই ধার কর্জ্জ দিয়ে দায় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হয় রাবণ মাঝিকে, অভাবে পড়ে কেউ তার দ্বারস্থ হলে খালি হাতে তাকে ফিরতে হয় না প্রায়ই। রাবণ মাঝির অবস্থা খুব আঁটা, সেই সঙ্গে মনটাও তার খাটো নয় কোনদিক থেকেই।

কিষ্টু আর রাবণ পালাপালি ক'রে মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে।

দূর থেকে হঠাৎ কিসের যেন একটা গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল, বহুলোক যেন একসঙ্গে চীৎকার করছে। ব্যাপারটা ধারণা করবার পূর্ব্বেই পাশের গাঁয়ের জনকয়েক সাঁওতাল তীর ধনুক হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ালো। রাবণ মাঝি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কি রে—সব ব্যাপার কি ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো একজন,—পাহাড় থেকে বাঘ নেমেছে সদ্দার, আমরা ওটাকে তাড়া করেছি। তোরা শুদ্ধ ছুটে আয় সদ্দার, বাঘটাকে ঘেরাও করতে হবে। হুই—হুই দেখ—হুই যাচ্ছে—পলাশ বনের ধারে।

রাবণ মাঝি পাড়ার লোকদের হুকুম দিলে,—শিগ্‌গীর যেন তারা বেরিয়ে পড়ে লাঠি সোঁটা তীর ধনুক নিয়ে, এক লহমা আর দেরি করা চলে না, বাঘটাকে মারতেই হবে।

চটপট সব তৈরি হয়ে রাবণ মাঝির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো প্রায় কুড়ি চারেক সাঁওতাল। অন্যান্য দলের সঙ্গে মিশে বাঘটাকে ওরা দূর থেকে তাড়া করতে লাগলো। একসঙ্গে সব হৈ শব্দে চীৎকার ক'রে চলেছে,—হেইয়ো—হেইয়ো—হেলে লে লে—লেলে লেলে হৈ—!

পলাশ বন পার হয়ে কাটিজঙ্গলের আশেপাশে গোটাকয়েক চক্কর মেরে বাঘটা তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেছে পাহাড় দিকে মুখ ক'রে। পিছন থেকে জনতার চীৎকার উঠছে,—হে-লে-লে-লে-লে-লে—লে-লে—হৈ—।

চার

বাঘটাকে সেদিন তাড়া ক'রে ক'রে যথেষ্ট হায়রাণ করা হলো, কিন্তু ওর নাগাল পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত। এতগুলো লোকের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বাঘটা যে কখন আশে পাশে চক্কর মারতে মারতে পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠে পড়লো—কিছুমাত্র বোঝা গেল না। খোঁজ করতে করতে সন্ধ্যা লেগে গেল। অন্ধকারে পাহাড়ে উঠে লাভ নাই কোন, বাঘ মারা স্থগিত রেখে শিকারীদের সেদিন বাড়ী ফিরতে হলো।

পাহাড়ের চারিদিকে শালগাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল, নীচে থেকে আরম্ভ ক'রে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত সমস্তটাই গাছপালায় ঢাকা। পাহাড়ে উঠবার রাস্তা আছে দু'তিনটে, অতি সঙ্কীর্ণ সরু পথ দিয়ে খুব সাবধানে উঠে যেতে হয়। পাহাড়টা খুব বড় নয়, মাঝামাঝি। এ পাহাড়ে বড় বাঘ খুব কমই আসে, ভালুক, আধবাঘা, হেঁড়োল বা চিতাবাঘ মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। তরণীর পাহাড় থেকে বড় বাঘও কখনো কখনো এসে পড়ে এক আধটা। কোনটা বা দু'চার দিন থেকে নিজের খেয়ালেই চলে যায় আবার অন্য পাহাড়ে, কোনটাকে বা চেষ্টা ক'রে তাড়াতে হয়। ওদের মধ্যে এক আধটা আবার সাঁওতালদের হাতে মারাও পড়ে যায়; এই হলদিগড়ের পাহাড়েই বাঘ এর আগে অনেকগুলোই মারা পড়েছে। পাহাড়ের চারিদিকে দু'এক মাইলের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলো সাঁওতালদের বস্তি, বাঘ এলে এদেরই হয় মুস্কিল; মানুষ অবশ্য বড় বেশি মারা পড়ে না, কিন্তু গরুবাছুর ছাগল ভেড়া ধরে নিয়ে যায় প্রায়ই।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পাহাড়ের উপর বাঘটাকে সেদিন ছেড়ে দিয়ে সাঁওতালরা বাড়ী ফিরে গেল। যুক্তি স্থির হলো পরদিন দুপুরবেলা দু'

চপানা গাঁয়ের সাঁওতাল মিলে লাগরা বাজিয়ে সব পাহাড়ে উঠবে য়ে। মস্ত একটা পাথরের সুঁদ আছে পাহাড়ের চূড়ায়, বাঘটা সম্ভবতঃ ই সুঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অভ্যাগত জন্তুজানোয়ার এসে াধারণতঃ আড্ডা নেয় ওই সুঁদটার মধ্যে। লাগরার শব্দ ক'রে বা ধাঁয়া দিয়ে বাঘকে সেখান থেকে বের করতে হবে যেমন ক'রে হোক। ওটাকে কোন রকমে মারতে না পারলে কারো কল্যাণ নাই।

এর আগে সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে লোকজন এসে কতবার গুলি ক'রে বাঘ মেরে গেছে এই হলদিগড়ের পাহাড়ে। ঢের দিন আগের কথা, সে-বার এক পুলিসের ইনস্‌পেক্টার এসেছিলেন হলদিগড়ে বাঘ মারতে। সে একটা স্মরণীয় ঘটনা। এ অঞ্চলের জন তিরিশেক চৌকিদার আর কুড়ি তিনেক সাঁওতালের ডাক পড়েছিলো শিকারের কাজে মদত দিতে। ঠিক এমনি গ্রীষ্মকাল, পাহাড়ের চারিদিক লোকজন দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছে। ইনস্‌পেক্টার সাহেবের ঘাড়ে বন্দুক, চারিদিক থেকে বাজনার শব্দ করতে করতে দলবল নিয়ে তিনি পাহাড়ে উঠছেন, পিছনে তাঁর থানার ছোট দারোগা, অর্থাৎ জমাদার সাহেব, তাঁর পিছনে পুলিশের এক সর্দ্দার; তাঁদের ঘাড়েও বন্দুক। আশেপাশে কয়েকজন চৌকিদার বল্লম হাতে ইনস্‌পেক্টার বাবুদের ঘেরাও ক'রে চলেছে বাঘ মারতে, সকলের দৃষ্টি সজাগ এবং সতর্ক।

বাঘ এই পাহাড়েই আছে, মাঝে মাঝে গর্জ্জন শোনা যায়। হলদিগড় গাঁয়ের অনেকেই নাকি নিজের চোখে দেখেছে বাঘটাকে পাহাড়গোড়ায় ঘুরে বেড়াতে, প্রকাণ্ড ঝিঙেফুলি বাঘ। গরু ছাগলও কয়েকটা মারা পড়ে গেছে, বহু চেষ্টা ক'রেও বাঘটাকে কেউ মারতে পারে নি। সংবাদ পেয়ে ইনস্‌পেক্টার সাহেব নিজে এসেছেন বাঘ মারতে। পাহাড়ের চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের উপর তিনি উঠে

যেতে লাগলেন, খুব সাবধানে। যে কোন মুহূর্ত্তে বাঘ হয়ত সামনে পড়তে পারে।

পাহাড়ের প্রায় মাঝামাঝি উঠে গেছে শিকারীর দল, ঝোপের আড়াল থেকে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো,—বাঘ—বাঘ—হুজুর, ওই দেখুন বাঘ।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সজাগ হ'য়ে উঠলো সকলেই। সর্দ্দার বাবুর ঘাড়ে ছিলো একটা বন্দুক, 'বাঘ' 'বাঘ' শব্দ শুনেই বন্দুকটা সেইদিকে উঁচিয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে সে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলে। গুড়ুম ক'রে একটা আওয়াজ হলো, ধপ্ ক'রে পড়লো কি একটা মাটির উপর; ঝোপের ওপাশ থেকে হঠাৎ চীৎকার উঠলো,—উঃ মাগো—গেলুম, সর্দ্দার বাবু—এ আপনি কি করলেন সর্দ্দার বাবু!

চমকে উঠলেন ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব। সর্দ্দার বাবুর পা টলছে, শিকারে বেরোবার আগে মদ খেয়ে তিনি রীতিমত নেশা ক'রে এসেছেন। নেশার ঝোঁকে তিনি বাঘ বাঘ শব্দ শুনেই বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিয়েছেন, চোখ মিলে চাইবার আর অবসর পান নি। নেশার ঘোরে সর্দ্দারবাবু টোর হয়ে আছেন।

কাছে গিয়ে দেখা গেল একটা সাঁওতাল চৌকিদার আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটির উপর, বুক বেয়ে তার ঝর ঝর ক'রে রক্ত ঝরছে, বন্দুকের গুলিটা এপার ওপার হয়ে গেছে বুকের মধ্যে। দেখে শুনে ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর আক্কেল গুড়ুম, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন,—ওরে নামা—নামা—পাহাড় থেকে একে নামা, শিগ্‌গীর হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

সর্দ্দার বাবুর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, টলতে টলতে তিনি এগিয়ে গিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের সামনে দাঁড়ালেন। ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব বলে

লেন,—সর্দ্দার—এ তুমি কি করলে সর্দ্দার, কি সর্ব্বনাশ—তোমার যে বার বন্দুকের লাইসেন্স পর্য্যন্ত নাই।

সর্দ্দারের হাত থেকে ছোট দারোগা বন্দুকটা কেড়ে নিলেন। আহত াকটার ক্ষতস্থানে বেশ শক্ত ক'রে কাপড় বেঁধে ধরে পাকড়ে তাকে াড় থেকে নামানো হলো নীচে। ক্রোশ তিনেক দূরে জেলাবোর্ডের টি একটা হাসপাতাল, ডুলি ক'রে কয়েকর্জন চৌকিদারের জিম্মায় সেই াসপাতালেই লোকটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মাঝিরা সব এ ব্যাপারে ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় মৌজার গোমস্তা পচন মাহাতো পুলিসের লোকের বিশেষ অনুগ্রহভাজন, তাঁদেরি কাজে মদৎ দিতে এসেছে। ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবকে একান্তে চুপি চুপি ডেকে একটু ভীতকণ্ঠে বলে উঠলো পচন মাহাতো,—কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেল হুজুর! আপনারা এক্ষুনি এখান থেকে সরে পড়ুন, নৈলে সাঁওতালরা হয়ত হাঙ্গাম বাধাবে; যদি বাঁচতে চান—শিগ্‌গীর পালান।

ঢাই ঢাই ক'রে বুক কাঁপছে ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের। হতভম্বের মত তিনি বলে উঠলেন,—শিগ্‌গীর পথ দেখাও গোমস্তা, কোন্ দিক দিয়ে পালাতে হবে দেখিয়ে দাও খুব শিগ্‌গীর।

গোমস্তা পচন মাহাতো ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুদের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে যাবার একটা সোজা পথ দেখিয়ে দিয়ে চটপট সরে পড়লো নিজেও। ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অতি সন্তর্পণে সেখান থেকে সরে পড়লেন দলবল সমেত।

সাঁওতালরা সব পাহাড়ের নীচে এসে এক জায়গায় জমা হতে লাগলো। চৌকিদারকে গুলি করার ব্যাপার নিয়ে সকলেই অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সকলের মুখেই এক কথা,—মানুষ মারতে কে

ডাকলেক উয়োদিকে, বঁদুক ছুঁড়তে জানে না ত বাঘ মারতে এসেছিলো কেনে,—এই ধরণের আরও বহু মন্তব্য।

সাঁওতালরা সব ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলো, বললে,—মারবো আমরা সেই লোকটাকে—কাঁড় দিয়ে বিঁধে মারবো, যে আমাদের চৌকিদারকে গুলি করেছে। সাঁওতাল সর্দ্দার গর্জ্জে উঠলো রাগে, বললে,—ঘেরাও কর বেটাদের, চারদিক থেকে ঘেরাও ক'রে ফেল শিগ্‌গীর। বেটারা সব গেল কোন্ দিকে ?

একটা লোক এসে খবর দিলে,—হল্‌দিগড়ের গোমস্তা পচন মাহাতো শিকারীদের চুপি চুপি পাহাড় থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

পাহাড়ের খুব কাছাকাছি হলদিগড় গ্রাম। বিক্ষুব্ধ সাঁওতালের দল মরিয়া হয়ে ছুটে চললো গাঁয়ের দিকে মুখ ক'রে। গোমস্তাকে পাকড়াও করতে হবে আগে, পুলিসের লোকগুলোকে যদি সে আবার ধরিয়ে দিতে না পারে—ওকে আজ কেউ আস্ত রেখে বাড়ী ফিরবে না। ধরতেই হবে লোকগুলোকে যেমন করে হোক ; মানুষ মারার প্রতিশোধ তাদের নিতে হবে মানুষ মেরে, এই তাদের বিচার। পচন মাহাতোর ঘরবাড়ী ওরা চারদিক থেকে ঘেরাও করলে গিয়ে। গোমস্তা পচন মাহাতো এই রকমেরি একটা কিছু আশঙ্কা করেছিলো। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে ঘর-দোরে তালা বন্ধ করে দিয়ে পাঁচিল টপ্‌কে সে খিড়কি দিয়ে সরে পড়েছে সাঁওতালরা গিয়ে পৌছবার আগেই।

গোমস্তাকে ধরতে না পেরে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালের দল আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। হলদিগড় থেকে বেরিয়ে তীরবেগে ওরা ছুটলো আবার জঙ্গলের পথ ধরে, পুলিশের লোকগুলোকে যদি কোন রকমে ধরতে পারা যায়। তীর-ধনুক হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে ওরা ধাওয়া ক'রে গেল প্রায় ক্রোশ দুয়েকের উপর, কিন্তু শিকারীদের কোন সন্ধানই আর পাওয়া

গেল না। হতাশ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ফিরে আসতে হলো সাঁওতালদের। ফিরবার মুখে মাঝ পথে খবর পাওয়া গেল—আহত সেই চৌকিদারটা হাসপাতালে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা পড়ে গেছে।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো বছর পনের আগে। বাঘ শিকার করতে গিয়ে মানুষ শিকার হলদিগড়ের ইতিহাসে বিশেষ একটা স্মরণীয় ঘটনা। তারপর থেকে বাইরের কোন শিকারী এ পাহাড়ে আর বাঘ মারতে আসেনি কেউ আজো। এবার যে ঝিঙেফুলি বাঘটা এসে গরু-ছাগল মারতে আরম্ভ করেছে চারিদিকে, যথাসময়ে এ সংবাদটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে থানায়। কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ মত সার্কেলের সর্দ্দার বাবু ঢোল সহরতে জানিয়ে দিয়েছেন,—বাঘটাকে যে মারতে পারবে—সরকার পক্ষ থেকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে। সাঁওতালদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে, শুধু পুরস্কারের লোভেই নয়—এটা তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য একটা কাজের মধ্যে, এটা তাদের নেশা।

বাঘটাকে সেদিন পাহাড়ের উপর ছেড়ে দিয়ে সাঁওতালরা বাড়ী ফিরে গেছে। পরদিন দুপুর বেলা বেশ ভাল রকম তৈরি হয়ে একসঙ্গে সব পাহাড়ে উঠবার কথা। রাত্রে ভাল ঘুম হলো না টুংরা মাঝির, সারা রাত সে বিছানায় পড়ে পড়ে বাঘটার কথাই ভেবেছে। যে বাঘ তার চোখের উপর দিয়ে অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় টুংরা মাঝির কাঁড় ধেনুককে ফাঁকি দিয়ে—আবার তাকে খুঁজে বের ক'রে যতক্ষণ না একটা ধারালো তীর ওই বাঘের বুকে বসিয়ে দিতে পারছে টুংরা, ততক্ষণ সে কোনমতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। ভয়ানক শিকারী এই টুংরা মাঝি, শিকারের কাজে সাহস এবং দক্ষতা ওর অসাধারণ। লোকটাকে দেখতে এমনি হাবাগোবা, রোগা লিকলিকে কুশ্রী একটা চেহারা, সংসারের সে বিশেষ কোন কাজেই আসে না; কিন্তু

শিকারের বেলা টুংরা যেন অন্য মানুষ, কাঁড়ধেনুকে হাত একেবারে পাকা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পাড়ার কয়েকটা ছোকরাকে ডেকে হেঁকে জোটাও করলে টুংরা, বাঘ মারতে যেতে হবে হলদিগড়ের পাহাড়ে। দুপুরবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা টুংরার পক্ষে অসম্ভব; বাঘটাকে দেখে অবধি হাত ওর নিশপিশ করছে।

ভালুকপোতার কয়েকজন সাঁওতাল বেরিয়ে পড়লো টুংরা মাঝির সঙ্গে। বাঘ যদি বেরোয় মন্দ কি, মারতে পারলে গাঁয়ের একটা নাম যশ আছে। 'বীরসিরিং' * গাইতে গাইতে টুংরার দল পাহাড়ে উঠলো। পাহাড়ের চূড়ায় মস্ত একটা পাথরের সুঁদ, কয়লা খাদের গ্যালারির মত। হাত আড়াইয়েক চওড়া হবে সুঁদটা, ভিতর দিকে অনেকখানা চলে গেছে সোজাসুজি ভাবে। টুংরার দল সুঁদের মুখে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সব চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। সুঁদের মাথায় পাথরের চূড়ার উপর জন দুই তিন সাঁওতাল তীর ধনুক হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে তৈরী হয়ে থাকলো, বাঘ যদি বেরোয়, উপর থেকে তীর ছুঁড়বে। সুঁদের ভিতর মুখ বাড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় টুংরা বেশ ভাল করে দেখে নিলে একবার, বাঘের কোন হদিস পাওয়া গেল না। লাগরা বাজিয়ে শব্দ করতে লাগলো ওরা, তবু কোন সাড়া নেই বাঘের। টুংরা বললে,—তাইতো রে, রাতারাতি বেটা ভেগে পড়লো নাকি?

ওর একজন সঙ্গী বললে,—সম্ভব, নইলে বেটা এতক্ষণ বেরোতো।

টুংরা আরও খানিকটা মুখ বাড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল সুঁদের ভিতর, কোন কিছুই দেখা গেল না। সুঁদের ভিতর সোজা খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকে আর একটা সুড়ং চলে গেছে, সোজাসুজি সেখানটায় নজর চলে না।

* বীরসিরিং—শিকারের গান।

ওই সুড়ুংটাই হলো জন্তু জানোয়ারের প্রধান আড্ডা, অন্ধি সন্ধি জানা আছে এদের সবই। টুংরা বললে,—খানিক ধোঁয়া কর দেখি।

কতকগুলো শুকনো পালাপাত যোগাড় করে সুঁদের মুখে ধোঁয়া করা হলো। শালগাছের ডাল ভেঙ্গে হাওয়া করতে লাগলো জোর ভরতি, সেই সঙ্গে চলতে লাগলো 'বীরসিরিং' আর রকমারি চীৎকার। বাঘের কিন্তু সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না তাতেও। বহুক্ষণ খেটেখুটে টুংরার সঙ্গীরা সব শেষ পর্য্যন্ত হাল ছেড়ে দিলে ; বাঘ হয়ত পাহাড় থেকে সরে পড়েছে। টুংরা কিন্তু এত সহজে দমবার পাত্র নয়, হঠাৎ সে বলে উঠলো,—ভিতর দিকের সুড়ুংটা একবার দেখে আসি আমি, দাঁড়া তোরা সুঁদের মুখে।

কাজটা কিন্তু নিরাপদ নয় মোটেই, ভিতর থেকে জন্তু জানোয়ার বেরিয়ে পড়লে পালাবার আর পথ পাওয়া যাবে না ; টুংরার সঙ্গীরা ওকে নিষেধ করলে সুঁদের ভিতর ঢুকতে। টুংরা কিন্তু কোন কথাই কানে তুললে না, তাঁর ধনুকটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো সুঁদের মধ্যে ; ওর সঙ্গীরা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সুঁদের মুখে।

সুঁদের ভিতর সোজা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকটায় যেখান থেকে সুড়ুং বেরিয়ে গেছে সেইখানটায় গিয়ে গুঁড়ি বেয়ে ঝুপ ক'রে এক জায়গায় বসে পড়লো টুংরা। ভিতর দিকটা ভয়ানক অন্ধকার, হঠাৎ কিছু দেখা যায় না। টুংরার সাড়া পেয়ে অসংখ্য মশা সাঁই সাঁই শব্দে একসঙ্গে ডেকে উঠলো সুঁদের মধ্যে। কতকগুলো চামচিকে ঝটপট শব্দে পাখা নাড়তে নাড়তে সুড়ুং থেকে বেরিয়ে টুংরার মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে উড়তে আরম্ভ করলে বাইরের দিকে। গোটা কয়েক ঝাপটা এসে লাগলো হঠাৎ টুংরার গায়ে মুখে। টুংরা এসব গ্রাহ্য করলে না, সুড়ুংএর এক পাশে বসে ভিতর দিকটা সে লক্ষ্য করতে লাগলো। কিসের যেন একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ এসে টুংরার নাকে ঢুকছে, নাকটা খানিক টিপে ধরলে টুংরা।

আবছা আলো অন্ধকারের মধ্যে টুংরার হঠাৎ চোখে পড়লো শাদা শাদা কাঠির মত কি যেন কতকগুলো চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। অন্ধকারটা আর একটুখানি কেটে গেলে স্পষ্টই দেখা গেল সুড়ুংএর মধ্যে ঠাঁই ঠাঁই জমা হয়ে আছে স্তূপীকৃত জন্তুর হাড়। কোন কোনটা একেবারে টাটকা, খানিকটা ক'রে কাঁচা মাংস এখনও লেগে রয়েছে। সুড়ুংএর মধ্যে আরও কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস টুংরার চোখে পড়লো,—ওদিকে একটা আস্ত শেয়ালের মাথা, এদিকে একটা গরুর ঠ্যাং, আশেপাশে গোটাকয়েক ছাগলের শিং, মাঝখানটায় কতকগুলো আধপচা নাড়িভুঁড়ি, এই সমস্ত একজায়গায় অজস্র জমে উঠেছে। সবগুলো মিলিয়ে স্থানটাকে একেবারে বীভৎস ও ভয়াবহ ক'রে তুলেছে। হলদিগড় পাহাড়ের এই সুঁদটাই হলো বাঘ ভালুকের প্রধান আড্ডা, এ অঞ্চলের সকলের জানা আছে, দিন দুপুরে পর্য্যন্ত একলা কেউ ভয়ে এর কাছ ঘেঁসে না। কিন্তু বাঘটা হঠাৎ *গেল কোন্ দিকে ? যার জন্যে টুংরা মাঝি এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে—তার যে কোন সাড়া শব্দই নাই। বাঘ হয়ত রাতারাতি অন্য কোথাও সরে পড়েছে, কিম্বা হয়ত আছে কোথাও এরি মধ্যে লুকিয়ে, জোর ক'রে কিছু বলা যায় না। সুঁদের একপাশে দাঁড়িয়ে শব্দ করতে আরম্ভ করলে টুংরা: —হিড়িক—হিড়িক—হেইও—হে—লে—লে—লে—লে—লে—লে—লে……*

বাইরে থেকে টুংরার সঙ্গীরাও শব্দ করতে আরম্ভ করেছে,—হেইয়ো—হেইয়ো—হে—লে—লে—লে—লে—লে—লে—লে……

টুংরা হঠাৎ চেয়ে দেখে সুড়ুংএর ভিতর দিকে আগুনের ভাঁটার মত কি যেন দুটো জল্ জল্ করে জলছে। টুংরার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো, অন্ধকারে বাঘের চোখ ঠিক এমনি করেই জলে, কতবার দেখা আছে টুংরার। বাঘটা হয়ত এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলো, টুংরার সাড়া

পেয়ে জেগে উঠেছে। টুংরা হঠাৎ ভিতর থেকে চীৎকার ক'রে উঠলো ওর সঙ্গীদের উদ্দেশে,—বাঘ—বাঘ—সুড়ুংএর মধ্যে বাঘ।

বাইরে সব তাড়াতাড়ি কাঁড়ধেনুক বাগিয়ে ধরে সুঁদের মুখ থেকে খানিক সরে দাঁড়ালো। টুংরার গলার আওয়াজ পেয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো বাঘটা, গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে সুড়ুং থেকে বেরিয়ে বাঘটা হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলে বাইরের দিকে। টুংরা কিন্তু বেঁচে গেল খুব, বাঘটা ওর গা ঘেঁসে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল ওর সামনে দিয়ে, টুংরাকে হয়ত লক্ষ্যই করলে না। সুড়ুংএর ভিতর থেকে টুংরাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাঘটার পিছু পিছু। বাঘ তখন সুড়ুং থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের উপর ছুটতে আরম্ভ করেছে, প্রকাণ্ড ঝিঙেফুলি বাঘ। টুংরার সঙ্গীরা সব বাঘ দেখে এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো, টুংরা মাঝি বাঘটার পিছন দিক থেকে শোঁ ক'রে ছাড়লে একটা তীর। তীরটা গিয়ে বাঘের শিরদাঁড়াতে গেঁথে গেল ঘ্যাচ ক'রে। বাঘটা হঠাৎ পিছন ফিরে রুখে দাঁড়ালো, সামনা সামনি ছাড়লে টুংরা আর একটা তীর, তীরটা এবার বিঁধলো গিয়ে ওর তলপেটে। বিষ মাখানো ঝকঝকে দু'খানা তীর, দুটো তীরই যথেষ্ট। বাঘটা কিন্তু কাবু হলো না তাতেও, টুংরার দিকে প্রকাণ্ড একটা হাঁ ক'রে গর্জ্জে উঠলো; চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে টুংরাকে লক্ষ্য ক'রে বাঘটা মারলে এক লাফ। পাশে একটা ঝোপের আড়ে ঝুপ ক'রে বসে পড়লো টুংরা, আর এক লাফে বাঘটা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো একেবারে ওর সামনে। টুংরার আর পালাবার পথ নাই, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই বাঘটা গিয়ে ওর বুকের উপর জোর ভরতি বসিয়ে দিলে প্রকাণ্ড একটা থাবা। টুংরা হঠাৎ তীর ধনুকটা ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘের উপর, এ ছাড়া তার বাঁচবার আর কোন উপায় নাই; একলাফে বাঘটার পিঠের উপর চড়ে বসে গলাটা তার শক্ত ক'রে

চেপে ধরলে টুংরা,—বাঘ যেন আর কোন মতেই কামড় দিতে বা থাবা চালাতে না পারে। টুংরাকে পিঠে নিয়ে পাহাড়ের নীচের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলে বাঘটা। টুংরার সঙ্গীরা সব তীর ধনুক হাতে নিয়ে ধাওয়া করলে বাঘের পিছু পিছু, তীর ছুঁড়বার কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না। বাঘের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে গলাটা তার দু'হাত দিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে টুংরা, তলপেটের দু'পাশ থেকে পায়ে পায়ে ছাঁদ দিয়ে পেটটাকে চেপে ধরেছে জোর ভরতি। সাঁওতালী তীর খেয়ে মরিয়া হ'য়ে ছুটে চললো ঝিঙেফুলি বাঘ, তার পিঠের উপর টুংরা যেন একেবারে ব'সে গেছে সেঁটে।

টুংরাকে নিয়ে হঠাৎ যে একটা এমনধারা কাণ্ড ঘটে যাবে, এমনটা কেউ ভাবতে পারে নি। টুংরার সঙ্গীরা সব হল্লা করতে করতে ছুটলো বাঘের পিছু পিছু, টুংরাকে কেমন ক'রে মুক্ত করা যায় এই চিন্তাই ওদের প্রবল হয়ে উঠলো।

বাঘটা পাহাড়ের নীচে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা নালায় নেমে উর্দ্ধশ্বাসে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বাঘের পিঠে টুংরা একদম সেঁটে আছে, একেবারে নড়ন চড়ন বিহীন। টুংরার সঙ্গীরা সব ভ্যাবা চাকা মেরে গেছে টুংরার কাণ্ড দেখে, ঝোপের আড়াল থেকে একদৃষ্টে ওৎ পেতে ক'রে চেয়ে আছে বাঘটার দিকে, তীর ছুঁড়বার উপায় নাই, দৈবাৎ যদি টুংরাকেই জখম ক'রে ফেলে! নালার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত বাঘটা শুধু উর্দ্ধশ্বাসে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। টুংরার সাড়া শব্দ নাই।

ক্রমশঃ কিন্তু হাঁপিয়ে পড়লো বাঘটা কিছুক্ষণের মধ্যেই, পা-গুলো কাঁপতে লাগলো থর থর ক'রে, টুংরার বোঝা আর যেন সে বইতে পারছে না, মাতালের মত টলতে টলতে বাঘটা হঠাৎ ধপ্ ক'রে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো। টুংরার সঙ্গীরা সব তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে উপর্য্যুপরি

লাঠির আঘাতে বাঘের মাথাটা প্রায় থেঁতলে ফেললে, আর একজন তখন বল্লম দিয়ে বাঘটার পেটে ফুঁড়ে ধরেছে। টুংরার তীর খেয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিলো বাঘটা, ধড়ের মধ্যে প্রাণ যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো—হাতাহাতি দিলে এরা শেষ ক'রে কিছুক্ষণের মধ্যেই। টুংরার হাত দুটো বাঘের গলায় এমনভাবে সেঁটে বসে গেছে যে টেনে তাকে ছাড়ানো যায় না। বহুকষ্টে টুংরাকে মুক্ত করা হলো, বুকটা ওর ভিজে গেছে রক্তে; বাঘের থাবায় বেশ খানিকটা জখম হয়েছে। চৈতন্যের লেশ মাত্র নাই টুংরার; নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে, কিন্তু কথা কইতে পারছে না। টুংরার সঙ্গীরা ওকে নাড়া দিয়ে জোর গলায় ডাকতে লাগলো,—টুংরা—টুংরা !

টুংরার সাড়াশব্দ নাই। গাছতলায় একটা গামছা পেতে টুংরাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। মুখে চোখে জল দিয়ে টুংরাকে হাওয়া করতে লাগলো ওর সঙ্গীরা সব। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর টুংরা আবার ধীরে ধীরে চোখ মিলে তাকালো। টুংরার সঙ্গীদের ধড়ে যেন প্রাণ এলো এতক্ষণে, মরতে মরতে টুংরা খুব বেঁচে গেছে আজ।

ধীরে ধীরে টুংরা উঠে বসলো। সঙ্গীদের মুখের দিকে চেয়ে টুংরা যেন অবাক হয়ে গেল। এর মধ্যে কি যেন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে; টুংরা ঠিক স্মরণ করতে পারছে না আবছা তার মনে হতে লাগলো কোথায় যেন তারা শিকার করতে বেরিয়েছে। পাশে হঠাৎ বাঘটার দিকে চোখ পড়তেই পরম উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো টুংরা, তাড়াতাড়ি সে ব'লে উঠলো,—এই যে বেটা ইখানে !

টুংরার বিষ মাখানো তীর দুটো বাঘের গায়ে ফুটে রয়েছে তখনো। বিজয়ী বীরের মত বাঘটার গায়ে একটা পা চাপিয়ে আনন্দের আতিশয্যে হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো টুংরা।

টুংরার সঙ্গীরাও আনন্দে মশগুল হয়ে বাঘটার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে লাগরা পিটিয়ে হঠাৎ নাচতে সুরু ক'রে দিলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড়তলি লোকে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। খবর পেয়ে টুয়াই মাঝি ছুটে এসেছে, ভালুকপোতা গোটা গাঁয়ের লোক তার সঙ্গে। চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে, সকলের মুখেই এক কথা,—টুংরা মাঝি বাঘ মেরেছে—ভালুকপোতার টুংরা মাঝি ঝিঙেফুলি বাঘ মেরেছে।

ভালুকপোতার সাঁওতালদের আনন্দ আজ দেখে কে। কতকগুলো জংলী ফুলের মালা গেঁথে পরিয়ে দিলে ওরা টুংরা মাঝির গলায়, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে তীরন্দাজ টুংরা মাঝির অভিনন্দন পর্ব্ব সমাধা হয়ে গেল সাঁওতালী প্রথায়। বাঘটার পায়ে বেঁধে ছেঁদে শক্ত দেখে একটা শালগাছের সঙ্গে জড়িয়ে শূন্যে ওটাকে ঝুলিয়ে নেওয়া হলো। সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে কাঁধের উপর বাঘটাকে তুলে নিয়ে মাদল লাগরা বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা ক'রে একসঙ্গে সব হৈ হৈ ক'রে ভালুকপোতার পথ ধরে এগিয়ে চললো। মাঝখানে টুংরা মাঝি—বাঘটার ঠিক পিছনে, আগে পিছে কলমুখর জনতা; শোভাযাত্রার পুরোভাগে বিজোচিত ভারিক্কি চালে সদর্পে হেঁটে চলেছে টুয়াই মাঝি নিজে। দশখানা গাঁ ঘুরিয়ে বাঘটাকে আজ দেখিয়ে আসবে টুয়াই, সকলেই জানুক, সকলেই শুনুক যে টুংরা মাঝি ঝিঙেফুলি বাঘ মেরেছে; তীরন্দাজ টুংরা মাঝি—ভালুকপোতার টুয়াই মাঝির নাতি। রামপুর আর ঘুসরুকাটা—এ দুটো গাঁ ত ঘোরাতেই হবে।

রাবণ মাঝির বাড়ীতে যথারীতি আবার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে, আগামী কাল দুলালীর বিয়ে। লোকজন এবার অনেকগুলি

হবে, যথাযোগ্য তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করছে রাবণ। গাঁয়ের বাইরে একটা ফাঁকা ময়দানে লক্ষ্যভেদের স্থান নির্ব্বাচন করা হয়েছে, মোহন আর টুংরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বর ঠিক হয়ে যাবে সকালের দিকে, ছ' পাঁচখানা গাঁয়ের লোকের সামনে; সন্ধ্যাবেলা বিয়ে।

মাড়োয়ায় খড় চাপানো শেষ ক'রে পান্তাভাত দুটো খেয়ে নিলে রাবণ, ক্ষেত থেকে এবার কুমড়োগুলো তুলে আনতে হবে। টুশকী মেঝেন সকাল থেকেই সংসারের কাজে ব্যস্ত, মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে। কিষ্টু মাঝি একটা জাল ঢাকা দেওয়া চুপড়ির মধ্যে কতকগুলো মুরগী নিয়ে রাবণ মাঝির বাড়ী ঢুকলো। বিয়ে বাড়ীতে সকলেই আজ যে যার কাজে ব্যস্ত। দূর থেকে একটা বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। রাবণ মাঝি কিষ্টু মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলে, —বাজনাটা কিসের রে, সকাল থেকে এত লাগরা বাজছে কেনে?

কিষ্টু মাঝি মুরগীর ঝুড়িটা দাওয়ার একপাশে নামিয়ে রেখে বললে,—বাঘটা আজ মারা পড়ে গেল সদ্দার, মস্তবড় ঝিঙেফুলি বাঘ— টুংরা মাঝি ছ'টি কাঁড়েই সাবাড় করে দিয়েছে।

রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—এঁ্যা—বলিস কিরে, টুংরা মাঝি বাঘ মেরেছে, ভালুকপোতার টুংরা মাঝি?

কিষ্টু মাঝি জবাব দিলে,—হাঁ সদ্দার, ভালুকপোতার সাঁওতালরা বাজনা বাজিয়ে গাঁ ঘুরতে বেরিয়েছে, বাঘটাকে নিয়ে এই দিকেই আসছে ওরা।

রাবণ মাঝি একটু গম্ভীর ভাবে বললে,—হুঁ।

উঠানের একপাশে কুয়ো থেকে ঘটী ক'রে জল তুলছিলো দুলালী, টুংরা মাঝির বাঘ মারার খবরটা শুনে হঠাৎ তার হাত ফস্‌কে

দড়িশুদ্ধ ঘটীটা গেল কুয়োর মধ্যে পড়ে, কুয়োতলায় ধপ্ ক'রে বসে পড়লো দুলালী।

রাবণ মাঝি একটু দম নিয়ে কিষ্টুর দিকে চেয়ে আবার বলে উঠলো,—বাঘটা তা হলে মারা পড়লো, ভালই হলো,—কি বল্?

কিষ্টু বললে,—খুব ভাল হলো সর্দ্দার, বিস্তর ক্ষতি করতে আরম্ভ করেছিলো বাঘটা। টুংরার কিন্তু কাঁড়ের জোর বলতে হবে, অতবড় বাঘটাকে দুটি কাঁড়েই—ব্যস্।

রাবণ মাঝি গম্ভীরভাবে আর একবার বলে উঠল,—হুঁ।

ভালুকপোতার শোভাযাত্রা মাদল লাগরা বাজিয়ে রামপুরে এসে পৌঁছে গেছে। হৈ হৈ ক'রে সব রাবণ মাঝির দোরে এসে দাঁড়ালো। টুংরার গলায় জংলী ফুলের মালা ঝুলছে, সঙ্গে তার ভালুকের বাচ্ছাটা, শিকল দিয়ে বাঁধা। নিজের গলা থেকে একটা মালা খুলে ভালুকের গলায় জড়িয়ে দিয়েছে টুংরা। বাজনার শব্দে রামপুর গাঁ-খানা তোলপাড় হয়ে উঠলো, বাঘটাকে এনে নামানো হলো রাবণ মাঝির দোরের সামনে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা থেকে আরম্ভ করে, বুড়ো-বুড়ীরা পর্যান্ত যে যেখানে ছিলো—গাঁ ভেঙে সব ছুটে এলো বাঘ দেখতে। রাবণ মাঝি ঘর থেকে বেরিয়ে টুয়াই মাঝিকে আপ্যায়িত করলে। টুয়াই মাঝির আনন্দ আজ দেখে কে; টুংরা মাঝি বাঘ মেরেছে, শেয়াল নয়—হেঁড়োল নয়—আদবাগা নয়—আস্ত একটা ঝিঙেফুলি বাঘ।

রাবণ মাঝি চেয়ে দেখে বাঘটার গায়ে টুংরা মাঝির তীর দুটো এখনো ফুটে রয়েছে। টুংরার দিকে চেয়ে একটু বিস্মিতভাবে কতকটা যেন নিজের মনেই বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—সাবাস বেটা, সাবাস!

ভালুকের বাচ্ছাটাকে টানতে টানতে রাবণ মাঝির সামনে এসে টুংরা একটা গড় করলে। রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে টুয়াই মাঝি হাসছে। রাবণ মাঝির সঙ্গে খানিক আলাপ আলোচনার পর টুয়াই মাঝি বললে,—আজ তা হলে আসি সদ্দার, দু' চারটে গাঁ এখনো ঘুরতে হবে।

রাবণ মাঝি কিষ্টু মাঝিকে একটা হাঁক দিয়ে বললে,—ওরে—খানিক গুড় জল, গুড় জল নিয়ে আয় খানিক শিকারীদের জন্যে।

টুয়াই মাঝিকে আরও কিছুক্ষণ আটকে দিলে রাবণ মাঝি। কাঠফাটা রৌদ্রে লোকগুলো সব ঘেমে উঠেছে, একটুখানি গুড়জল না খাইয়ে রাবণ মাঝি ওদের ছেড়ে দেয় কেমন ক'রে!

টুয়াই মাঝিকে আর একটু বসতেই হলো। গোটা গাঁয়ের মাঝি মেঝেনরা ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সব বাঘ দেখতে। বাঘটাকে সদর কুলিতে নামানো হয়েছে। টুংরা মাঝি বাঘটার পাশে বসে ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। রাবণ মাঝির সদর দোর দিকে চেয়ে কাকে যেন খুঁজছে টুংরা, হয়ত সে আশা করেছিলো এই ফাঁকে দুলালীর সঙ্গে আর একবার দেখা হয়ে যাবে; কিন্তু না,—দুলালী এ পাশ মাড়ায়নি। টুংরার মনটা উসখুস করতে লাগলো।

রামপুরের মাঝি মেঝেনরা ভিড় ক'রে স. দাঁড়িয়ে আছে রাবণ মাঝির দোরে। ঘরের মধ্যে মুখ গোঁজ ক'রে চুপচাপ একধারে বসে আছে দুলালী। কপাট কোণে বসে বসে নিজের মনে কত কথাই সে ভাবছে। সকলের মুখেই টুংরার নাম, শুনতে শুনতে দুলালীর কান ঝালাপালা হয়ে গেল। টুংরা ছাড়া কি দেশে আর তীরন্দাজ নাই! মোহনও ত ইচ্ছে করলে মারতে পারতো বাঘটাকে, মোহনই বা টুংরার চেয়ে খাটো কিসে।

একটা কথা কিন্তু ভেবে পায় না দুলালী, টুংরা যদি শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি হারিয়ে দেয় মোহনকে? তা হলে কি করবে দুলালী? টুংরাকে বিয়ে করা তার পক্ষে যে অসম্ভব; না—না—টুংরাকে সে কোনমতেই বিয়ে করতে পারে না, দুলালীর জীবন থাকতে নয়।

ঘরের এক কোণে চুপচাপ একটা মাদুর পেতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো দুলালী, মনটা তার ভাল নাই মোটেই।

টুশকী মেঝেন গোড়া থেকেই দুলালীর ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে আসছে, দুলালীর মনের কথা সে জানে। কিন্তু রাবণ মাঝির কাছে মুখ ফুটে কোন কথাই বলবার তার উপায় নাই, টুশকীর কথা গ্রাহ্য করে না সে।

বাইরে শোভাযাত্রার হৈ চৈ চলছে। টুশকী মেঝেন ধীরে ধীরে দুলালীর শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, অতি কোমল কণ্ঠে টুশকী একটা ডাক দিলে,—বিটি!

দুলালী কোন সাড়া দিলে না, চোখ মিলে টুশকীর দিকে একবার চেয়ে আবার সে পাশ ফিরে শুলো।

ভালুকপোতার শোভাযাত্রা রামপুর থেকে বেরিয়ে ঘুসরুকাটার পথ ধরলে। দ্বিগুণতর উৎসাহে মাদল লাগরা পিটিয়ে এগিয়ে চললো ওরা কুরুলিয়া নদীর দিকে মুখ ক'রে। বাঘটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুসরুকাটা গ্রামখানাকে তোলপাড় ক'রে দিয়ে গ্রাম থেকে যখন বেরিয়ে গেল ভালুকপোতার দল—বেলা তখন পড়ে আসছে। মোহন মাঝি তীর ধেনুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো নদীধারের পথ ধরে, রোজ যেমন বেরোয়।

মনটা কিন্তু আজ ভাল নাই মোহনের। সকলের মুখেই টুংরার কথা, টুংরা একটা বাঘ মেরে দেশশুদ্ধ লোকের যেন মাথা কিনেছে। চেষ্টা করলে আর কেউ যে বাঘ মারতে পারে না, এমন কোন কথা আছে কি!

মোহন মাঝিই বা কম কি টুংরার চেয়ে? আজ যারা টুংরাকে মাথায় তুলে মাতামাতি করছে, তীরন্দাজ মোহন মাঝির সম্যক পরিচয় কালই তারা পাবে। একমাসকাল নদীর ধারে বসে বসে কাঁড় আর ধেনুক নিয়ে যে কঠোর সাধনা করে এসেছে মোহন, তার প্রমাণ সে দেবে দুলালীকে জয় ক'রে, এর জন্য মোহন তৈরি হয়ে আছে।

ভাবতে ভাবতে নদীর ধারে তার নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে চুপচাপ গিয়ে বসে পড়লো মোহন। কাল তার জীবনের সঙীন এক অগ্নি পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে দুলালীর আশা তাকে ছাড়তে হবে ইহ জনমের মত।

নদীধারে বসে বসে ভাবতে লাগলো মোহন। থেকে থেকে কেবলই তার মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগলো ঝিঙেফুলি বাঘটার কথা। বাহাদুরি আছে বলতে হবে টুংরা মাঝির,—সাংঘাতিক তার কাঁড়ের জোর, অসম্ভব সাহস, এ কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু মোহন কি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে? না—না—নেতিয়ে পড়লে চলবে না মোহনের, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত অপর কোন চিন্তাই তার মনের মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে না।

তীরধনুক হাতে নিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো মোহন। নিমগাছের নিশান লক্ষ্য ক'রে ধনুকে সে গুণ টেনে দিলে। কাল মোহনের পরীক্ষা, আজ তার শেষ মহড়া। ধনুকে একটা তীর জুড়ে নিজের মনেই বলে উঠলো মোহন,—টুংরার পালা আগে, টুংরা আগে তীর ছুঁড়বে, নিশানা ওই তে-ফেড়েঙ্গা ডালটা।

নিমগাছের একটা ডালকে লক্ষ্য ক'রে শোঁ ক'রে ছাড়লে মোহন একটা তীর। তীরটা গিয়ে ঠিক গেঁথে গেল ডালে। মোহন মাঝি নিজের মনেই বলে উঠলো,—বলিহারি ভাই, সাবাস!

অপর একটা সরু ডালকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো মোহন,—পালা এবার ঘুসরুকাটার মোহন মাঝির, মাররে জোয়ান,—জোরসে।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে শোঁ ক'রে ছুটে গেল আর একটা তীর। মোহন মাঝি চেয়ে দেখে লক্ষ্য তার ঠিকই বিঁধেছে ; উৎফুল্লভাবে নিজের মনেই আবার বলে উঠলো মোহন,—সাবাস জোয়ান,—সাবাস!

অপেক্ষাকৃত আর একটা সরু ডালকে নিশান করলে মোহন, পালা এবার টুংরা মাঝির। কিন্তু এত সরু ডালটাকে টুংরা মাঝি কি বিঁধতে পারবে। ভাবতে ভাবতে মোহন মাঝি ছাড়লে আর একটা কাঁড়, কাঁড় লেগে ডালটার এপার ওপার ফুটো হয়ে গেল। মোহন মাঝির চোখ-দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু এ কাঁড় ত টুংরা মাঝির, গর্ব্ব করবার কিছু নাই এতে মোহনের, মোহনকে এবার বিঁধতে হবে এর চেয়েও শক্ত নিশানা। মগডালের কাছাকাছি আর একটা লিকলিকে সরু ডালকে এবার বাছাই করলে মোহন, কাঁড় মেরে ডালটাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এ কিন্তু ভারী শক্ত নিশানা, যে কোন তীরন্দাজের পক্ষে এ ডাল বেঁধা সহজ কথা নয় ; এ যদি পারে মোহন—জয় তার অবধারিত।

হাঁটু গেড়ে মাটির উপর বসে পড়লো মোহন, নিশানা লক্ষ্য ক'রে একাগ্র মনে ধীরে ধীরে টান দিতে লাগলো সে ধনুকের ছিলায়। বাইরের জগৎ যেন মুছে গেছে মোহনের মন থেকে, সামনে তার শুধু একটা নিমগাছ, নিমগাছের অসংখ্য ডালপালার মধ্যে মগডালের কাছাকাছি একটিমাত্র সরু ডাল শুধু জেগে আছে মোহনের চোখের সামনে, শুধু তার শেষ নিশানা।

ধনুকটাকে আর একটু শক্ত ক'রে চেপে ধরলে মোহন। কল্পনায় তার ভেসে উঠলো,—চারিদিক থেকে অসংখ্য দর্শক যেন হাঁ ক'রে চেয়ে আছে মোহনের দিকে। এপাশে টুয়াই মাঝি, ওপাশে রাবণ ; এদিকে

টুংরা, ওদিকে চাঁদরায় মাঝি; আশে পাশে আরও বহু চেনা লোক চারদিক থেকে মোহনকে যেন ঘিরে রয়েছে। দূর থেকে কার যেন ছায়া দেখতে পাচ্ছে মোহন, একান্ত পরিচিত একখানি মুখ; হলুদরাঙা শাড়ী পরে দুলালী যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে তীরন্দাজ মোহন মাঝির দিকে। দুলালীর যে বিয়ে, হাতে তার গুলঞ্চ ফুলের মালা;—ওই মালাটি জয় ক'রে নিতে হবে মোহনকে, যেমন ক'রেই হোক।

ধনুকের ছিলাটায় জোর ভরতি টান দিয়ে নিমগাছের সেই ডালটাকে লক্ষ্য ক'রে ছাড়লে মোহন আর একটা তীর। ডালটা কিন্তু বিঁধলো না, নিশানার ঠিক পাশ দিয়ে শোঁ ক'রে ছুটে গেল তীরটা, দূরে গিয়ে ছিটকে একধারে টেড়চাভাবে গেঁথে গেল মাটির উপর। শেষ লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেল মোহনের। হঠাৎ কি তার হাত কেঁপে উঠেছিলো? না—না— হাত ত তার কাঁপেনি, তবে?

চারিদিক থেকে হো হো ক'রে কারা যেন হেসে উঠলো। কি আশ্চর্য্য, মোহনকে কি ওরা বিদ্রূপ করছে? ডালটা কিন্তু বিঁধতে হবে মোহনকে, আর একবার অন্ততঃ চেষ্টা না ক'রে ক্ষান্ত হবে না মোহন।

শক্ত ক'রে ধনুকটা বাগিয়ে ধরে আর একটা তীর জুড়ে দিলে মোহন। তার দেহ মনের সমস্ত শক্তিকে একত্র ক'রে ধনুকের ছিলায় আবার সে ধীরে ধীরে টান দিতে লাগলো।

দুলালী এসে দাঁড়িয়ে আছে মোহনের পিছনে, মোহন এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি। মোহনের ডান হাতটা হঠাৎ পিছন দিক থেকে চেপে ধরলে দুলালী, বললে,—থাক্—কাঁড় চালা বন্ধ ক'রে দে।

দুলালীর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল মোহন। দুলালীর মুখে চোখে কি যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে মোহন,—তোর কি কোন অসুখ করেছে দুলালী?

ডুলালী বললে,—না, ভালই আছি; শুনেছিস বোধ হয় টুংরা মাঝি বাঘ মেরেছে।

মোহন বললে,—শুনেছি, নিজের চোখে দেখলুম যে আমরা বাঘটাকে।

কিছুক্ষণ থেমে ডুলালী একটু হতাশভাবে বললে,—তুই কি ওর সঙ্গে পারবি মোহন?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে মোহন,—নিশ্চয় পারবো ডুলালী, তুই আমাকে বিশ্বাস কর; কাল যদি টুংরা মাঝিকে আমি হারিয়ে দিতে না পারি—

ডুলালী বাধা দিয়ে বললে,—ওরা কিন্তু বলাবলি করছে—টুংরাকে তুই পারবি না।

মোহন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—কে? কারা একথা বলাবলি করছে?

ডুলালী জবাব দিলে,—পাড়ায় ঘরে সকলেই। কাল আমার বিয়ে, আজ থেকেই ঘর আমাদের গুলজার। ঘরে কিন্তু আমার মন টিঁকছে না, কলসিটা কাঁকে নিয়ে তাই বেরিয়ে পড়লুম।

দূর থেকে হঠাৎ মাদল বেজে উঠলো, রাবণ মাঝির বাড়ী উৎসব চলছে। মাদলের শব্দ শুনে চমকে উঠলো মোহন। অজানা এক আশঙ্কায় মোহনের বুকটা যেন দুর দুর ক'রে কাঁপতে লাগলো। ডুলালীর দিকে চেয়ে বলে উঠলো মোহন,—তুইও কি বিশ্বাস করিস ডুলালী, টুংরার কাছে আমি হেরে যাব?

ডুলালী জবাব দিলে,—কাল থেকে আমার ডানচোখ নাচছে, থেকে থেকে কেবলই আমার মনে হচ্ছে তুই হয়ত টুংরার সঙ্গে পারবি না; ওরা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত জোর ক'রে আমাকে গছিয়ে দেবে টুংরার হাতে।

মোহনের বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ডুলালীর কথা শুনে মোহনের মনটা গেল একেবারে দমে। টুংরার মত প্রতিদ্বন্দ্বীকে

এত সহজে হারানো কি সম্ভব হবে! হঠাৎ কি মনে ক'রে ধনুকের ছিলাটা খুলে দিলে মোহন, কাঁড়গুলোকে দড়ি দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে ধনুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিলে। মোহন একটু চিন্তিতভাবে বলে উঠলো,—তাহলে?

দুলালী বললে,—কোন উপায় নাই।

কিছুক্ষণ কাটলো ওদের নীরবে, বলবার আর কিছু নাই। আর একটুখানি ভেবে মোহন হঠাৎ বলে উঠলো,—উপায় একটা আছে দুলালী, কিন্তু তুই কি তাতে রাজি হবি?

দুলালী উৎসুকভাবে মোহনের দিকে চেয়ে বললে,—কি?

মোহন বললে,—চল,—এখান থেকে আমরা পালাই।

দুলালী একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—কোথায়?

মোহন বললে,—যেখানে খুশি, যেখানে গেলে আমরা সুখে থাকবো।

দুলালী একটু বিস্মিতভাবে বললে,—কাল যে তোর কাঁড়-ধনুকের পরীক্ষা, লোকে যে তোকে ছি ছি করবে মোহন?

মোহন বললে,—তা করুক, আমি তাকে ভয় করি না।

দুলালীর বুকের ভিতরটা দুর দুর ক'রে কাঁপছে। একটুখানি থেমে আবার সে বলে যেতে লাগলো,—তোর ঘরদোর জমিজায়গা—তোর সমাজ—তোর সাত পুরুষের ভিটে, আমার লেগে তুই এসব ছেড়ে চলে যেতে পারবি?

মোহন বললে,—ও সকলের কোন দাম নাই আমার কাছে, তোকে যদি আমি হারাই। তার চেয়ে বরং কয়লা খাদে গিয়ে আমরা খেটে খাব, সেও ভাল। কেউ আমাদের জানবে না—কেউ আমাদের চিনবে না, সেখানে শুধু তুই আর আমি।

দুলালী অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলো, বললে,—না—না মোহন, এ হয় না—এ আমি পারবো না। আমার মাকে ছেড়ে, আমার বুড়ো

বাপকে ছেড়ে কোথাও আমি যেতে চাই না, আমি ছাড়া তাদের যে আর কেউ নাই।

দুলালীর চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো। মোহন বললে,—তুই ভুল করছিস দুলালী, সারা জীবনটাই যদি তোর ব্যর্থ হয়ে যায়, তবে মা বাপ ভাই বন্ধু এসব কি কাজে আসবে। তার চেয়ে চল্—অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, পথঘাট নিঝুম, পালাবার এই উপযুক্ত অবসর; এইবেলা আমরা এখান থেকে সরে পড়ি চল্।

দুলালী যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, বললে,—না—না—এ হতে পারে না, এ আমি পারবো না মোহন।

এই বলে তাড়াতাড়ি মোহনের সামনে থেকে সরে গেল দুলালী, কলসিটা কাঁকের উপর তুলে নিয়ে সদর ঘাট দিকে মুখ ক'রে সে ছুটতে আরম্ভ করলে।

পিছন দিক থেকে ডাকতে লাগলো মোহন,—দুলালী—দুলালী!

দুলালী আর ফিরলো না, দূর থেকে শুধু বলে উঠলো,—না—না—না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সদর ঘাটের সামনে কে একটা লোক অন্ধকারে চুপটি ক'রে বসে আছে পাড়ের উপর। দুলালী হঠাৎ চমকে উঠলো লোকটাকে দেখে, বললে,—কে?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো লোকটা, দুলালীর দিকে খানিক এগিয়ে এসে বললে,—আমি কিষ্টু মাঝি।

কিষ্টুকে দেখে দুলালী যেন ঘেমে উঠলো, বললে,—তুই এ সময় এখানে কেন কিষ্টু?

কিষ্টু মাঝি জবাব দিলে,—তোকেই খুঁজতে এসেছি, সর্দার আমাকে পাঠালে।

দুলালী একটু আমতা আমতা ক'রে বললে,—আমি ত জল ভরতে এসেছি।

কিষ্টু মাঝি একটু বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠলো,—তাই দেখছি, কিন্তু এর জন্যে তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে সদ্দারের কাছে।

দুলালী ঈষৎ উষ্ণভাবে বললে,—কিসের কৈফিয়ৎ কিষ্টু, কি তুই বলতে চাস ?

কিষ্টু মাঝি বললে,—দু'দিন তোকে সমঝে দেওয়া হয়েছে, এই নিয়ে হলো তিন দিন; আজ আবার লুকিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি কেন ?

দুলালী একটু রাগতভাবে বললে,—কার সঙ্গে—আমি আবার কার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম ?

কিষ্টু বললে,—তা তুঁয়েই জানিস, আমি কিছু দেখি নাই বুঝি।

দুলালী হঠাৎ বলে উঠলো,—বেশ করেছি, আমার খুশি।

কিষ্টু বললে,—বেশ, সদ্দারকে আমি সেই কথাই বলছি গিয়ে।

দুলালী দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো,—বল্‌গে যা, এক শ বার বল্‌গে যা; আমি কাউকে ভয় করি না।

বাকবিতণ্ডায় কোন লাভ নাই দেখে কিষ্টু মাঝি আর কথা বাড়াতে চাইলে না, বললে,—বেশ, তাড়াতাড়ি এখন জল ভরে আমার সঙ্গে চল্, ওরা তোর পথ চেয়ে আছে।

দুলালী একটু জোর গলায় বলে উঠলো,—আমি যাব না, বেরো খাল-ভরা আমার সামনে থেকে, তোর সঙ্গে আমি যাব না।

কিষ্টু মাঝি একটু রাগতভাবে বললে,—যাবি না ?

দুলালী জবাব দিলে,—না—না—যাব না, আমার খুশি আমি যাব না, আমাকে তোরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবি নাকি !

হু হু ক'রে হঠাৎ কেঁদে ফেললে দুলালী, পিতলের কলসিটা পাশে নামিয়ে রেখে নদীর শুকনো বালির উপর সে ধপ্ ক'রে পড়লো।

কিষ্টু মাঝি বললে,—থাক্ তাহলে বসে, আমার যা বলবার ত সদ্দারের কাছেই বলছি গিয়ে।

ভাঙ্গাগলায় বলে উঠলো দুলালী,—তাই বলিস, আমার মাথার দি থাকলো—কোন কথা যেন ঢেকে রেখে বলিস না।

দুলালীর সামনে থেকে চুপচাপ সরে পড়লো কিষ্টু, হন্ হন ক'রে এগিয়ে চললো গাঁয়ের দিকে মুখ ক'রে।

অন্ধকারে বসে বসে ফুঁপিয়ে খানিক কাঁদলে দুলালী। ঘরে বাইরে সবাই আজ তার শত্রু, দুলালীকে জব্দ করবার জন্য সকলে মিলে যেন ষড়যন্ত্র করেছে। এইবার কি করবে দুলালী, চুপচাপ সে ঘরে ফিরে যাবে? ঘরে ফিরে লাভ? না—না—ঘরে আর ফিরবে না দুলালী, এর জন্য তার যত ক্ষতি হয় হোক। দূর থেকে কে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, বহুক্ষণ থেকে ডাকছে; ও কি মোহন? হাঁ মোহন—মোহন তাকে ডাকছে। সেই ভাল, ঘরে আর ফিরবে না দুলালী, কোন মতেই আর ঘরে ফিরবে না।

দুলালী ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো। যেখান থেকে সে ফিরে এসেছিলো কুরুলিয়া নদীর ধার দিয়ে—নদী উঠে সেই পথ ধরেই আবার ছুটতে আরম্ভ করলে দুলালী। দূর থেকে সে ডাক দিতে লাগলো—মোহন—মোহন!

পাহাড়ের নীচে একটা পাথরের চাতালের উপর অন্ধকারে চুপচাপ বসেছিলো মোহন। বসে বসে এতক্ষণ সে দুলালীর কথাই ভাবছিলো। দূর থেকে দুলালীর ডাক শুনে সে বলে উঠলো,—কে?

দুলালী ছুটতে ছুটতে এসে মোহনের সামনে দাঁড়ালো, বললে,—আমি।

মোহন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—তুই আবার ফিরে এলি যে?

দুলালী বলে উঠলো,—আমাকে তুই নিয়ে চল মোহন, যেখানে তোর খুশি; আমি যাব—তোর সঙ্গে আমি যাব।

ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—যাবি, সত্যি যাবি?

দুলালী জবাব দিলে,—সেই জন্যেই ত ফিরে এলুম। কিন্তু হাত পা আমার কাঁপছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

মোহন তাড়াতাড়ি বাঁ হাত দিয়ে দুলালীকে জড়িয়ে নিলে, দুলালী ান হাতটা চাপিয়ে দিলে মোহনের কাঁধের উপর। মোহন তাকে জ্ঞাসা করলে,—তোর কলসিটা?

দুলালী বললে,—থাকলো ওটা নদীর ঘাটে পড়ে।

অন্ধকারে চারিদিক ডুবে গেছে, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। নদীধার কে মেঠো একটা সুড়ি পথ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো দুলালী আর াহন, ভিন্-গাঁ দিকে মুখ ক'রে। কিছুদূর গিয়ে দুলালী হঠাৎ থমকে ট্ দাঁড়ালো, বললে,—ও কিসের শব্দ মোহন?

মোহন জবাব দিলে,—রামপুরে মাদল বাজছে, কাল যে তোর বিয়ে।

নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো ালী। তারপর সে হঠাৎ আবার নিঝুম মেরে গেল।

মোহন বললে,—কি ভাবছিস দুলালী?

দুলালী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—কিছু না, চল্।

পাঁচ

রাবণ মাঝির মেয়ের বিয়ে, 'পঞ্চগেরামী' সাঁওতাল এসে জড়ো হয়েছে প্রকাণ্ড ওই বটগাছটার নীচে। সকালের দিকে বর নির্ব্বাচনের কথা ছিল ওই বটতলাতেই, টুংরা মাঝি হাজির আছে, মোহন্ কিন্তু এসে পৌছায়নি। টুংরার দল সকালবেলা হাজির হয়েছে এসে সদলবলে, টুয়াই মাঝির আত্মীয় কুটুম্বেরা যে যেখানে ছিলো টুয়াই সকলকে ধরে নিয়ে এসেছে তার নাতির বিয়ের 'বরিয়াত' হিসাবে। কিন্তু রাবণ মাঝির মেয়েটা যে কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি বাড়ী থেকে সরে পড়েছে আগের দিন রাত্রেই—এ খবরটা সকালবেলা পর্য্যন্ত বাইরের কেউ জানতে পারে নি। একটুখানি বেলা হতেই সোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে। ঘুসরুকাটায় খবর নিয়ে জানা গেছে মোহন মাঝিও নিরুদ্দেশ। এ সংবাদটা জানতে কারো বাকী থাকলো না যে মোহন আর দুলালী একসঙ্গে উধাও হয়েছে। চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে, ক্ষেপে উঠেছে সাঁওতালের দল। এতবড় একটা সমাজ বিরোধী ব্যাপার এ যেন তাদের পক্ষে অসহ্য। ওস্তাদ টুয়াই মাঝি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সাঁওতাল সমাজের সেও একজন প্রধান, সেও একজন মাতব্বর, এতবড় একটা অন্যায়কে চুপচাপ বরদাস্ত ক'রে নেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয় টুয়াই মাঝির পক্ষে। 'পঞ্চগেরামী' সাঁওতাল—ভিন্-গাঁ থেকে যারা জমা হয়েছে এসে তাদের কাছ থেকেই এর বিচার চায় টুয়াই মাঝি। অপরাধের চরম শাস্তির ব্যবস্থা না ক'রে কোন মতেই ক্ষান্ত হবেনা টুয়াই। বটতলায় সমাগত সাঁওতালের দল ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো, টুয়াই মাঝির সঙ্গে এ বিষয়ে সকলেই তারা একমত। সর্দ্দার রাবণ মাঝির মেয়ে

রাতারাতি গৃহত্যাগ ক'রে তার বংশমর্য্যাদাকেই শুধু কলঙ্কিত করে নি; পঞ্চগেরামী সাঁওতালের সমাজ ব্যবস্থার মূলেও সে রীতিমত আঘাত হেনেছে। পঞ্চগেরামী এর প্রতিকার চায়, ব্যভিচারের ক্ষমা নাই সাঁওতালী বিচারে, নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেয় না সাঁওতালী সমাজ।

রাবণ মাঝিকে ডাক দেওয়া হয়েছে। মেয়ে তার কুলত্যাগিনী, দশজনের সামনে এসে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে রাবণ মাঝিকে। পাঁচখানা গাঁয়ের মোড়ল বলে রেহাই পাবে না রাবণ মাঝি, বিয়ের কনে পালিয়ে গেছে তার হেপাজত থেকে, রাবণ মাঝি এর জন্য দায়ী।

টুয়াই মাঝির সর্ব্বাঙ্গ গুর গুর ক'রে কাঁপছে। বিক্ষুব্ধ জনতাও চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো ক্রমশই, এর একটা ব্যবস্থা না ক'রে তারা শান্ত হবে না। রাবণ মাঝিকে ডাক দেওয়া হয়েছে, আগে তার কৈফিয়ৎ শুনে তারপর ভেবে চিন্তে কর্ত্তব্য স্থির করা হবে। টুয়াই মাঝি আর একজন লোক পাঠিয়ে দিলে রাবণ মাঝিকে ডাকতে।

ঘুসরুকাটার চাঁদরায় মাঝি—মোহন মাঝির কাকা, বর্ত্তমানে মোহন মাঝির অভিভাবক সে, তার সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া দরকার। 'পঞ্চগেরামী' থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে চাঁদরায় মাঝিকে, মোহন মাঝির পক্ষ থেকে যদি তার কিছু বলবার থাকে সে যেন নিজে এসে বলে যায় দশজনের সামনে। চাঁদরায় মাঝি পৌঁছয় নি এসে।

বৈশাখের খর রোদ্দুর ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগলো। বটতলার ছায়ায় বসে সমবেত সাঁওতালের দল তুমুল এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। টুয়াই মাঝির আলোচনা চলছে মাতব্বরদের সঙ্গে, বিহিত এর একটা করতেই হবে। টুংরা মাঝি চুপচাপ বসে আছে একপাশে কাঁড়-ধেনুক হাতে নিয়ে। ভালুকের বাচ্ছাটা সকাল থেকেই একধারে বাঁধা আছে বটগাছের শিকড়ে। টুংরার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, বিয়ের কনে

তার হাতছাড়া হয়ে গেল হঠাৎ মোহন মাঝির চক্রান্তে, এ আফসোস মলেও যাবে না টুংরার। মোহনকে একহাত দেখে নেবে টুংরা, সামনা সামনি কখনো যদি মোহনের সঙ্গে আবার দেখা হয়। টুংরা মাঝির ভিতরটা গুর গুর করছে রাগে।

বিয়েবাড়ী নিঝুম, রাবণ মাঝি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। নদীর ঘাটে জল ভরতে গিয়ে দুলালী যে মোহনের সঙ্গে পালিয়েছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কিষ্টু মাঝি প্রমান। রাবণ মাঝি নিজে গিয়ে সন্ধান নিয়ে এসেছে ঘুসরুকাটায়, দুলালীর বা মোহন মাঝির সেখানেও কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

রাবণ মাঝির বুকখানা ভেঙ্গে দিয়ে, তার উঁচু মাথা এমনভাবে নীচু ক'রে দিয়ে, মান ইজ্জৎ সব কিছু তার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে একমাত্র মেয়ে যে তার এমনভাবে রাতারাতি ঘরদোর ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে, স্বপ্নেও এ কথা ভাবতে পারেনি রাবণ মাঝি। পাঁচখানা গাঁয়ের মোড়ল রাবণ সর্দ্দার, তার মেয়ে কিনা মুখে তার চুন কালি লেপে দিয়ে কুলত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেল! কুটুম্বদের কাছে কৈফিয়ত দেবে কি রাবণ মাঝি, আজ যে তার মেয়ের বিয়ে।

টুশকী মেঝেন সারারাত চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদেছে। হতভাগী মেয়েটা কিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কলঙ্কিনী নাম কিনলে। বুক চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে টুশকীর, কিন্তু মুখ ফুটে কাঁদবার আর উপায় নাই, রাবণ মাঝির কাছ থেকে ধমক খেয়ে টুশকী একেবারে নিঝুম মেরে গেছে। পাথরের মূর্ত্তির মত দাওয়ার এক পাশে চুপচাপ বসে আছে টুশকী মেঝেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

কিষ্টু মাঝি এসে আর একবার খবর দিয়ে গেল, কুটুম্বেরা দেখা করতে চায় রাবণ মাঝির সঙ্গে। রাবণ মাঝি জোর ক'রে খাটিয়া ছেড়ে উঠে

দাঁড়ালো, দশজনের সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে, উপায় নাই। ওরা হয়ত 'পঞ্চগেরামী' সাঁওতাল মিলে অপরাধী সাব্যস্ত করবে রাবণ মাঝিকে। রাবণ মাঝি আজ অপরাধী, সে বিষয়ে সন্দেহ কি, দুলালীর মত মেয়ের যে সে জন্ম দিয়েছে। সমাজের কাছ থেকে শাস্তি যদি পেতে হয় আজ রাবণ মাঝিকে, প্রতিবাদ করবার কিছু নাই রাবণ মাঝির, মাথা পেতে সব কিছু তাকে সয়ে নিতে হবে, কোন উপায় নাই।

কিষ্টু মাঝি দরজার পাশ থেকে আর একটা ডাক দিলে,—সদ্দার !

রাবণ মাঝি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো,—চল্।

রাবণ মাঝির পা দুটো যেন ভারী হয়ে উঠেছে, সদর কুলি দিয়ে হেঁটে যেতে লজ্জায় তার মাথাটা যেন আপনা থেকেই নুয়ে পড়ছে। কেবলই তার মনে হতে লাগলো—চার দিক থেকে সকলেই যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে রাবণ মাঝির দিকে, সকলেই আজ মনে মনে হয়ত ধিক্কার দিচ্ছে সদ্দার রাবণ মাঝিকে। কোন রকমে চোখ কান বুজে গাঁয়ের কুলি দিয়ে টলতে টলতে হেঁটে চললো রাবণ মাঝি।

বটতলার সামনে রাবণ মাঝি গিয়ে দাঁড়াতেই চারদিক থেকে একটা গুঞ্জন উঠলো, টুয়াই মাঝি একটা হাঁক দিয়ে বললে,—ইদিকে—ইদিকে—এইখানে।

হাত পা যেন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো রাবণ মাঝির, সর্ব্বাঙ্গ তার অবশ হয়ে আসছে। টুয়াই মাঝির কথা শেষ হতে না হতেই মাথাটা হঠাৎ বোঁ ক'রে যেন ঘুরে উঠলো রাবণ মাঝির, থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে মজলিসের মাঝখানেই মাটির উপর সে লুটিয়ে পড়লো হঠাৎ। কিষ্টু মাঝি তাড়াতাড়ি টেনে তুললে রাবণ মাঝিকে, কয়েকজনে মিলে ধরাধরি ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুইয়ে দেওয়া হলো একটা খাটিয়ার উপর। পরক্ষণেই নিজেকে আবার সামলে নিলে রাবণ মাঝি, মাটির দিকে মুখ

নীচু ক'রে চুপচাপ সে খাটিয়ার উপর উঠে বসলো। সমাগত সাঁওতালদের উদ্দেশ্যে টুয়াই মাঝি একটা হাঁক দিয়ে বললে,—বসে পড় যে যেখানে আছিস, চুপচাপ বসে পড়।

চারিদিক শান্ত হয়ে গেল। রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলো টুয়াই মাঝি,—আমাদের কি শুধু অপমান করতে ডেকে আনা হয়েছে? বিয়ের কনে তোর ঘর থেকে রাতারাতি নিখোঁজ হয়ে গেল, এর মানে?

রাবণ মাঝি কোন জবাব দিলে না, মনের মধ্যে তার ঝড় বইছে; টুয়াই মাঝির এ প্রশ্নের উত্তরে বলবার যে তার কিছু নাই।

টুয়াই মাঝি পুনরায় বলে উঠলো,—তোকে আমি বলেছিলাম না রাবণ মাঝি, যে মেয়েকে তোর কারো সঙ্গে মিশতে দিবি না; বিয়ের আগে মেয়ে যদি তোর কোন কারণে দুষী হয় তার জন্যে দায়ী হতে হবে তোকে। কথাটি আমার ফললো তো?

টুংরা মাঝি নিঝুম মেরে বসেছিলো একধারে। দাঁতে দাঁত চেপে কাঁড়ধেনুকটা হাতে নিয়ে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—ওদের আমি খুন করবো, ও দুটোকেই আমি খুন করবো।

টুয়াই মাঝি টুংরাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—ঘাবড়াস না, সবুর।

রাবণ মাঝি ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলে একবার টুয়াই মাঝির দিকে, বললে,—আমাকে তোরা শাস্তি দে উস্তাজ! তোদের সঙ্গে আমি কথার খেলাপ করেছি, আমাকে তোরা যেমন খুশি শাস্তি দে।

টুংরা আবার ক্ষেপে উঠলো, বললে,—তুই বুড়ো যত অনর্থের গোড়া। মোহন মাঝিকে ডেকে এনেছিলি তুই, বিয়ের মজলিস থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলি তুই, তোরই লেগে এই গণ্ডগোলটি বেধে গেল আজ, তোকেই আজ আমি শেষ ক'রে ফেলবো।

রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে তীর ধনুকটা হঠাৎ তুলে ধরলে টুংরা। চারদিক থেকে সকলেই হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো, পাশ থেকে একজন হাত দুটো চেপে ধরলে টুংরার।

রাবণ মাঝির পাশ থেকে কিষ্টু মাঝি হঠাৎ রুখে উঠলো, বললে,— খবরদার।

রামপুরের আরও কয়েকজন সাঁওতাল উত্তেজিত হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে টুংরা মাঝির বিরুদ্ধে।

রাবণ মাঝি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। রামপুরের সাঁওতালদের সে ইসারায় থামিয়ে দিয়ে টুংরার দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—সাবাস বেটা— সাবাস, চালা তুই কাঁড় রাবণ মাঝির বুকখানা লক্ষ্য ক'রে, পারিস যদি একেবারে তাকে শেষ ক'রে দে। এ আমি আর সইতে পারছি না।

সর্দ্দার রাবণ মাঝির পক্ষে সত্যই এ অসহ্য। নিজের বুকখানা হঠাৎ দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলে রাবণ মাঝি। কিষ্টু মাঝি তার মনের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে শুধু ভাঙ্গা গলায় একবার বলে উঠলো,—সর্দ্দার!

টুয়াই মাঝি একটু উচ্চকণ্ঠে বললে,—সহজে তুই রেহাই পাবি না রাবণ মাঝি। আমরা তোর ভ্রষ্টা মেয়েকে যেখান থেকে পারি ধরে নিয়ে আসবো, তোর চোখের সামনে এমন শাস্তি তাকে দেব যা দেখে তুই আঁতকে উঠবি। সে শয়তানীকে আমরা সহজে ছাড়বো না।

রাবণ মাঝির চোখ দুটো হঠাৎ দপ্‌ ক'রে যেন জ্বলে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—পারবি—পারবি উস্তাজ, সেই শয়তানীকে ধরে আনতে? আমি ওকে একবার দেখবো।

রাবণ মাঝির সর্ব্বাঙ্গ গুর গুর ক'রে কাঁপছে। টুয়াই মাঝি আবার বলে উঠলো,—খুঁজে আমরা বের করবোই তাকে, যেমন ক'রে হোক।

সাঁওতালদের জানগুরু বৃদ্ধ মাহান মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো টুয়াই,—গুণে গেঁথে একবার দেখতে পারিস জানগুরু, মেয়েটা এখন কোথায় ?

মাহান মাঝি এ অঞ্চলের ডাকসাইটে গণৎকার। হাত গুণে বা খড়ি পেতে সব কিছুই সে বলে দিতে পারে, 'ঝাড়ফুঁকে' মাহান মাঝি সিদ্ধপীঠ, ভূত প্রেত, ডান ডাকিনী বেহ্মদত্তি চরিয়ে মাহান মাঝির চুল পেকে গেছে। অদৃশ্য শক্তির বলে অসাধ্য সাধন করতে পারে সে। লোকে বলে মাহান মাঝি নাকি সর্ব্বজ্ঞ, এতবড় জানগুরু এ তল্লাটে আর দেখতে পাওয়া যায় না। 'বিসাহীসেদ্ধাই' জানগুরু এই মাহান মাঝি সাঁওতালদের গুরুস্থানীয়। মাহান মাঝির গণনা একেবারে অব্যর্থ, যাবতীয় ভূত ভবিষ্যত চোখ বুজে সে বলে দিতে পারে।

সকলে মিলে মাহান মাঝিকে ধরে বসলো, গণনা ক'রে বলে দিতে হবে রাবণ মাঝির মেয়েটা এখন কোথায়।

এতগুলো লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। জানগুরু মাহান মাঝিকে তৈরি হয়ে বসতে হলো একধারে আসন পেতে। এ পর্য্যন্ত কত লোকের কত অজ্ঞাত তথ্যই না আবিষ্কার ক'রে দিতে হয়েছে মাহান মাঝিকে হাত গুণে আর খড়ি পেতে। কারো হয়ত গরু হারালো, ছুটলো অমনি মাহান মাঝির কাছে, জানগুরু মাহান মাঝি যাহোক তার একটা হদিস বাতলে দেবে। কারো ছেলেকে ডানে খেয়েছে, মাহান মাঝির ঝাড় ফুঁকেই আরাম হয়ে গেল। ধানচোর ঘটিচোর বাটিচোর থেকে আরম্ভ ক'রে এ পর্য্যন্ত কত ছ্যাঁচকা চোর যে ধরা পড়েছে মাহান মাঝির 'বাটিচালার' ফলে, তার ইয়ত্তা নাই। হাত গুণে সে সব কিছু বলে দিতে পারে, ও সব তার নখদর্পনে। সাঁওতালদের অগাধ বিশ্বাস এই জানগুরুর উপর।

মজলিসের মাঝখানে বসে মাহান মাঝি একটা কাঠি দিয়ে মাটির উপর দাগ কাটতে লাগলো। টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—বেশ ভাল করে গুণে দেখ, ব্যাপারটি সহজ নয়।

বৃদ্ধ মাহান মাঝি ধ্যানস্থ হয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে একটুখানি মাথা নেড়ে বললে,—হুঁ। তারপর সে টুয়াই মাঝির দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—নিজের চোখে দেখতে চাস?

টুয়াই মাঝি সাগ্রহে বললে,—কি রকম বল দেখি?

জানগুরু মাহান মাঝি বটগাছ থেকে একটা কচি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বললে,—তোরা একজন এদিকে এগিয়ে আয়, বিয়ে হয়নি এমন একজন কেউ,—'তেল-দপ্পন' ধরতে হবে।

মাহান মাঝির 'তেল দর্পন' একেবারে অব্যর্থ, বহুক্ষেত্রে পরখ করা আছে। নিরুদ্দিষ্ট বা অপহৃত বস্তু, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণীবিশেষের প্রত্যক্ষ ছায়ামূর্ত্তি জানগুরু মাহান মাঝির তেলদর্পনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় ঠিক যেন আয়নার ছবির মত। অন্যান্য জানগুরুদের চেয়ে এ বিষয়ে মাহান মাঝির দক্ষতা নাকি ঢের বেশি।

মাঝপাড়ার লখনা মাঝির এখনো বিয়ে হয়নি. অল্পবয়সী ছোকরাদের মধ্যে লখনা বেশ চালাক চতুর, সকলে মিলে লখনা মাঝিকেই ঠেলেঠুলে এগিয়ে দিলে জানগুরু মাহান মাঝির দিকে। মাহান মাঝি কচি বটপাতাটার উল্টো দিকে খানিক সিঁদুর লেপে মসৃন দিকটা তিনবার রগ্‌ড়ে দিলে মন্তর-পড়া তেল দিয়ে। লখনার হাতে চকচকে সেই তেল মাখানো পাতাটা ধরিয়ে দিয়ে জানগুরু বললে,—এই পাতার মধ্যে লক্ষ্য ক'রে দেখ, কিছু দেখতে পাচ্ছিস?

লখনা একদৃষ্টে সেই পাতাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—কই না ত।

মাহান মাঝির ঠোঁট দুটো নড়তে লাগলো, কি যেন একটা মন্তর পড়ে পাত্তাটায় একবার ফুঁ দিয়ে বললে,—বেশ ভাল ক'রে দেখ দেখি।

লখনা একটু বিস্মিত ভাবে বললে,—দুটো লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

মাহান মাঝি বললে,—একটা মেয়ে, একটা পুরুষ?

লখনা একটু থমকে বললে,—হাঁ জানগুরু।

টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—ঠিক ঠিক, এ কি ভুল হবার যো আছে।

জানগুরু মাহান মাঝি প্রশ্ন করলে,—ওদের তুই চিনিস?

লখনা মাঝি জবাব দিলে,—মেয়েটাকে চিনতে পারছি, আমাদের পাড়ার দুলালী।

রাবন মাঝি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো, মাহান মাঝি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে,—আর পুরুষটা?

লখনা আরও কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলো তেলদর্পনের দিকে, বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বললে,—ওকেও চিনি, ওই যে সেদিন বিয়ে করতে এসেছিলো দুলালীকে।

টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—ঘুসরুকাটার মোহন মাঝি?

লখনা বললে,—হঁ—হঁ—উয়েই বটে।

টুংরা মাঝি লখনার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে,—দেখি—দেখি—আমি একবার দেখি।

জানগুরু বাধা দিয়ে বললে,—থাম্।

রাবণ মাঝি টুয়াইয়ের দিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে বললে,—উস্তাজ, তোরা ওদের কোন রকমে ধরে আনতে পারিস? পারিস আমার সামনে এনে একবার হাজির ক'রে দিতে?

রাবণ মাঝি অধীর হয়ে উঠলো, কি শত্রুতাই না ক'রে গেল মেয়েটা। কিষ্টু মাঝির দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে সে বলে উঠলো আবার,—কিষ্টু—কিষ্টু—আমার বল্লম—নিয়ে আয় আমার বল্লমটা, শয়তানীকে আমি নিজের হাতে খুঁচিয়ে মারবো।

টুয়াই মাঝি বাধা দিয়ে বললে,—তা ত হয় না সর্দ্দার, মেয়ে তোর ভ্রষ্টা, ও মেয়ের বিচার এখন আমাদের হাতে।

অপর একজন সায় দিয়ে বললে,—সাঁওতালী ধারা মতে বিচার হওয়া চাই, 'পঞ্চগেরামী' হাজির আছে, হোক এই মজলিসেই বিচার।

অন্যান্য সাঁওতালদেরও মত তাই, এই মজলিসেই যা হোক একটা হয়ে যাক কিছু। এ কলঙ্ক শুধু রামপুর বা ঘুসরুকাটার নয়, এ কলঙ্ক 'পঞ্চগেরামী' সাঁওতাল সমাজের। সাঁওতালী বিধি বিধান ও নিয়ম শৃঙ্খলাকে এমন অন্যায় ভাবে যারা লঙ্ঘন করেছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না ক'রে এক পাও কেউ নড়তে চায় না। সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে উস্তাজ টুয়াই মাঝির উপর বিচারের ভার ছেড়ে দিলে, এ বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে হবে তাকেই।

রাবণ মাঝির আর বলবার কিছু নাই, তাকেও এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হলো, টুয়াই মাঝির ব্যবস্থা সে মেনে নিতে প্রস্তুত।

টুয়াই মাঝি খুশী হয়ে বললে,—সাঁওতালী ধারা মতেই হোক তাহলে বিচার। মেয়েকে তোর যেখান থেকে হোক খুঁজে আনতে হবে রাবণ মাঝি, আবার তাকে ধরে এনে আমাদের সামনে হাজির ক'রে দিতে হবে, এ ভার আমরা তোরই হাতে ছেড়ে দিতে চাই। ও মেয়ের আমরা বিয়ে দিব আবার—যার সঙ্গে খুশী।

মজলিসের মাঝখান থেকে আর একজন বলে উঠলো,—কিন্তু উস্তাজ, ও ভ্রষ্টা মেয়েকে আর কি কেউ বিয়ে করতে রাজি হবে?

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—সে ভার আমার, বিয়ে করবার লোক আমি জোগাড় ক'রে দিব। কানা হোক—খোঁড়া হোক—কুঠে হোক—লোক একটা জুটবেই।

রাবণ মাঝি হঠাৎ একটু চমকে উঠলো,। বললে,—তা কেমন ক'রে হতে পারে উস্তাজ ?

টুয়াই মাঝি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলে,—এই হলো সাঁওতালী বিচার। বিয়ের আগে কোন মেয়ে যদি ভ্রষ্টা হয় তা হলে তার শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে কানা খোঁড়া বা যে কোন কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য একটা ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া। সেই জীবন্ত বোঝার ভার আজীবন তাকে বয়ে যেতে হবে, এরি নাম সাঁওতালী বিচার। তোর ওই কুলত্যাগিনী মেয়ের সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই আমরা করবো

ঠিক কথা, টুয়াই মাঝির এ প্রস্তাব সমর্থন করলে সকলেই, এই রকমেরই বিচার তারা চায়। নেতৃস্থানীয় অপর এক বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলে উঠলো,—সাবাস।

রাবণ মাঝির কল্পনায় ভেসে উঠলো নিতান্ত বিসদৃশ এক মর্ম্মান্তিক চিত্র। একটু ভারী গলায় বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—তার চেয়ে তাকে একেবারে শেষ ক'রে দিলে হয় না উস্তাজ ?

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—না— তা হয় না, তা হতে আমরা দিব না। তোর ওই মেয়ের খোঁজে চারিদিকে আমরা লোক পাঠাব, কেউ তার সন্ধান পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তোকে খবর দেওয়া হবে ; তুই নিজে গিয়ে তাকে ধরে এনে দিবি আমাদের সামনে। এ স্বত্বে তুই রাজি আছিস ?

রাবণ মাঝি একটু মুসড়ে পড়েছিলো, দেখতে দেখতে আবার সে কঠোর হয়ে উঠলো। সমস্ত দুর্ব্বলতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—তাই হোক উস্তাজ ! তোরা তাকে যেমন খুশী

শাস্তি দিস, সে শয়তানীকে আমি ধরে এনে দিব ; আমি জানবো ও মেয়ে আমার বেঁচে নাই, সে মরেছে।

রাগে দুঃখে অপমানে রাবণ মাঝির চোখ দিয়ে হঠাৎ টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। কিন্তু মাঝি টুয়াই মাঝির দিকে চেয়ে একটু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো,—আর যে শয়তান সেই মেয়েটিকে কৌশলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে তার সর্ব্বনাশটি করলে, তার বিচারটি তোরা কি করছিস শুনি ?

নেহ্য কথা, এ ব্যাপারে মোহন মাঝির অপরাধের গুরুত্বটাও বড় কম নয়। বিক্ষুব্ধ জনতা এই সঙ্গে মোহন মাঝিরও বিচার দাবি ক'রে বসলো।

টুয়াই মাঝির চোখ দুটো যেন আর একবার জলে উঠলো দপ্ ক'রে, গম্ভীর গলায় সে বলে উঠলো,—মোহন মাঝিকেও আমরা ছেড়ে কথা কইব না। আজ থেকে সে 'পঞ্চগেরামী' সমাজের বার। তার ছোঁয়া জল আমরা খাব না, তাকে আর আমরা এক পংক্তিতে বসতে দিব না, আমরা তার এক কাঠা জমি পর্য্যন্ত চষতে দিব না কোন বেটাকে ; আজ থেকে সে একঘরে, সাঁওতাল সমাজের বার। আবার যদি সে ফিরে এসে দাঁড়ায় কখনো আমাদের সামনে, দূর থেকে আমরা তাকে কুকুর লেলিয়ে দিব।

ভালুকপোতার লপ্সা মাঝি লাঠি উঁচিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো,—আমরা ওর ঘরদোর ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো করে দিব, ওর ভিটেয় আমরা আগুন জেলে দিব। সে যদি আবার ফিরে আসে কখনো—দেখবে ওর মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত আমরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি।

সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অতি মাত্রায়, এই রকমের একটা কিছু করতে না পারলে কেউ যেন মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছে না। লপসা মাঝিকে সমর্থন ক'রে একসঙ্গে সব চার দিক থেকে চীৎকার জুড়ে দিলে। লপসা

মাঝি আবার বলে উঠলো,—তুই আমাদের হুকুম দে উস্তাজ, এই পথেই আমরা মোহন মাঝির ঘরবাড়ী সব শেষ ক'রে দিয়ে যাই, ওর ভিটের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত আমরা রেখে যাব না।

টুংরা মাঝি বলে উঠলো,—নিজের হাতে আমি খড়ো চালে ওর আগুন ধরিয়ে দিব, পুড়ে বেবাক ছাই হয়ে যাক।

লাঠি সোঁটা তীর ধনুক হাতে নিয়ে সকলেই মরিয়া হয়ে উঠলো। সাঁওতালী গোঁ—কোন রকমে একবার যদি ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠে, সহজে ওদের শান্ত করা কঠিন। পাঁচ জনের অনুরোধে টুয়াই মাঝিকেও সায় দিতে হলো, বললে,—তাই চল্—সোজা একেবারে ঘুসরুকাটা, কাজ একদম শেষ ক'রেই ফিরবো।

টুয়াই মাঝির সাড়া পেয়ে হৈ হৈ ক'রে উঠলো প্রায় এক দেড় শ' সাঁওতাল। মরিয়া হয়ে ছুটলো তারা ঘুসরুকাটার পথ ধরে। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য চারিদিকে যেন আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে, পথের দু'ধারে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ ধূ ধূ করছে মরুভূমির মত, পথের ধুলো গরম হয়ে উঠেছে। কারো কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, উন্মত্ত সাঁওতালের দল ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে, সঙ্গে তাদের দলপতি ভালুকপোতার টুয়াই মাঝি।

বটতলার ছায়ায় রাবণ মাঝি বসে বসে ভাবছে। একদৃষ্টে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে নদীধার দিকে মুখ ক'রে, ঘুসরুকাটা গ্রামখানা যেন রাবণ মাঝির চোখের সামনে দুলছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো রাবণ মাঝি, মন তার অবসাদে ভরে উঠেছে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাক দিলে,—কিষ্টু!

কিষ্টু মাঝি ধীরে ধীরে বললে,—ঘরে চল্ সদ্দার, ভেবে আর লাভ নাই কোন।

রাবণ মাঝি একটু অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো,—তাই চল্।

বিক্ষুব্ধ সাঁওতালের দল প্রচণ্ডবেগে হানা দিলে গিয়ে ঘুসরুকাটায়। মোহন মাঝির সদর দোরে গিয়ে থমকে খানিক দাঁড়োলো ওরা। মোহন মাঝির কাকা চাঁদরায় মাঝি আগে থেকে খবর পেয়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। মোহন আজ সকলের চোখেই অপরাধী, অপরাধ তার গুরুতর সন্দেহ নাই, চাঁদরায় মাঝির বংশের সে কলঙ্ক। তার জন্য সমাজ থেকে যে কোন দণ্ডের ব্যবস্থা করুক—চাঁদরায় মাঝির বলবার তাতে কিছু নাই, কিন্তু তার বাপ পিতামোর ভিটেখানার উপর কেউ যে এসে কোন রকম অত্যাচার ক'রে যাবে চাঁদরায় মাঝির চোখের সামনে, এটা তার পক্ষে অসহ্য। টুয়াই মাঝি সদলবলে সামনে এসে দাঁড়াতেই চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—তোরা থাম, আমি হাতজোড় ক'রে বলছি উস্তাজ, তোরা থাম।

টুয়াই মাঝি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠলো,—মোহন মাঝি কোথা?

চাঁদরায় মাঝি জবাব দিলে,—তার কথা আর তুলিস না উস্তাজ, সে কুলাঙ্গার মরেছে।

টুয়াই মাঝি দাঁতে দাঁত চেপে বললে,—সেই জন্যেই ত আমরা তার সৎকারের ব্যবস্থা করতে এসেছি।

কয়েকজনে মিলে মোহন মাঝির সদর দোরের সামনে থেকে জোর ক'রে চাঁদরায় মাঝিকে সরিয়ে দিলে। ভিতর থেকে সদর দোর বন্ধ, টুয়াই মাঝি হুকুম দিলে,—ভাঙ্গ—লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেল কপাট দুটো।

চাঁদরায় মাঝি প্রাণপণ শক্তিতে জনতার ভিড় ঠেলে খানিক এগিয়ে

গিয়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে রুখে দাঁড়ালো, বললে,—উক্তা কাজটা কিন্তু ভাল হবেক নাই।

টুয়াই মাঝি লপসা মাঝির দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো,-হটাও বুড়োকে এখান থেকে।

লপসা মাঝি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো চাঁদরায় মাঝির উপর সকলে মিলে ধাক্কা দিয়ে তাকে দোরের সামনে থেকে সরিয়ে দেবা চেষ্টা করতে লাগলো। বৃদ্ধ চাঁদরায় মাঝি চীৎকার ক'রে ব উঠলো,—খবরদার—খবরদার তোরা ঘরে ঢুকিস না, ঘরে আ তোদের ঢুকতে দিব না—কিছুতেই না।

লপসা মাঝি পিছন দিক থেকে চাঁদরায় মাঝির ঘাড়টা বেশ শক্ত ক'রে চেপে ধরে এমন একটা ধাক্কা দিলে যে চাঁদরায় মাঝি মুখ থুবড়ে পড়লো গিয়ে রাস্তার উপর। শুকনো একটা মহুল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে চাঁদরায় মাঝির কপাল কেটে ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগলো। চাঁদরায় মাঝির মেঝেনবুড়ী দূর থেকে লক্ষ্য ক'রে ডুকরে হঠাৎ কেঁদে উঠলো। কয়েকজন প্রতিবেশী মিলে চাঁদরায় মাঝিকে ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে চললো তার নিজের ঘরে। কপালে তার জলপটি বেঁধে চাঁদরায় মাঝিকে ওরা জোর করে শুইয়ে দিলে একটা খাটিয়ার উপর। চাঁদরায় মাঝি শুয়ে শুয়েই চীৎকার করতে লাগলো,—তোরা আমাকে ছেড়ে দে, ওদের হাতে আমি জান দিব—তোরা আমাকে ছেড়ে দে।

উন্মত্ত সাঁওতালের দল দরজা ভেঙ্গে পিলপিল ক'রে ঢুকে পড়লো মোহন মাঝির ঘরের মধ্যে। জিনিস পত্র যেখানে যা পেলে তারা চোখের সামনে—ভেঙ্গে চুরে বিলকুল সব একাকার ক'রে দিলে। তাদের হৈ-হাল্লা ও চীৎকারের শব্দে ঘুসরুকাটা গ্রামখানা যেন কেঁপে

কেঁপে উঠতে লাগলো। আহত চাঁদরায় মাঝি নিজের ঘরে খাটিয়ার উপর পড়ে পড়ে ছটফট করছে। এমন সময় হঠাৎ চীৎকার উঠলো,—সেঙেল—সেঙেল।*

শিয়রের দিকের জানলাটা হাত বাড়িয়ে খুলে দিলে চাঁদরায় মাঝি। দূর থেকে তার চোখে পড়লো মোহন মাঝির কোঠাঘর খ'না দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে টুয়াই মাঝি বাইরে এসে দাঁড়ালো, বললে,—কাঁড়ধেনুক হাতে নিয়ে চারদিক তোরা ঘেরাও ক'রে রাখ, কোন বেটা যেন এক ঘটি জল ঢেলে এতটুকু আগুন নেবাতে না পারে।

চাঁদরায় মাঝির বুকের ভিতরটা যেন পুড়ে যেতে লাগলো। চোখ দুটো দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে পাগলের মত সে চীৎকার ক'রে উঠলো,—দে—দে—জানলাটা কেউ বন্ধ ক'রে দে, এ আর আমি দেখতে পাচ্ছি না, শিগ্‌গীর তোরা জানলাটা বন্ধ ক'রে দে।

বলতে বলতেই বৃদ্ধ চাঁদরায় মাঝি সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো আবার খাটিয়ার উপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহন মাঝির ঘর বাড়ী পুড়ে বেবাক ছাই হয়ে গেল।

---

* সেঙেল—আগুন

ছয়

পাথরডি কলিয়ারি। ধানবাদ ঝরিয়া লাইনের পাথরডি ষ্টেশন থেকে কলিয়ারির ব্যবধান ক্রোশখানেকের মধ্যেই। এই খাদেই মালকাটার কাজ করে মোহন মাঝি। ডুলালীকে খাদের উপর কাজ করতে হয়। সকালবেলা গাঁইতি কাঁধে মগবাতি হাতে ঝুলিয়ে ধাওড়া থেকে বেরিয়ে যায় মোহন, সিটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে হাজরি বাবুর খাতায় নাম লিখিয়ে অন্যান্য মালকাটাদের সঙ্গে খাদে নামতে হয় মোহনকে। ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে খাদের উপর কাজ আরম্ভ হয় ডুলালীর, কোন দিন সে মাল-গাড়ীতে কয়লা বোঝাই দেয়, কোন দিন বা ট্রাম লাইন থেকে টব গাড়ী খালাস ক'রে কয়লার গাদা সাজায় সাইডিং এর ধারে। খাদের নীচে গাঁইতি চালায় মোহন, খাদের উপর অন্যান্য কামিনদের সঙ্গে ঝোড়া মাথায় আপন মনে কাজ ক'রে যায় ডুলালী। কাজের গতিকে সারা দিন তাদের বাধ্য হয়ে দূরে দূরেই কাটাতে হয়। মাঝে মাঝে ডুলালীর মন চঞ্চল হয়ে উঠে, কাজ কর্ম্ম তার ভাল লাগে না, কিন্তু উপায় কি,—কাজ যে তাকে করতেই হবে। গোড়ার দিকে এ সব কাজে একেবারেই মন লাগতো না ডুলালীর, কিন্তু একজনের খাটনির উপর নির্ভর ক'রে চুপচাপ বসে থাকা চলে না; কোন রকমে তাতে টেনে টুনে চলে গেলেও সংসারের অভাব তাতে মিটবে না কোন দিনই। একটু একটু ক'রে কলিয়ারির কাজ কর্ম্ম তাই শিখে নিতে হয়েছে ডুলালীকে। দেশ থেকে চলে আসার পর কলিয়ারির আবহাওয়াটা একেবারে ভাল লাগতো না ডুলালীর, সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতো। এ যেন এক নূতন জগৎ, চারিদিকে শুধু বয়লারের ধোঁয়া আর রাশিকৃত কয়লার পাহাড়। কলিয়ারির একটানা

শব্দ,—ঘ্যাড়াং—ঘ্যাড়াং—ঘ্যাস্—ঘ্যাস্, দিন নাই রাত নাই চলছে ত চলছেই। মনে মনে হাঁপিয়ে উঠতো দুলালী, মনে পড়তো তার সাঁওতাল পরগনার চোখ জুড়ানো সেই সবুজ মাঠ, ঝকঝকে তকতকে সাঁওতাল পল্লী, ঝরঝরে মুক্ত নীল আকাশ, চারিদিকে মহুয়ার বন, বিস্তীর্ণ ময়দান জুড়ে বড় বড় ভুট্টার ক্ষেতে সবুজের ঢেউ খেলানো, সে দেশের বাতাসটি পর্যন্ত রকমারি ফুলের গন্ধে ভরা। এখানে শুধু নানান দেশের মানুষের ভিড়; কেউ কারো কথা বোঝে না, কেউ কারো মন বোঝে না, কেউ কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে দু'দণ্ড কথা কয় না। এ দেশের আকাশে বাতাসে শুধু কয়লার কালি, নিশ্বাস নিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয় দুলালীর। কিন্তু উপায় কি, এই ধোঁয়া আর কালির দেশকেই সয়ে নিতে সে বাধ্য হয়েছে। কালামুখী কলঙ্কিনী বলে দেশের লোকে হয়তো তার বদনাম রটাবে, কিন্তু দুলালী মনে মনে জানে মোহনের সঙ্গে পালিয়ে এসে ধর্ম্মত সে কোন অপরাধ করেনি। মাঝে মাঝে তবু দেশের কথা স্মরণ ক'রে ভয়ানক মন খারাপ করতো দুলালীর, এখন অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিশেষতঃ মেয়েটা হওয়ার পর থেকে দুলালীর সেই অস্বস্তিকর ভাবটা যেন কেটে গেছে অনেকখানা। ছোট্ট ওই কচি মেয়েটাকে নিয়ে দিন এইভাবেই কেটে যায় কোন রকমে।

মেয়েটাকে গাছতলায় ছোট একটা খাটুলির উপর শুইয়ে দিয়ে সারাদিন কোম্পানীর কাজ ক'রে যায় দুলালী। সন্ধ্যার আগে ধাওড়ায় ফিরে দোকান থেকে চাল ডাল কিনে এনে কাঁচা কয়লার চুল্লিতে রান্না চড়িয়ে দেয়। মোহনের ফিরতে আজকাল সন্ধ্যা হয়ে যায় প্রায়ই।

কাঁচা কয়লার জ্বলন্ত উনুনে ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে ধাওড়ার দাওয়ায় বসে তরকারি কুটছে দুলালী। দুলালীর মেয়েটা দাওয়ার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একপাশে ধাওড়ার উঠানে; সর্ব্বাঙ্গে তার ধুলো

মাথা, বুকের উপর ভর দিয়ে মাঝে মাঝে সে হাত পা নেড়ে হামা দেবার চেষ্টা করছে নিজের মনেই। এক একবার দুলালীর মুখের দিকে চেয়ে জড়িয়ে যাওয়া এলোমেলো ভাষায় মেয়েটা যেন কি বলতে চাচ্ছে, দুলালী হাসতে হাসতে ওর নাম ধরে সাড়া দিতেই খিল্ খিল ক'রে হেসে উঠছে মেয়েটা। কচি কচি গোটা কয়েক দাঁত, তারি ফাঁকে কচি মেয়ের হাসিটুকু ঝরে পড়ছে যেন টাটকা ফোটা কুঁড়চি ফুলের স্তবকের মত। মেয়েটার দিকে চেয়ে দুলালী শুধু ভাবে, কত যেন কি ভাবে। এই এক ফোঁটা মেয়ে বাইরের আলো হাওয়ার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন ক'রে যে অজ্ঞাতে সে দুলালীর সারা মন জুড়ে বসেছে, দুলালীর কাছে এ যেন এক হেঁয়ালি। তরকারি কুটা বন্ধ রেখে মেয়েটার দিকে চেয়ে সুর ক'রে ডাক দেয় দুলালী,—আমার বিটি—আমার বিটি—আমার সোনা—ওরে আমার মণি।

খিল্ খিল্ ক'রে আবার হেসে উঠে মেয়েটা।

আজ কিন্তু মনটা বেশ ভাল নাই দুলালীর, সকাল থেকেই মেজাজটা একটু বিগড়ে আছে। মোহন আজ ক'দিন থেকে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে দুলালীর সঙ্গে। সুন্দরা বলে একটা বাউরীর মেয়ে, তার সঙ্গে নাকি মোহনের আজকাল খুব ভাব, তিন নম্বর ধাওড়ার কামিনদের কাছ থেকে নিজের কানে শুনে এসেছে দুলালী। মোহন আর সুন্দরাকে সেদিন ওরা মদ দোকানে বসে একসঙ্গে মদ খেতে দেখে এসেছে। মোহন নাকি মাঝে মাঝে যাওয়া আসাও করে সুন্দরার বাসায়, পথে ঘাটে দেখা হলে হেসে তার সঙ্গে কথা কয়, বটতলার দোকান থেকে পান দোক্তা কিনে খাওয়ায় সুন্দরাকে, আদর ক'রে সুন্দরার খোঁপায় মনমোহিনী বিড়ি গুঁজে দেয়। দুলালী এসব টের পেয়েছে।

পাশের খাদেই কাজ করে সুন্দরা। কাজ অবশ্য বিশেষ কিছু করতে হয় না তাকে, ধপ্ধপে গোরো গা আর চটকদার চেহারার জোরেই বসে বসে কোম্পানীর কাছ থেকে সে হাজরি আদায় করে। খাদসরকারবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে কলিয়ারির বড় বড় সাহেব সুবোরা পর্য্যন্ত সুন্দরাকে পিয়ার করে অনেকেই, চ্যাংড়া বয়সী মাল কাটার দল সুন্দরাকে খাতির ক'রে চলে, সুন্দরার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যায়। পুরুষদের সম্বন্ধে বিশেষ একটা বয়সের মাপকাঠি বা জাত-বেজাতের কোনরকম বালাই সুন্দরার নাই। ফেরতা দিয়ে পাছাপেড়ে শাড়ী পরে ডাঙ্গালে সুরে গান গাইতে গাইতে সুন্দরা যখন হেলে দুলে রাস্তা দিয়ে চলে যায়, দূর থেকে কতলোক হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। এদিক ওদিক একটু আড়চোখে চেয়ে হাল্কা হাসির ছিটে ফোঁটা ছড়িয়ে দিয়ে যায় সুন্দরা চেনা শোনা অন্তরঙ্গ লোক বিশেষদের লক্ষ্য ক'রে। এক কথায় সুন্দরা একটি চিজ্। কাছাকাছি দু' পাঁচখানা কলিয়ারির মধ্যে সুন্দরাকে চিনে না এমন লোক খুব কম। লোকে বলে মেয়েটা কি বেহায়া, সুন্দরা কিন্তু ওসব কথা গ্রাহ্য করে না, নিজের খোশ-খেয়ালেই নানা ফুলের মধু চেখে ঘুরে বেড়ায় সে মরসুমী ফড়িং এর মত। পাঁচ-জনের মন ভুলিয়ে যৌবনের ফাঁদে ফেলে কেমন ক'রে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিংড়ে নিতে হয়, সুন্দরার তা ভালরকমই জানা আছে। স্বামীটা ওর বেঁচে থাকতে সুন্দরার স্বভাব চরিত্র তবু কতকটা সংযত ছিলো, এখন আর কোন বাধা নাই, একদম বেপরোয়া। কয়েক বছর আগে 'সাঙালে' একটা স্বামীর সঙ্গে পাড়া-গাঁ থেকে কয়লা খাদে কাজ করতে এসেছিলো সুন্দরা, খাদের ভিতর কাজ করতে করতে হঠাৎ একদিন কয়লার চাল ধ্বসকে স্বামীটা ওর মারা পড়ে যায়। তার পর থেকে সুন্দরা আর দেশে ফিরেনি, কয়লা খাদেই রয়ে গেছে বরাবর।

এখানে এসে বেশ আছে সুন্দরা, খাদ তরফে সে রীতিমত জমিয়ে নিয়েছে।

দুলালীর রান্না বান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মোহন এসে ধাওড়ার সামনে দাঁড়াতেই কচি মেয়েটা হাত পা নেড়ে খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে হাসতে সাড়া দিলে মোহনকে। গাঁইতি আর মগবাতিটা ধাওড়ার এক পাশে নামিয়ে রেখে মোহন তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো, বললে,—বিটি, লেড়ু খাবি লেড়ু ?

মেয়েটা মোহনের কোলে উঠে মনের আনন্দে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে মোহনকে। মোহন গামছার খুঁট থেকে গুড়ের দু'টী মেঠাই বের ক'রে মেয়েটার সামনে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা দু'হাত দিয়ে নাড়ু দুটো মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে পরম আগ্রহে কামড় দিয়ে চুষতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

মোহনের আজ হপ্তার দিন। কলিয়ারি থেকে হাজরি নিয়ে ফিরবার পথে দুলালীর জন্যে দেশী তাঁতের একখানা ঝরণা-শাড়ী সে পছন্দ ক'রে কিনে নিয়ে এসেছে। দুলালীর সখ আহ্লাদ মেটাবার জন্য মাঝে মাঝে অনেক কিছু খরচা করে মোহন, দুলালী এতে আপত্তি করলেও আপত্তি তার গ্রাহ্য করা হয় না। দেশ ছেড়ে বিদেশে এই তেপান্তরের মাঠে, একান্ত অপরিচিত স্বজন বান্ধবহীন এই কয়লা কুঠির দেশে এসে দুলালীর মন যাতে কোন রকমে ভেঙ্গে না পড়ে, সে বিষয়ে চিন্তার অন্ত নাই মোহনের। দুলালীকে খুশী করতে, দুলালীর মুখে একটুখানি হাসি ফোটাতে সব কিছুই করতে পারে মোহন; দুলালীকে সে কোনদিনই ভাবতে দেয় না। প্রথম প্রথম ভয়ানক মন খারাপ করতো দুলালীর, মোহনকে লুকিয়ে সে এক এক দিন নিজের মনেই ঘরের মেঝেয় পড়ে পড়ে কাঁদতো। অনেক ক'রে বুঝিয়ে পড়িয়ে মোহন তাকে ঠিক ক'রে

নিয়েছে। মেয়েটা হওয়ার পর থেকে দুলালীর সেই উড়ু উড়ু ভাবটা যেন কেটে গেছে অনেকখানা, মেয়েটাকে নিয়ে সময় এখন ওদের মন্দ কাটে না। দুলালী আর মোহনের চোখে মেয়েটা এক নতুন আকর্ষণ। মেয়েটা যখন সাত দিনের—দুলালী ওর নাম রাখলে স্বকুরমনি। মোহনের সে কি হাসি, সাত দিনের মেয়ে তার নাকি আবার এত বড় নাম হয়,—স্বকুরমনি। মোহন ডাকে,—স্বকু, দুলালী ডাকে,—মনি, হাসতে হাসতে দু'জনেই মনের আনন্দে গড়িয়ে পড়ে; সাত দিনের মেয়ে স্বকুরমনি কিন্তু সাড়া দেয় না। সে একটা কি মজার দিন না গেছে।

বেলা ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। রান্নাবান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দুলালীর। মোহন মেয়েটাকে দুলালীর কোলে গুঁজে দিয়ে বললে,—কলের জলে হাত পায়ের কালিগুলো ধুয়ে আসি আমি, তুই ততক্ষণ নতুন এই শাড়ীখানা একবার পর দেখি, দেখি কেমন মানায়।

ঝকঝকে নতুন একখানা শাড়ী দুলালীর দিকে এগিয়ে দিলে মোহন। দুলালী পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো, বললে,—উয়োদিকেই দে' গা যা, আমি আবার কিসকে।

মোহন একটু থমকে বললে,—তার মানে ?

মোহনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ ভার ক'রে একটু রাগতভাবে বললে দুলালী,—তিন নম্বরের কামিন দিকে শুধাই আয়গে যা, কাকে সেদিন মদ খাওয়াচ্ছিলি পূব কুঠির দোকানে ?

মোহন একটু গোলমালে পড়লো, একটুখানি ভেবে বললে,—স্বন্দরার কথা বলছিস ?

মোহন হঠাৎ নিজের মনেই হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো, হাসতে হাসতে বলে উঠলো মোহন,—ক'দিন থেকে ভয়ানক বিরক্ত

করছিলো, দিলুম সে দিন ফটুকে মদ একবোতল খাওয়াই, বলি খা শালী—খেয়ে লে, মেয়েটা ভারি ছ্যাঁচড় কি না। কিন্তু তাই বলে—তোর কিরে দুলালী, আরে ছি ছি ছি ছি—ও সব লচ্ছার মেয়ের ফাঁদে কখনো পা বাড়াতে আছে!

কথাগুলো খুব হালকা ভাবেই বলে গেল মোহন, দুলালী কিন্তু শুনে মোটেই খুশী হলো না। সুন্দরা বাউরিনের সঙ্গে মোহনের যে খানিকটা মেলা মেশা হয়েছে নিজেই সে কথা স্বীকার করলে মোহন, তাছাড়া গাঁটের কড়ি খরচা ক'রে খামোকা কেউ কাউকে মদ খাওয়ায় না, বিশেষতঃ সুন্দরার মত নামদাগা একটা বজ্জাত মেয়েকে। কে জানে, সুন্দরার ধাওড়ায় সে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করে কিনা। করে বৈকি, পাচজনে ওদের কথা নিয়ে যখন কানাকানি সুরু করেছে, তখন অন্ততঃ কিছুটা সত্যি এর মধ্যে আছেই।

সর্ব্বাঙ্গ রি রি ক'রে উঠলো দুলালীর, ভিতরটা তার গুর গুর করছে। মোহনের দিকে ফিরেও সে আর তাকালো না, কোলের মেয়েটাকে ধপ্ ক'রে একপাশে বসিয়ে দিয়ে শিল নোড়া নিয়ে বারান্দার একপাশে মশলা পিষতে বসলো। ধাওড়ার মধ্যে একটা মাচুলির উপর নতুন শাড়ীখানা একধারে রেখে দিলে মোহন। আজ তার হপ্তার দিন, টাকা পয়সা কতকগুলো পাওয়া গেছে, গেঁজেটা সে কোমর থেকে খুলে নামিয়ে দিলে শাড়ীখানার উপর। রোজগার নেহাত মন্দ করে না মোহন, খাটুয়ে লোক সে, টব ঠিকায় সে কয়লা কেটে উপার্জ্জন করে হাজরির প্রায় দেড়া। এ হপ্তায় রথ পরবের বকশিশ বলে আরও কিছু পাওনা হয়েছে। মনটা ইস্তক খুশীই ছিলো মোহনের, কিন্তু দুলালীর ভাবগতিক দেখে হঠাৎ সে একটু দমে গেল। বাইরে কিন্তু সে ভাবটা প্রকাশ করলে না মোহন, জোর ক'রে মুখে খানিকটা হাসি টেনে বললে,—রথ দেখতে যাবি

নাকি কাল ঝরিয়ার ডাঙ্গা ? সেই জন্যেই ত নতুন শাড়ী একখানা কিনে ফেললুম।

দুলালীর তরফ থেকে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না, নিজের মনেই বলে চললো মোহন,—মেলা যা জমে দুলালী ঝরিয়ায় ডাঙ্গায়, ভয়ানক জবর মেলা। হিন্দোলায় চাপবি নাকি একবার ? দিব তোদের মা বিটিকে নাগর দোলায় পাক কতক ঘুরাঁই,—কি বল্ ?

এই বসে আর একবার নিজের মনেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো মোহন। দুলালী কোন সাড়া দিলে না, আড় চোখে শুধু তাকালে একবার মোহনের দিকে। রথের মেলায় হিন্দোলায় চড়ে' আসমানে ঘোরার আনন্দ দুলালীর কল্পনায় কতখানা প্রভাব বিস্তার করেছে, বাইরে তার ভাবগতিক দেখে কিছুমাত্র বোঝা গেল না। মোহন বললে,—চানটা ঝাঁ ক'রে সেরে আসি আমি, তুই ততক্ষণ ঠাঁই কর।

অন্ধকার হয়ে আসছে। রান্নাটা কোন রকমে শেষ ক'রে দুলালী একটা লম্ফ ধরিয়ে নিলে। ঘর দোরে সারাদিন আজ ঝাঁট পড়েনি, বারান্দায় একরাশ ধূলো জমে আছে! মেয়েটাকে আজ তেল মাখাতে, কাজল পরাতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছে দুলালী, মনে তার এতটুকু সুখ নাই। থেকে থেকে তার কেবলই আজ মনে হচ্ছে মোহন আর সুন্দরার কথা। ভাবতে ভাবতে ক্রমাগত মন তার বিষিয়ে উঠছে, মোহনকে হয়ত আর বিশ্বাস করা চলে না। কেন এই কয়লা খনির দেশে দুলালীকে নিয়ে এলো মোহন। এখানকার লোকের হাবভাব চালচলন দুলালীর ভাল লাগে না, এর চেয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ক্ষেতে খামারে বেওরা খাটা যে ঢের ভাল ছিলো।

কলতলায় চান ক'রে মোহন এসে খেতে বসলো। ভাতের থালাটা মোহনের সামনে এগিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে একপাশে সরে

বসলো দুলালী, মনটা তার ভারি হয়ে আছে। মোহন খেতে বসবার সময় লক্ষ্য করলে নতুন শাড়ীখানা মাচুলির উপর থেকে এ পর্য্যন্ত তুলে রাখা হয় নি, মোহনের গেঁজেটাও মাচুলির উপর পড়ে আছে যেমনকার তেমনি। এই থমথমে ভাবটা বেশ ভাল লাগছিলো না মোহনের, অথচ করবার তার কিছু নাই। মোহন জানে দুলালীর অভিমানটা বরাবরই কিছু বেশি, তাই তার ছোট খাটো আবদার অনুযোগ কোন দিনই সে গায়ে মাখে না। আজ কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো মোহনের, কি এমন ব্যাপার যা নিয়ে আজ এতখানা মাথা ঘামাবার দরকার হয়ে পড়েছে দুলালীর। মোহন আর কথা বাড়ালে না, চুপচাপ সে খেতে বসে গেল। দুলালীর মেয়েটা মোহনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে সাড়া দিয়ে উঠলো দুলালীর কোল থেকে। মেয়েটা এসে পাশে না বসলে খেয়ে মোহনের তৃপ্তি হয় না, নিজের হাতে রোজ সুকুরমনিকে খাইয়ে দেয় মোহন, গরম গরম ফ্যান ভাত খেতে মেয়েটার কি তৃপ্তি। আজ কিন্তু ওকে ইচ্ছে ক'রে আটকে রাখা হয়েছে। মনে মনে একটু হাসলো মোহন, হাসতে হাসতে সে ডাক দিলে,—ঝিটি!

খুশির আতিশয্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো মেয়েটা, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সে দুলালীর কোল থেকে নীচে নামতে চায়। দুলালী তাকে জোর ক'রে চেপে ধরে হঠাৎ একটা ধমক দিয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না জুড়ে দিলে মেয়েটা। মোহন সবেমাত্র দু' এক গ্রাস খেতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু সুকুরমনি তার সঙ্গে না খেলে মোহনের ভাল ক'রে খাওয়াই হয় না। দুলালীর এই অকারণ ধমকটা মোটেই ভাল লাগলো না মোহনের, একটু বিরক্তভাবে সে বলে উঠলো,—আসতে চাচ্ছে—দে না মেয়েটাকে ছেড়ে।

দুলালী একট জোর গলায় জবাব দিলে,—নাই ছাড়বো।

মোহন বললে,—খুব ছাড়বি, খাবার সময় কি ধরে রাখতে আছে!

এই বলে সে খেতে খেতে সুকুরমনির দিকে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলে। মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে দুলালীর কোল থেকে হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে এলো মোহনের দিকে, দুলালী ঠাস ক'রে একটা চড় কষে দিলে মেয়েটার পিঠে।

মোহনের কিন্তু এবার অসহ্য হয়ে উঠলো। একটু কড়াভাবে বলে উঠলো মোহন,—খবরদার, মেয়ের গায়ে হাত তুলিস না বলছি।

দুলালী ফোঁস ক'রে উঠলো, বললে,—খুব করবো, আমার খুশি।

মোহন একটু জোর গলায় বললে,—না—মেয়ের গায়ে আমি হাত দিতে দিব না; এমনধারা বাড়াবাড়ি করবি ত ঘর দোর ছেড়ে চলে যাব আমি; বুঝবি তখন মজাটা।

দুলালী একটু জোর দিয়ে বললে,—তাই যা না, যাবার ত তোর জায়গার অভাব নাই, ঢের জায়গা পড়ে আছে।

ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—আছেই ত, আর সেই জায়গাতেই যাব আমি, দেখি তুই কি করতে পারিস!

মোহনের আর খাওয়া হলো না, তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়লো খাবারের থালা ছেড়ে। এই সব কেলেঙ্কারির মাঝখানে মানুষ কখনো বাস করতে পারে! মরুকগে সব ধাওড়ায় পড়ে পড়ে, মোহন কারো পরোয়া করে না, যেখানে তার খুশি সেইখানেই চলে যাবে মোহন।

দুলালী বললে,—সেইখানেই যেন তাদেরকে নিয়েই থাকিস, আমার ছামনে আর মুখ দেখাস না।

মোহন একঘটি জল নিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে গামছাটা ফেলে নিলে কাঁধে। টাকার গেঁজেটা সে মাচুলির উপর থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে নিলে কোমরে। গেঁজের মধ্যে টাকা পয়সাগুলো ঝম্ ঝম্ শব্দে একবার বেজে উঠলো। মুখখানা গোঁজ করে রাগে গিস্

গিস্ করতে করতে বেরিয়ে পড়লো মোহন। দুলালী খানিক এগি
গিয়ে পিছন দিক থেকে একটা ডাক দিয়ে বললে,—থাম্।

থমকে একটু দাঁড়ালো মোহন। নতুন কেনা ঝরণা-শাড়ীখ
তখনো তেমনি ভাবেই পড়ে আছে। দুলালী শাড়ীখানা মাচুলির উ
থেকে তুলে নিয়ে এসে মোহনের দিকে চেয়ে একটু চোখ তেড়ে ব
উঠলো,—আর ইটা, ইটা কার লেগে রেখে গেলি ইখানে?

হঠাৎ কোন জবাব দিলে না মোহন। দুলালী রাগে যেন ভে
পড়লো, শাড়ীখানা সে তালগোল পাকিয়ে মোহনের দিকে ছুঁড়ে মারে
বললে,—এটাও ওদেরকে দিয়ে দে'গা যা, না দিস ত আমার মাথা খাস

মোহন সঙ্গে সঙ্গে শাড়ীখানা কুড়িয়ে নিয়ে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে
বললে,—দিবই ত, আমার যাকে খুশি তাকে দিব; দেখি তুই কেম
ক'রে আটকাস।

বলতে বলতে হন্ হন্ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল মোহন
দুলালীর হাঁফ ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিলো, মেয়েটাকে কতকগুলো
ফ্যান ভাত খাইয়ে দিয়ে আলো নিবিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লো দুলালী
দাওয়ার উপর একটা তালাই পেতে।

রাত্রি ক্রমশঃ বেড়ে চললো, চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তালাইয়ের
উপর পড়ে পড়ে দুলালী খানিক কেঁদে নিলে আপন মনে। কিন্তু ফাঁকা
ধাওড়ায় একা থাকতে যে ভয় করছে দুলালীর। আশে পাশে অন্যান্য কুলি
কামিনদের ধাওড়া, ডাক দিলে অবশ্য সাড়া পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু
ডাক দেবে সে কাকে, কেনই বা তারা অকারণ ঘুম কামাই ক'রে দুলালীর
ধাওড়ায় এসে রাত জেগে বসে থাকবে। এ হয় না, মোহন যে আজ
দুলালীর উপর রাগ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে—এ কথা নিয়ে
পাড়াপড়শীর কাছে ঢাক পিটিয়ে লাভ নাই কোন। একটা রাত্তির মোহন

যদি নাও ফিরে, চোখ বুজে কোন রকমে কাটিয়ে দেবে দুলালী। না এসেই বা যাবে কোন্ চুলোয়, এ দিক ও দিক খানিক ঘোরাঘুরি ক'রে রাগ পড়লেই এক্ষুনি আবার ফিরে আসবে, দুলালীর তা ভাল রকমই জানা আছে। একটুখানি ভয় শুধু সুন্দরাকে, কিন্তু এত রাত্রে সুন্দরার ধাওড়ায় সত্যিই কি যেতে পারবে মোহন? সুন্দরার দায় পড়েছে দোর খুলে দিতে, মুখে ওর ঝাঁটা গুঁজে দেবে না। যাবার সময় ভাত দুটো পর্য্যন্ত মুখে দিয়ে গেল না, এ শুধু দুলালীকে জব্দ করবার মতলব। কিন্তু দুলালীও সহজে ছাড়বে না, মোহনের সম্বন্ধে গুজব যা রটেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে তাকে দুলালীর কাছে এর জন্য মাপ চাইতে হবে। অধঃপতন যদি ঘটেই থাকে মোহনের তা হলে তাকে যেমন ক'রে হোক আবার শুধরে নিতে হবে। মোহন ছাড়া দুলালীর যে আর কোন উপায় নাই, সমাজে ফিরে যাবার সকল পথ সে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে এসেছে নিজের হাতে, ইহ জীবনের মত। সে জন্য অবশ্য কোন আপসোস নাই দুলালীর, কিন্তু মোহন যদি কোন দিন তাকে অবহেলা করে, দুলালীর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মোহন যদি তাকে হেনস্তা ক'রে যায়, সে দুঃখু কিন্তু ইবে না দুলালীর। মোহনকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবার ভার দুলালীকে িতে হবে নিজের হাতে, হাল ছেড়ে দিলে সে কোন মতেই চলবে না।

দেখতে দেখতে রাত্তির অনেক হয়ে গেল, মোহন কিন্তু বাড়ী ফিরলো ।। দুলালী শুয়ে শুয়ে মোহনের কথাই ভাবছে। মাতাল মানুষ, ঘুরতে রতে হঠাৎ আবার মদ-দোকানে গিয়ে ঢুকে পড়লো নাকি! কিন্তু মদের াকান ত এত রাত্তির অবধি খোলা থাকে না, তা হলে সে গেল াথায়।

দুলালী চুপচাপ বিছানার উপর পড়ে আছে একধারে চোখ বুজে। । কিন্তু কোন মতেই আসতে চায় না, যত রাজ্যের ভাবনা এসে দুলালীর

মনটাকে যেন দোল খাওয়াতে লাগলো। আজ আবার নতুন ক'রে মনে পড়ছে তার প্রথম দিনের কথা, এমনি এক কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে যে দিন সে মোহনের হাত ধরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলো। তারপর কাজোড়ার কয়লা কুঠি, সে একটা স্মরণীয় দিন, ওই কুঠিতে কাজ করবার জন্য দুলালী সেই সর্ব্বপ্রথম মোহনের সঙ্গে ডুলি চড়ে খাদে নেমেছিলো। কাজোড়ার খাদে টবগাড়িতে কয়লা ভরতো দুলালী। কি ভীষণ সেই অন্ধকার পুরী, এতটুকু আলো নাই— এতটুকু হাওয়া নাই—চারিদিকে শুধু কালো পাথরের চাং আর জমাট বাঁধা অন্ধকার। দিন আর রাত ও দুটোই সমান কয়লা খাদের ভিতর, বাতি না হলে একটি পা কোন দিকে এগোবার উপায় নাই। গাঁইতি দিয়ে কয়লা কেটে কেটে সুড়ুং ক'রে যাচ্ছে মাল কাটার দল। একটা সুড়ুং থেকে অন্য দিকে বেরিয়ে গেছে আর একটা সুড়ুং, সেখান থেকে আর একটা, চারিদিকে শুধু সুড়ুং আর সুড়ুং, এর কোন্ দিকটা যে পূব আর কোন্ দিকটা যে পছি ঠাওর ক'রে যায় কার বাপের সাধ্যি। এর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে লাইন পাতা, চানক দিকে মুখ ক'রে হুড় হুড় শব্দে ছুটে চলেছে কয়লা বোঝাই গাড়ী। অন্ধকারে গাড়ীগুলো কিন্তু ওল্টায় না, আশ্চর্য্য! এমন গোলমেলে ব্যাপার জীবনে কখনো দেখে নাই দুলালী, এর আগে কয়লাখাদের নামটাই শুধু শোনা ছিলো তার, এখানে এসে খাদের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় তার প্রথম। গোড়ার দিক এ সব তার ভাল লাগতো না, উপর থেকে ডুলি বেয়ে নীচের দিকে নামতে বুকটা যেন ঢাই ঢাই করতো দুলালীর, খাদের মধ্যে কাজ করতে সে হাঁপিয়ে উঠতো। কয়লার গুঁড়ো আর বিদ্‌কুটে ধোঁয়ার গন্ধে নিশ্বাস নিতে দম যেন ওর বন্ধ হয়ে আসতো। থাকতে থাকতে আবার সয়ে গেছে সবই, শেষ পর্য্যন্ত দিন একরকম কেটে যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে শুধু বাড়ীর

কথা মনে হ'লে ভয়ানক মন খারাপ করতো দুলালীর, বুক ফেটে ওর কান্না পেতো ; মনে হতো দূর ছাই, কাজ নাই আর বিদেশে বিভূঁয়ে এমন ক'রে লুকিয়ে থেকে চোরের মত দিন কাটাতে। রামপুরের ডাঙ্গা, চির পরিচিত সেই সাঁওতাল পল্লী, সেখানকার নদী নালা বন জঙ্গল ফুল ফল আলো হাওয়া সব কিছু যেন দুলালীকে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো ; দুলালী যেন কানের কাছে শুনতে পেতো কান্নায় ভরা করুণ তাদের ডাক। সে ডাক তাকে বিভ্রান্ত করে তুলতো, সকল আগল ভেঙ্গে ফেলে দুলালীর মন যেন ছুটে যেতে চাইতো তার সেই কল্পনার বাস্তব রাজ্যে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল আবার ভেঙ্গে যেতো দুলালীর,—সে আর হয় না, সে দেশে যে ফিরে যাবার কোন পথ খোলা নাই। সে দেশের সমাজ আর কি তাদের ক্ষমা করবে? নিজের জন্য তত ভাবে না দুলালী, কিন্তু মোহন? মোহনকে কি ওরা সহজে ছাড়বে, বিশ্বাস হয় না দুলালীর। আর দুলালীই বা কেমন ক'রে দাঁড়াবে গিয়ে তার বাপ মায়ের সামনে। মোহনের সঙ্গে পালিয়ে এসে দুলালী যে কোন অপরাধ করে নি, পারবে কি দুলালী সে কথা আর পাঁচজনকে বোঝাতে? বুঝবে না, সে কথা কেউ বুঝবে না, সকলে মিলে ছি ছি করবে দুলালীকে দেখে। না—না—এ হয় না, দুলালীর আর ফিরে যাবার কোন উপায় নাই। দেশের কথা ভুলতে হবে দুলালীকে। কাজোড়ার কয়লা কুঠি, মন্দ কি, সুখে হোক দুঃখে হোক দিন একরকম কাটবেই, দিন যে কোন রকমে কাটাতেই হবে।

কাজোড়ার কয়লা কুঠির বসবাস কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হলো না। মাস তিনেক পরে রাবণ মাঝি দেশ থেকে খবর পেয়ে জন কতক লোক সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ একদিন কাজোড়ায় এসে হাজির। হাজরি বাবুর কাছে সংবাদ নিয়ে জানতে পারে এই কুঠিতেই মোহন মাঝি কাজ করে, একা

নয়, তাঁর মেঝেন সমেত। রাবণ তাদের দেশের লোক বলে পরিচয় দে হাজরি বাবুর কাছে, মোহনের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়, হাজরি বাবু নির্দ্দেশ মত খাদ মোয়ানে অপেক্ষা করে বসে আছে রাবণ মাঝি মোহন সে সময় খাদের নীচে কয়লা কাটছিলো, অপর একজ মালকাটার কাছ থেকে রাবণ মাঝির সংবাদটা সে জানতে পারে, খাদে নামবার মুখে হাজরি বাবুর সঙ্গে রাবণ মাঝির কথাবার্ত্তা সে শুনে এসেছে দুলালী সেদিন কাজে আসেনি মোহনের সঙ্গে। রাবণ মাঝির খবরট শুনে মোহন একটু ঘাবড়ে গেল, লোকজন সঙ্গে নিয়ে কাজোড়ার কুলি পর্য্যন্ত সে ধাওয়া করবে এতটা মোহন ভাবতে পারেনি। কিন্তু যেমন ক'রে হোক পালাতে হবে মোহনকে রাবণ মাঝির দৃষ্টি এড়িয়ে, ধরা দেওয়া কোন মতেই চলবে না। চানক দিয়ে উপরে উঠবার উপায় নাই, খাদ মোয়ানে ঠায় বসে আছে রাবণ মাঝি। পালাবার একটা মাত্র উপায় আছে, এক নম্বরের এই খাদ থেকে উত্তরমুখী ওই গ্যালারীটা বরাবর গিয়ে মিশে গেছে তিন নম্বর খাদের সঙ্গে, তিন নম্বরের পোড়ো একটা গ্যালারীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে উপরে উঠবার বহুকেলে একটা সিঁড়ি আছে ইট দিয়ে বাঁধানো। ও পথ দিয়ে আজকাল কেউ বড় একটা যাওয়া আসা করে না। এক নম্বর খাদ থেকে তিন নম্বরের ভিতর দিয়ে উপরে উঠবার পথটা একটু দূর পড়ে, মাইল খানেকের প্রায় কাছাকাছি। দুটো খাদের মাঝখানে আবার প্রকাণ্ড একটা নালা, আণ্ডার গ্রাউণ্ডের যত জল এক জায়গায় জমা হয়ে হুড় হুড় শব্দে বয়ে যাচ্ছে সেই নালা দিয়ে ছোট খাটো একটা নদীর আকারে, স্রোতের বেগটাও নেহাত্ কম নয়। তাতেও অবশ্য ভাববার এমন বিশেষ কোন কারণ ছিলো না মোহনের—রাস্তাটা যদি ভাল রকম জানা থাকতো। কিন্তু উপায় নাই, ওই পথ দিয়েই পালাতে হবে মোহনকে। মগবাতিটা হাতে ঝুলিয়ে পড়ো একটা গ্যালারির মধ্যে

দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো মোহন। কাজোড়ার কুঠি তাকে ছাড়তেই হবে, রাবণ মাঝি যখন সন্ধান পেয়েছে তখন এখানে আর একটি দিনও নয়। নিজের জন্য অবশ্য ভাবে না মোহন, কিন্তু সন্ধান পেলে হয়ত ওরা দুলালীকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবে। ধরা কিন্তু দেওয়া হবে না, পালাতে হবে দু'জনকেই,—যে দিক দিয়ে হোক আর যেমন করেই হোক।

কুলি কামিনদের পালি বদলের সময়। রাবণ মাঝি খাদ মোয়ানেই বসে আছে বহুক্ষণ ধরে। কত নতুন মালকাটা এসে ডুলি বেয়ে নীচে নেমে গেল, নীচের লোকগুলো কালি ঝুলি মেখে একে একে উঠে আসতে লাগলো উপরে। রাবণ মাঝি হাঁ করে চেয়ে আছে চানকের দিকে, এতক্ষণ ধরে ডুলিটার শুধু ওঠা নামাই সে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে, এদের মধ্যে কিন্তু মোহন বা দুলালী তার চোখে পড়লো না; রাবণ মাঝি ঘাঁটি আগলে বসে আছে ত আছেই।

মোহন এর আগেই তিন নম্বরের পড়ো গ্যালারি দিয়ে সোজা গিয়ে উঠেছে নিজের ধাওড়ায়। জিনিস পত্র গোছগাছ ক'রে দুলালীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে ধাওড়া থেকে বেরিয়ে পড়লো মোহন। পথে তারা এক মুহূর্ত বিশ্রাম পর্য্যন্ত করলে না কোন জায়গায়, বাঁ হাতি বড় রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে ডান হাতি জামুড়িয়ার সড়ক ধরে রাতারাতি গিয়ে উঠলো ওরা সোজা একেবারে চরণপুরের কুঠি। অন্য কোম্পানীর মুলুক এটা, গাদি জায়গা, এখান থেকে সহজে কাউকে খুঁজে বার করা—সে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভয়ানক কিন্তু ক্ষিদে পেয়ে গেছে মোহনের, যাহোক দুটো খেতে হবে কিছু। প্রকাণ্ড একটা বটগাছের নীচে কোম্পানীর জলের কল, কলের জলে বেশ ক'রে মুখ হাত ধুয়ে পোঁটলা থেকে জামবাটি বের ক'রে কলতলায় তারা চিঁড়ে ভিজোতে বসলো। রাত তখন আর বেশি নাই, পুব দিকে 'ভুলকো তারা' উঁকি মারছে।

* * * * *

কাজোড়ার কুঠি থেকে চরণপুরের খাদে। সেও একরকম কে বাচ্ছিলো ভালই, কাজকর্মের কোন অসুবিধা ছিলো না। খাদে নীচে এখানে বিজলিবাতি, অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে মরতে হয় না, ফু ফুর ক'রে মাটির নীচে হাওয়া খেলে চমৎকার। সুড়ুংএর ভিতর দিয়ে পাম্পকলে হাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থাটা এদের ভাল। খাদের নীচে কাজ করতে করতে ট্রামলাইনের পাশে ঝোড়ার উপর মাথা রেখে কতদিন ঘুমিয়ে পড়েছে দুলালী, ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায়। কাজকর্মের বিধিব্যবস্থা সব কিছুই এখানে ভাল, দোষের মধ্যে কলিয়ারির ছোট সাহেব লোকটা একটু পাজী। খট্‌ খট্‌ শব্দে বুট জুতোর আওয়াজ করতে করতে যখন তখন সে খাদের নীচে ঘুরে বেড়ায়, কাজে কারো এতটুকু ত্রুটি হবার উপায় নাই; ষোল আনা কোম্পানীর কাজ বজায় ক'রেও টমাস সাহেবের মন পায়নি কেউ কোন দিনই। কোম্পানীর কর্মচারীরা টমাসের ভয়ে তটস্থ, মুখে তার ড্যাম রাস্কেল চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই আছে। এক নম্বর পাঁড় মাতাল এই টমাস সাহেব, হুইস্কির বোতল সব সময় তার পকেটে পকেটে ঘোরে, অতিরিক্ত মদ খেয়ে খেয়ে মেজাজটা সে একেবারে বিগড়ে ফেলেছে। একমাত্র বড় সাহেব ছাড়া ভাল কথা সে কারো সঙ্গেই কয় না, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ; কথাবার্তা বা ব্যবহারে ভদ্রতা বা শিষ্টাচারের কিছুমাত্র ধার ধারে না টমাস। ওরি মধ্যে কতকটা সে সংযত হয়ে চলে কুলিকামিনদের সঙ্গে, কারণ টমাস সাহেব জানে কুলিকামিন না হলে কলিয়ারি অচল। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোকের অভাব নাই দেশে, যৎসামান্য মাইনে দিলেই চেয়ার টেবিলে বসে কলম পিষবার লোক ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু কুলিকামিন বিগড়ে

গেলে তাদের ঠাঁই পূরণ করতে বেগ পেতে হয়, মালকাটারা/কেউই টমাস সাহেব কিছুটা বোঝে। কিন্তু আসল কাজে ঠিক আছে টমাস, মালকাটাদের 'পিলার রবিং'—মানে চুরি ক'রে কয়লা কাটা—একেবারে সংযত ক'রে ফেলেছে টমাস সাহেব কিছু দিনের মধ্যেই। আলগা চাঙড় থেকে চুরি ক'রে কয়লা ধ্বসিয়ে কম সময়ের মধ্যে যে কেউ গাড়ী বোঝাই দিয়ে দেবে, টমাস সাহেবের কাছে সে জো-টি নাই। নিষিদ্ধ অংশের সীমা ধরে পিলারের উপর খড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে দাগ কাটা আছে, দাগের ওপাশে গাঁইতি চালানো নিষিদ্ধ। মালকাটারা অবশ্য এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে পিলার রবিং করে, কিন্তু খুব সাবধানে, কারণ ধরা পড়লে টমাস সাহেবের দাঁত খিঁচুনি এবং ড্যাম রাস্কেল অবশ্যম্ভাবী। মজুরির পয়সা থেকে এর জন্য অনেক সময় জরিমানা পর্যন্ত দিতে হয়েছে অনেককেই। এই নিয়ে সেদিন টমাস সাহেবের সঙ্গে বেশ খানিকটা বচসা হয়ে গেছে মোহন মাঝির। কিন্তু মোহনের চুরি ক'রে কয়লা কাটা প্রমান করতে পারেনি টমাস সাহেব, তাই সাহেবের চোখরাঙানি গ্রাহ্য করে নি মোহন, বরং তার মুখের উপর বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে মোহনের উপর সাহেব একটু চটা। মনে মনে এঁচে নিয়েছে মোহন মাঝি—চরণপুরের দানাপানি হয়ত তার আর বেশি দিন নয়, সাহেব যে রকম বদমেজাজী তাতে কোন্ দিন না সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি হয়।

টমাস সাহেব কিন্তু অদ্ভুত লোক। কয়েক দিনের মধ্যেই একটু একটু করে হঠাৎ তার সুরটা যেন পাল্টে গেল, অহেতুক মোহনের উপর ক্রমশই যেন প্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগলো টমাস। সাহেবের মেজাজ এখন দরাজ, যে গ্যালারিতে মোহন কয়লা কাটে সেই

গ্যালারি দিয়ে এক চক্কর ঘুরে যেতে কোনদিনই ভুল হয় না টমাস সাহেবের। সাহেব এসে কাছে দাঁড়াতেই কপালে হাত ঠেকিয়ে মোহন বলে,—সালাম হুজুর! খুশী হয়ে বলে উঠে সাহেব,—সালাম—সালাম। দুলালী একপাশে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে, হয়ত বা সাহেবের সেলাম করা দেখে। টমাস সাহেব দুলালীর মুখের উপর টর্চবাতির এক ঝলক আলো ফেলে দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যায় অন্য গ্যালারির দিকে। সাহেব খানিকটা এগিয়ে গেলে হো হো করে হেসে উঠে দুলালী আর মোহন দু'জনেই। ঘর্ ঘর্ শব্দে কয়লা বোঝাই ট্রাম গাড়ী গুলো নীচের দিক থেকে উজান বেয়ে ছুটে চলে চানকের দিকে। মোহন আর দুলালী এই ফাঁকে দু' একটান শালপাতার চুটি টেনে নিয়ে চটপট আবার কাজে লেগে যায়।

টমাস সাহেব লোকটা যে বেশ সুবিধের নয় তা সকলেই জানে। কথায় কথায় যার তার সে অপমান ক'রে বসে যখন তখন। এর জন্য টমাস সাহেবকেও রীতিমত অপমানিত হতে হয় মাঝে মাঝে। কলিয়ারির মালকাটাদের হাতেই মার খেতে খেতে বেঁচে গেছে সে কয়েক বারই। টমাস সাহেব কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না ওসব, আত্মসম্মান বা প্রেষ্টিজের কিছুমাত্র যে পরোয়া রাখে টমাস সাহেব, এ অপবাদ সহজে কেউ দিতে পারবে না।

টমাস সাহেবের হাতে বাছা বাছা জন কয়েক কুলিকামিন আছে, সাহেবের খুব পিয়ারের নোকর। কাজ তাদের এমন কিছু করতে হয় না, গোপনে গোপনে সাহেবের পছন্দসই কমবয়সী মেয়েদের টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসাই তাদের একমাত্র কাজ। সাধারণত কলিয়ারির কামিনদের মধ্যে থেকেই

সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা হয় এই সব মেয়ে মানুষদের। কেউ বা আসে ইচ্ছে করেই, কেউ কেউ বা টাকাপয়সার লোভে, কোন কোন ক্ষেত্রে এক আধটু বলপ্রয়োগের দরকার হলেও টমাস সাহেবের আটকায় না তাতেও। টমাস সাহেবের শ্যেনদৃষ্টি যে মেয়ের উপর পড়েছে একবার, যেমন ক'রে হোক তাকে না ফাঁসিয়ে সহজে টমাস হাল ছাড়ে না। এ সব কাজে ডান হাত তার ভোঁদার মা, বহুদিনের পুরানো একটা বাউরী কামিন, টমাস সাহেবের ঢের আগে থেকেই এ খাদে সে কাজ করছে। সাহেবের দৌলতে রাজার হাল এই ভোঁদার মায়ের, এ পর্যান্ত বহু মেয়ে মানুষ সে যোগাড় ক'রে দিয়েছে টমাস সাহেবকে। বাউরী বাগ্দী দোসাদ কোঁড়া কোন কিছুতেই অরুচি নাই টমাস সাহেবের, বয়সটা একটু কাঁচা হলেই হলো; তার উপর যদি চেহারায় একটু চেকনাই থাকে তাহলে ত আর কথাই নাই। মদ আর মেয়েমানুষের নেশায় চব্বিশ ঘণ্টা মশগুল হয়ে থাকে টমাস সাহেব, এর জন্য সে খরচাও করে যথেষ্ট।

কাজোড়ার খাদ থেকে রাতারাতি পালিয়ে আসবার পর মোহন আর দুলালীর কয়েকটা দিন কেটেছে খুব অস্বস্তিতে। রাবণ মাঝি বা তার সঙ্গের লোকগুলো তাদের খোঁজ করতে করতে কোন্‌দিন যে হঠাৎ চরনপুরে এসেই হাজির হবেনা তাই বা কে জোর ক'রে বলতে পারে। মাস খানেক নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে যাওয়ার পর সে ভয় কিছুটা ভেঙ্গেছে, আসবার হলে এর মধ্যে হয় ত এসে পড়তো। কাজোড়ায় তাদের ধরতে না পেরে হয়ত ওরা আরও দু' একদিন এখান ওখান খোঁজ খবর ক'রে চুপচাপ আবার দেশে ফিরে গেছে, ফিরে গেছে নিশ্চয়ই, তা ছাড়া আর উপায় কি তাদের; খাদ তরফে হঠাৎ কাউকে খুঁজে বের করা সহজ কথা নয়। মোহন আর দুলালী নিশ্চিন্তে

আবার কাজকর্ম্ম সুরু ক'রে দিয়েছে। গায়ে গতরে খেটে খুটে রোজগার তারা মন্দ করে না, দিন বেশ সচ্ছন্দেই কেটে যায় তাদের। চরণপুরের ধাওড়াগুলোও ভাল, বাস ক'রে আরাম আছে। সারাদিন কাজকর্ম্মের পর সন্ধ্যাবেলা ধাওড়ায় বসে বসে অড়বাঁশী নিয়ে আলাপ করে মোহন। সম্প্রতি একটা মাদলও সে জামুড়িয়ার হাট থেকে খরিদ ক'রে এনেছে। সাঁওতাল কুলিকামিনদের গানবাজনার জলসা বসে মাঝে মাঝে, মোহন গিয়ে তাদের দলে ভিড়ে গেছে। দুলালীকেও এক একদিন গিয়ে নাচতে হয় অন্যান্য মেঝেনদের সঙ্গে। সাঁওতাল জাত, যেখানেই ওরা থাক নাচগানের ব্যবস্থা ওদের চাই-ই। দুলালীকে নতুন নতুন গান শেখাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে মোহন, ছাতাপরবের মেলা আসছে সামনে, ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন; ছিরিপুরের হাটতলায় সাঁওতালদের জবর মেলা, নাচগানের হুল্লোড় পড়ে যাবে সারা মেলা জুড়ে। মোহন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এর মধ্যে নতুন ক'রে বাজনাগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিতে হবে, ধাওড়ায় বসে বসে নিজের মনেই হরদম সে চাঁটি লাগায় মাদলে, একটানা মহড়া তার চলছে ত চলছেই,—দিং দাহাতাং—দিং দাহাতাং—দাঁতিড় হিতাং দিং দাহাতাং।

দুলালী কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠে। কিন্তু বিরক্ত হলেই বা উপায় কি, ছাতাপরবের মেলা যে প্রায় এসে পড়লো; বাজনার উপর সমান তালে হাত চলতে থাকে মোহনের,—দিং দাহাতাং—দাঁতিড় হিতাং—কেড়্ কেড়্ কেড়্—দিং দাহাতাং দাঁতিড় হিতাং—কেড়্ কেড়্ কেড়্।

চরণপুর কলিয়ারির দল ছাতাপরবের মেলায় যাবে নাচগান করতে, তারি তোড়জোড় নিয়ে ব্যস্ত আছে মোহন। দুলালীর মনটা কিন্তু

ভাল নাই আজ ক'দিন থেকে। ভোঁদার মা, ছোট সাহেবের সেই বাউরী কামিনটা মাঝে মাঝে যাওয়া আসা সুরু করেছে ডুলালীর ধাওড়ায়, সাহেবের নজর পড়েছে ডুলালীর উপর। ভোঁদার মাকে প্রথম দিনই গোটা কয়েক চোখা চোখা কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে ডুলালী। কিন্তু সহজে সে হাল ছাড়বার মেয়ে নয়, বারে বারে যখন তখন এসে রীতিমত বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে সে ডুলালীকে, পথে ঘাটে দেখা হলেই সাহেবের নাম ক'রে ডুলালীকে সে নানারকম প্রলোভন দেখায়। সাহেবের বাংলায় একদিন যেতে হবে ডুলালীকে, সাহেব নাকি এর জন্য মোটা টাকা বকশিশ করতে রাজি। কি আশ্চর্য্য, টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে এরা মেয়ে মানুষের ধর্ম্মনষ্ট করতে চায়; এরা মানুষ, না আর কিছু! ভোঁদার মা বলে এতে নাকি দোষ নাই, কলিয়ারির কামিনদের মধ্যে রেওয়াজটা একেবারে নতুন নয়, এও নাকি একটা রোজগারের পন্থা, কিন্তু ডুললী ত সে জাতের মেয়ে নয়, টাকা পয়সার লোভে এ কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। মেয়ে মানুষের ধরমটি সে খোয়াতে পারবে না, জান গেলেও না। ভোঁদার মাকে সে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলো প্রথম দিনই, মাগীটা কিন্তু এক নম্বর ছ্যাঁচড়, এখনো সে হাল ছাড়েনি। সাহেবের নাকি ভাল লেগেছে ডুলালীকে দেখে, এটা নাকি ডুলালীর পক্ষে বিশেষ একটা সৌভাগ্যের কথা; ইচ্ছে করলে সে বরাত ফিরিয়ে নিতে পারে এই সুযোগে। বাউরী বুড়ীর কথা শুনে সারা মন বিষিয়ে উঠে ডুলালীর, সর্ব্বাঙ্গে তার জ্বালা ধরে যায়। এরা সব কি ধরণের লোক, খাদ তরফের চাল চলনই এই রকম। এ দেশটা যে ভাল নয় ডুলালী তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে, কিন্তু উপায় কি। মোহনকে বলে কয়ে এখানকার কাজকর্ম্মে ইস্তফা দিয়ে অপর কোথাও চলে যাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য করা যেতে পারে, কিন্তু মোহনের কাছে

ঘৃণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ করেনি দুলালী। মোহন যে রকম রাগী মানুষ তাতে ছোট সাহেবের কথাগুলো শুনলে হয়ত সে তাকে কাঁড়বেন্দুক নিয়ে খুন করতেই ছুটবে।

খাদের পশ্চিম দিক থেকে পিলার কাটিং এর কাজ আরম্ভ হবে। বাছা বাছা মালকাটাদের ডাক পড়েছে পিলার কাটিং এর কাজে। মোহন মাঝি পাকা লোক, তাকেও এর মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, মোহনকে এর জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলো ছোট সাহেব নিজে। কাজটাত একটু ঝঞ্ঝাট আছে, কিন্তু মালকাটাদের মজুরি দেওয়া হয় ভাল, তার উপর কোম্পানী থেকে বকশিশের ব্যবস্থা করা হবে ভাল রকম, ছোট সাহেব নিজে বলেছে। মোহন এতে খুশী আছে খুবই, যেমন ক'রে হোক রোজগার নিয়ে কথা। পিলার কাটিং এর সময় বরাবর তাকে রাত পালিতে কাজ করতে হবে, এই যা একটু অসুবিধা। ছোট সাহেবকে জানিয়েছিলো মোহন দিন পালিতে কাজ করতে পেলেই তার সুবিধা হয়, কিন্তু সাহেব তাতে রাজি হয়নি, কারণ কোম্পানীর সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হবে আগে। মোহন অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত আর আপত্তি করেনি, রাতপালি সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। দুলালীকে ধাওড়ায় একা থাকতে হবে সারাটা রাত, এই যা একটু ভাববার কথা। কিন্তু এত খানা ভাবতে গেলে কোম্পানীর কাজ করা চলে না, তা ছাড়া ধাওড়ার আশে পাশে চারিদিকেই চেনা লোক, ভাববার কোন কারণ নাই। পিলার কাটিং এর কাজে মজুরি কিছু বেশি পাওয়া যায়, মোহনকে সে না চাইতেই ডাকা হয়েছে এ একরকম ছোট সাহেবের অনুগ্রহ বলতে হবে। কিছুদিন কাজ করতে পেলে বেশ দু'পয়সা জমিয়ে ফেলবে মোহন। ছোট সাহেব লোকটা বিশেষ খারাপ বলে মনে হয় না মোহনের, আজকাল তার মোহনের সঙ্গে ব্যবহার খুব

ভাল। লোকে বলে সাহেবের নাকি চরিত্তির বেশ ভাল না, মোহন কিন্তু বিশ্বাস করে না এ সব কথা; সাহেব লোক, তাও কখনো হয়!

কোম্পানীর কাজকর্ম্ম সেরে সন্ধ্যার ঠিক আগে ধাওড়ায় গিয়ে পৌছলো মোহন। একটা বুড়ী কামিনের সঙ্গে দুলালীর তখন কি নিয়ে যেন বচসা চলছে। দূর থেকে কানে এলো মোহনের—দুলালী বলছে,—না—না—সেটি হবেক নাই, বেরো তুই এখান থেকে। ফিস্ ফিস্ ক'রে কামিনটাও কি বলে যাচ্ছে দুলালীকে, দুলালী শুধু ঘাড় নেড়ে বলছে,—না—না—না। মোহন একটু ধাঁধাঁয় পড়লো, ধাওড়ার বাইরে একটা দেওয়ালের আড়ে থমকে একটু দাঁড়ালো মোহন, কান পেতে ওদের কথাবার্ত্তা গুলো শুনবার সে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু দূর থেকে আর বিশেষ কিছু শোনা গেল না। খানিক পরেই বুড়ীটা মোহনের ধাওড়া থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, মোহনকে ও লক্ষ্য করলে না। বুড়ী খানিকটা এগিয়ে গেলে মোহন এসে বাড়ী ঢুকলো। দুলালীর মুখ খানা আজ যেন একটু গম্ভীর বলে মনে হলো মোহনের, মোহন এর কারণ কিছু বুঝতে পারলে না। কয়লাকাটা গাঁইতিটা ধাওড়ার একপাশে নামিয়ে রেখে দুলালীকে জিজ্ঞাসা করলে মোহন,—কে ও বুড়ীটা?

মোহনের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে খানিক তাকালো দুলালী, মুচকে একটু হাসলে সে নিজের মনেই, তারপর সে জবাব দিলে,—ও পাড়ার বাউরী কামিনরা।

এর বেশি আর ভাঙ্গলে না দুলালী। মোহনের একটু কেমন কেমন লাগলো; কাছাকাছি ধাওড়ার সাঁওতাল কামিনরা মাঝে মাঝে অবশ্য বেড়াতে আসে মোহনের আড্ডায়, কিন্তু ও বাউরী বুড়ীকে এর

আগে এ ধাওড়ায় দেখা যায়নি। মোহন আবার জিজ্ঞাসা করলে,—কি জন্যে এসেছিলো বুড়ী ?

দুলালী সহজ সুরে জবাব দিলে,—এমনি বেড়াতে।

মোহনের কিন্তু কথাটা বেশ কানে ধরলো না, ভিন্‌পাড়ার বাউরি কামিনরা মোহনের ধাওড়ায় হঠাৎ বেড়াতে আসে কেন ? বুড়ীর সঙ্গে দুলালীর কথাবার্ত্তা গুলোও মোহনের যেন কেমন একটু গোলমেলে মনে হতে লাগলো; নিজের কানে শুনেছে মোহন, দুলালী বলছে,—না—না—বেরো তুই এখান থেকে। কথাটা ত বেশ ভাল নয়, এর মধ্যে ব্যাপার যে একটা কিছু আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুলালীকে ধরে বসলো মোহন কি নিয়ে তার বুড়ীর সঙ্গে বচসা হচ্ছিলো মোহনের কাছে খুলে বলতে। দুলালী শুধু হাসতে লাগলো, খুলে কিছুই বললে না। একটা কানা উঁচু পিতলের থালা ক'রে কতকগুলো মুড়ি আর কয়েকখানা গুড়পিঠে এনে মোহনের জলখাবার ঠাঁই করে দিলে দুলালী, রান্না হতে এখনো দেরি আছে। খাওয়া দাওয়ার দিকে মোহনের কিন্তু লক্ষ্য নাই মোটেই, ব্যাপার যে একটা কিছু ঘটেছে দুলালীর মুখচোখ দেখে স্পষ্টই তা বুঝতে পারা যায়। দুলালীর ডান হাতটা হঠাৎ চেপে ধরলে মোহন, বললে,—আমার কাছে তুই লুকাচ্ছিস দুলালী, কি হয়েছে খুলে বল্ দেখি। দুলালী ধীরে ধীরে বসে পড়লো মোহনের পাশে, মুখখানা তার অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠেছে, হঠাৎ তার চোখ দুটো যেন ছল্ ছল্ করে উঠলো, ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো দুলালী,—এখান থেকে পালিয়ে চল্ মোহন, চরণপুরে আর আমাদের থাকা চলবে না।

দুলালীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল মোহন, এর কারণ সে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলে না। মোহনের কাছে সব কথাই শেষ

পর্য্যন্ত খুলে বললে দুলালী,—ছোটসাহেবের কুনজর পড়েছে দুলালীর উপর, ঘন ঘন সে লোক পাঠাচ্ছে দুলালীর কাছে ; যে বাউরী বুড়ীটা একটু আগে বেড়াতে এসেছিলো—ছোট সাহেবের সে চর। আজও সে বিশেষ অনুরোধ ক'রে গেছে দুলালীকে, সাহেবের কাছে একদিন তাকে যেতেই হবে। দুলালীর যদি একান্তই আপত্তি থাকে সাহেবের বাংলায় যেতে, ছোট সাহেব নিজে এসে দেখা করতে রাজি আছে দুলালীর সঙ্গে, যে কোন দিন রাত্তির বেলা। কামিনটাকে অবশ্য যথেষ্ট অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে দুলালী, কিন্তু তবু সে একেবারে হাল ছাড়েনি, আর একদিন আসবে বলে গেছে দুলালীর শেষ কথা জানতে।

দুলালীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল মোহন, মুখচোখ তার লাল হয়ে উঠলো। ছোট সাহেবের মত পাজী লোক কেন যে আজকাল মোহনের সঙ্গে এতটা খাতির রেখে চলে মোহন যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছে এখন। খাদের নীচে দুলালীর দিকে মাঝে মাঝে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে টমাস সাহেব—তাও মোহন লক্ষ্য করেছে, কিন্তু সাহেবের মতলব যে অন্যরকম মোহন সেটা এতদিন ঠিক বুঝতে পারেনি। দিনপালি থেকে সরিয়ে পিলার কাটিংএ রাতপালিতে কাজ দেওয়া হয়েছে মোহনকে, ছোট সাহেবের ব্যবস্থা। মোহনকে সে ইচ্ছে করেই রাত্তির বেলা ধাওড়া থেকে দূরে রাখতে চায়, ফাঁকা ধাওড়ায় মোহন মাঝির বৌটাকে নিয়ে বেশ জমবে ভাল। ওরে শালা টমাস সাহেব, তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি! কিন্তু মোহন মাঝিও সোজা লোক নয়, একহাত তোমাকে না দেখে আর ছাড়বে না সে কোন মতেই।

মোহনের সর্ব্বাঙ্গ গুরগুর করতে লাগলো রাগে। খাবারের

থালাটা সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে দুলালীর দিকে চেয়ে বলে উঠলো মোহন,—মদের ভাঁড়টা একবার নিয়ে আয় দেখি।

দুলালী বললে,—এখান থেকে পালাতে হবে আমাদের,—আজই কোথাও বেরিয়ে পড়ি চল্, আজ রাত্রেই।

মোহন বললে,—চুপ—মদ খেয়ে খানিক নেশা করি আগে, তারপর শালা টমাস সাহেবকে আমি দেখছি। বেউড় বাঁশের লাঠিটা আমার ঠিক আছে ত?

দুলালী কিন্তু চায় না এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বাইরে একটা জানাজানি করতে, তার চেয়ে চুপচাপ সরে পড়াই ভাল। মোহন কিন্তু এত সহজে টমাস সাহেবকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়, শিক্ষা তাকে একটু দিতে হবে যেমন ক'রে হোক, তার জন্য জান কবুল মোহনের।

চোঁ চোঁ ক'রে মদের ভাঁড়টা প্রায় খালি ক'রে ফেললে মোহন। আজ একটু জমাট নেশা দরকার, উগ্র বাখরের গুঁড়ো মশলা প্রায় ডবল মাত্রায় মিশিয়ে দিয়েছে মোহন নিজের হাতে সাঁজন দেওয়া তার পচুই মদের সঙ্গে। মোহনের এই নেশা করা দেখে দুলালী একটু ভয় পেয়ে গেল, অতিরিক্ত মাতাল হয়ে পড়লে সহজে তাকে সামলানো কঠিন। বার দুই তিন চেষ্টা করলে দুলালী মোহনের হাত থেকে মদের ভাঁড়টা কেড়ে নিতে, কিন্তু দুলালীর কোন কথাই শুনলে না মোহন, চোঁ চোঁ শব্দে ভাঁড়টা সে একেবারে খালি ক'রে দিলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেশায় একেবারে টোর হয়ে উঠলো মোহন। টলতে টলতে সে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—বাইরে একটু ঘুরে আসি আমি, দেখি শালা টমাস সাহেব কি করছে।

দুলালী বাধা দিয়ে বললে,—না—সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি তুই করতে পাবি না, আজ আর তোকে বেরুতে দিব না আমি এ অবস্থায়।

মোহন টলতে টলতে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে খাটো মত বাঁশের একটা লাঠি যোগাড় ক'রে নিলে। দুলালী ধাওড়ার দরজায় খিল এঁটে দিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ালো। মোহন বললে,—পথ ছাড়, দোর খুলে দে।

দুলালী কিন্তু পথ আগলে সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলো, বললে,—পথ আমি নাই ছাড়বো।

মোহন একটু জোরগলায় বললে,—ছাড়বি না?

দুলালীও একটু উগ্রভাবে জবাব দিলে,—না ছাড়বো না, ছেড়ে এমনি দিলেই হলো নাকি।

মোহনের হাত ধরে তাকে জোর করে একটা খাটিয়ার উপর বসিয়ে দিলে দুলালী, বললে,—চুপচাপ শুয়ে থাক খাটিয়ার উপর, যতক্ষণ না নেশা ছাড়ে।

মোহন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দুলালীর দিকে একদৃষ্টে চেয়েই থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর সে নিজের মনেই হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো নেশার ঝোঁকে। হাসতে হাসতে খাটিয়ার উপর গড়িয়ে পড়লো মোহন। দুলালী একটু বিরক্তির সুরে বললে,—এত হাসছিস যে?

মোহন আবার উঠে বসলো, দুলালীর ডান হাতটা সে খপ্‌ ক'রে চেপে ধরলে, হাসিটা একটু সামলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলো মোহন,—তাই যা না একদিন সায়েবের কাছে, যাবি? দেখ না শালা কত টাকা দেয়, এককুড়ি—দু'কুড়ি—তিনকুড়ি—কত টাকা দিবে বলেছে?

দুলালী একবার হকচকিয়ে তাকালো মোহনের দিকে, তারপর সে মুখটা একটু বিকৃত ক'রে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—ধ্যাৎ।

মোহন বললে,—মাইরি বলছি দুলালী, টমাস সায়েব লো
কিন্তু ভাল, যা না একদিন ঘুরে আয় সায়েবের বাংলা থেকে।

দুলালী ক্রমশই মনে মনে চটে উঠতে লাগলো। মোহন বললে
এক কাজ কর, এই ধাওড়াতেই একদিন আসতে বলে দে সায়েব
কালই রাত ন-টার সময়। কাল থেকে আমার রাতপালি, ফঁ
ধাওড়ায় তুই আর টমাস সায়েব; কোন রকমে একটা রাত
সায়েবের মানটা রেখে, পারবি না ?

এই বলে মোহন নিজের মনেই আর একবার হো হো ক
হেসে উঠলো। দুলালী রাগে আগুন হয়ে উঠেছে, মোহনের ক
শুনে মুখচোখ তার লাল হয়ে উঠলো। রাগে গিস্ গিস্ করে
করতে মোহনের কাছ থেকে হঠাৎ উঠে পড়লো দুলালী। মোহ
তার হাত ধরে টেনে খাটিয়ার উপর আবার বসিয়ে দিলে, বললে,—
আহা শোন্ না, আগে থেকে এত চটছিস কেনে ?

দুলালী ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না সুরু ক'রে দিয়েছে, কান্নার সুরে বলে
উঠলো দুলালী,—ছাড়—ছাড়—আর আমি তোর কোন কথা শুনতে
চাই না।

মোহন হো হো করে হাসতে হাসতে দু'হাত দিয়ে দুলালীর
গলাটা হঠাৎ জড়িয়ে ধরলে, বললে,—ঘাবড়াস না, কানে কানে একটা
কথা বলি শোন।

মোহনের এই টানা হেঁচড়ায় রীতিমত বিব্রত হয়ে উঠলো দুলালী,
ফিক ক'রে সে হেসে ফেললে, খাটিয়ার উপর ধপ ক'রে বসে পড়লো
দুলালী মোহনের একদম কোল ঘেঁষে। দুলালীর কানের কাছে মুখ
রেখে ফিস্ ফিস্ ক'রে কতকগুলো কি বলে গেল মোহন, এমনভাবে
সে কথাগুলো বললে যেন ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়; দুলালী কিন্তু

চমকে উঠলো, বললে,—না—না—সেটি হবেক নাই, ওকথা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না।

মোহন একটু জোর দিয়ে বললে,—তোকে বলতেই হবে, টমাস সায়েবকে আমি সহজে ছাড়বো! সাঁওতালের মেয়ের উপর নজর দেওয়ার ফল হাড়ে হাড়ে ওকে বুঝিয়ে দিব আমি। দে দে ধাওড়াতেই আসতে বলে দে' বেটাকে, কাল রাত ন-টার সময়।

দুলালী একটু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে,—বিপদের উপর বিপদ আর বাড়াস না মোহন, তার চেয়ে আজই আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই চল্।

মোহন বললে,—আজ না, পালাব কাল রাত্রে; যেমনটি তোকে বলে দিলাম—সেই মত ব্যবস্থা কিন্তু হতে হবে।

একবার যা গোঁ ধরে মোহন সহজে তা ছাড়তে চায় না, দুলালীর তা ভাল রকম জানা আছে, শুধু মোহন মাঝি কেন—একগুঁয়েমি সাঁওতাল জাতের স্বভাব। এ অবস্থায় মোহনকে আর ঘাঁটাতে সাহস করলে না দুলালী, ফল হয়ত তার উল্টোই হবে, মোহনের প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি হতে হলো। ভয়ে কিন্তু দুলালীর বুক কাঁপছে এখন থেকেই, মোহনকে নিয়ে কোন রকমে একবার চরণপুর থেকে বেরুতে পারলে সে বাঁচে।

মনটা ভয়ানক বিগড়ে অছে মোহনের, কোনমতেই সে স্বস্তি পাচ্ছে না। মদের নেশা রীতিমত জমে এসেছে। টলতে টলতে আর একবার সে উঠে দাঁড়ালো, চীৎকার ক'রে হঠাৎ বলে উঠলো মোহন, —মদ—মদ—আর খানিকটা মদ।

দুলালী তাড়াতাড়ি মোহনকে ধরে ফেললে, বললে,—আজ আর তুই মদ খেতে পাবি না।

খাটিয়ার উপর একটা বালিশ দিয়ে জোর ক'রে মোহনকে শুই দিলে ছুলালী, লম্ফটা তাড়াতাড়ি নিবিয়ে দিয়ে নিজেও সে আ সকাল সকাল শুয়ে পড়লো। নেশার ঘোরে নিজের মনেই বকে যাচ্ছে মোহন, কথা তার ক্রমশই জড়িয়ে আসতে লাগলো, টানা স্বরে আবোল তাবোল বকে যেতে লাগলো মোহন,—মদ আমি খাবই, একশ'বার খাব, টমাস সায়েবকে আমি ডরাই নাকি। ও শালা মদ খায় না? আমি ও খাব, বিশ ডবল খাব, দেখি শালা তুই ক'হাঁড়া মদ খেতে পারিস।

ছুলালী মৃছু একটা ধমক দিয়ে বললে,—চেঁচাস না আর, ঘুমো।

মোহন নেশার ঘোরেই বলে উঠলো,—ঘুমাব না ত তুই শালীকে ডরাব নাকি, দেখত .শালীর আস্পদ্ধা; ইদিকে আয় শালী—ইদিকে আয়।

ছুলালী একটু বিরক্তভাবে বলে উঠলো,—আঃ—কি যে করিস!

টমাস সাহেব আজ ভারি খুশী। মোহন মাঝির বৌটা যে এত সহজে রাজি হবে গোড়ার দিকে তার ভাবগতিক দেখে মোটে সে কথা ভাবতে পারে নি সাহেব। ভোঁদার মায়ের বাহাদুরি আছে, এ কথা কিন্তু স্বীকার করতে হবে। ভোঁদার মাকে বেশ ভাল রকম বকশিশ ক'রে দিয়েছে সাহেব; রাত্তির বেলা সাহেবকে সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি পৌঁছে দিয়ে আসবে ছুলালীর কাছে; কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে আছে। রাত্তিরটাও ভাল, কৃষ্ণপক্ষ চলছে এখন, সন্ধ্যার পর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তা হোক অন্ধকারে আটকাবে না, মাঝে মাঝে অভ্যাস আছে টমাস সাহেবের, ছুলালী যে শেষ পর্য্যন্ত রাজি হয়েছে এই ঢের। সাঁওতালী 'বিউটি' টমাস সাহেবের

কাছে একেবারে 'নভেল' না হলেও অন্যান্যদের তুলনায় তুলালী মেঝেন ঢের বেশি চার্মিং। তুলালীর কথাই আজ ক'দিন থেকে ভাবছে সাহেব, খুশির আমেজে মনটা তার আজ মশ্‌গুল হয়ে আছে। পানিয়ের মাত্রাটা আজ ইচ্ছে ক'রেই একটু বাড়িয়ে দিয়েছে সাহেব, বিশেষ দিনে এমনটা প্রায় ঘটেই থাকে। 'ওয়াইন এ্যাণ্ড উওম্যান' জিনিস তুটো ভাল, একথা কিন্তু হলপ ক'রে বলতে পারে টমাস সাহেব। বাই জোভ, এই নিয়েই ত দেশ তুনিয়া ভুলে কোন রকমে সে বেঁচে আছে আজো।

সন্ধ্যার সময় ধাওড়া থেকে গাঁইতি হাতে বেরিয়ে পড়লো মোহন, কাজে তাকে বেরুতেই হবে। ইচ্ছা করলে একটা দিন সে অনায়াসে কামাই করতে পারতো, কিন্তু তাতে আসল উদ্দেশ্য তার ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। টমাস সাহেব যদি ঘুণাক্ষরে টের পায় যে মোহন মাঝি আজ কাজে আসে নি, তাহলে সে কুলিধাওড়ার পাশ মাড়াবে না। তার চেয়ে খাদে গিয়ে নেমে পড়াই ভাল, সময় মত সেখান থেকে আবার উঠে আসতেই বা কতক্ষণ।

রাতপালির মালকাটাদের সঙ্গে মোহন গিয়ে তুমাতুম কয়লা কাটতে আরম্ভ ক'রে দিলে খাদের নীচে। অন্য একটা গ্যালারির মধ্যে জলকুলিরা গুলতানি পাকিয়েছে সব একসঙ্গে বসে। পাম্পের মেসিন থেকে একটানা শব্দ উঠছে—ঘ্যাস্‌স্‌—ঘ্যাস্‌স্‌—ঘ্যাস্‌স্‌—ঘ্যাস্‌স্‌—ঘ্যাস্‌স্‌—ঘ্যাস্‌স্‌·········

সন্ধ্যার পর ছোট সাহেব একটা চক্কর দিয়ে এলো কলিয়ারির আশেপাশে। খাদমোয়ানে হাজরি বাবুর গুমটির সামনে হঠাৎ আজ অসময়ে সাহেব গিয়ে হাজির, কুলিকামিনরা সব সময় মত ঠিক ঠিক খাদে নামছে কিনা মাঝে মাঝে খবর নেওয়া দরকার। সাহেবকে

দেখে হাজরিবাবু—আধাবয়সী এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক—একেবারে তটস্থ হয়ে উঠলেন। লম্বা চওড়া একটা গুডমর্ণিং ক'রে থতমত খেয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন হাজরিবাবু,—অল মাইনারস্ ডাউন সার, নাইট শিফ্ট্ ও-কে।

ছোট সাহেব মাইনারস্‌দের এটেণ্ডেন্স্ রেজিষ্টার খানা একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,—অল রাইট বাবু, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।

ছোট সাহেবের এই অপ্রত্যাশিত অমায়িক ব্যবহারে হাজরিবাবু প্রায় ঘেমে উঠলেন। যাবার আগে আর একবার হাজরিবাবুর দিকে তাকিয়ে খোশমেজাজে বলে উঠলো সাহেব,—গুড নাইট বাবু!

হাজরিবাবু গদগদ ভাবে বলে উঠলেন,—গুড মর্নিং সার, গুড মর্নিং।

টর্চ্চের ফোকাস করতে করতে বাংলোর দিকে মুখ ক'রে তক্ষুনি আবার ফিরে গেল সাহেব, রাত তখন আটটা প্রায় বাজে।

সন্ধ্যার সময় খাদের নীচে নেমে এসেছে মোহন, মন কিন্তু তার পড়ে আছে ধাওড়ার দিকে। ঘণ্টাখানেক কোনরকমে কাটিয়ে দিয়ে কাজ ছেড়ে সে চুপি চুপি সরে পড়লো, রাত ন-টার আগেই ধাওড়ায় তাকে পৌছতে হবে। চানকের ঘণ্টিওয়ালার সঙ্গে বাজে দুটো খুচরো আলাপ সেরে ডুলির উপর চেপে পড়লো মোহন। ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং ক'রে তিনবার আওয়াজ দিলে ঘণ্টিওয়ালা, অর্থাৎ কয়লা নয় মানুষ উঠছে। উপর থেকেও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল ঘণ্টিওয়ালার সঙ্কেত, অর্থাৎ ঠিক হ্যায়। উপরে উঠে সামনের গুমটিটার দিকে একবার তাকালো মোহন, হাজরিবাবু গুমটির ভিতর টুলের উপর বসে বসে একমনে খাতা সারছেন। মোহন একটু মাথা নীচু ক'রে গুমটির পিছন দিক দিয়ে চুপচাপ খাদমোয়ান থেকে সরে পড়লো। বর্ষার

আকাশ, আজ আবার একটু মেঘ করেছে, বৃষ্টির বিশেষ কোন লক্ষণ না থাকলেও পথঘাট একেবারে অন্ধকার। ধাওড়ার দোরে গিয়ে মোহন ধাক্কা দিতেই দুলালী একটু চমকে উঠে বললে,—কে ?

চাপা গলায় বললে মোহন,—খোল্।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই লম্ফের মিজমিজে আলোয় চারিদিক একবার লক্ষ্য ক'রে নিলে মোহন, জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা গোছগাছ সব ঠিক হয়ে গেছে। মদের ভাঁড়টা টেনে নিয়ে মেঝের উপর বসে পড়লো মোহন, এই সময়ে একবার নেশা ক'রে নেওয়া দরকার। লম্ফটা মোহন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে, মদের ভাঁড় তার হাতেই আছে, অন্ধকারে আটকাবে না। দুলালীর কিন্তু দুর দুর ক'রে গা কাঁপছে, মোহনের কোল ঘেঁষে অন্ধকারেই চুপচাপ সে একধারে বসে পড়লো। মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে মোহন বললে,—একটু খাবি? দুলালী কিন্তু আজ মদ খেতে রাজি হলো না। মোহন চুপিচপি জিজ্ঞাসা করলে,—এর মধ্যে কেউ আসে নি ত? দুলালী বললে,—না। দুলালীর মনটা কিন্তু ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে, এমন ভাবে হাতগড়া একটা বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া কিছুতেই মনঃপুত নয় দুলালীর। দুলালী জানে তার জন্য মোহনের ভালবাসা কতখানি প্রবল, দুলালীর অপমান সে কোনমতেই সইতে পারে না; কিন্তু তাই বলে যে দুলালীর জন্যে যার তার সঙ্গে হঠাৎ সে একটা মারাত্মক কাণ্ড ক'রে বসবে, এটা কিন্তু দুলালী ভাল বোঝে না। সন্ধ্যার পর থেকেই দুলালীর বুকখানা ঢাই ঢাই করছে।

বারাবনী ব্রাঞ্চ লাইনের রাত্রের ট্রেনখানা হুস্ হুস্ শব্দে পাস হয়ে গেল উত্তর দিকের মাঠের উপর দিয়ে, ধাওড়াগুলো একটু কেঁপে উঠলো, তারপর চারিদিক আবার নিস্তব্ধ। আশে পাশে জনমানবের

সাড়া শব্দ নাই, জানলার ফাঁকে দিয়ে মাঝে মাঝে একটু একটু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মোহনকে একটু নাড়া দিয়ে দুলালী বলে উঠলো,—এই সময় চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি চল্, কাজ নাই আর বখেড়া বাড়িয়ে।

ধাওড়ার পিছন দিকে হঠাৎ জানলায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। দুলালীকে মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলো মোহন,—চুপ।

দুলালী হঠাৎ অন্ধকারেই চেপে ধরলে মোহনকে, ভয়ানক তার ভয় করছে, মোহনের কাছ ছেড়ে কোনমতেই সে এগুতে চায় না। মোহন দুলালীকে জোর ক'রে জানলার দিকে ঠেলে দিয়ে ধাওড়ার এককোণে গিয়ে নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো। বার দিক থেকে খট খট ক'রে শব্দ হলো আর একবার, দুলালী ধীরে ধীরে জানলাটা খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বার দিক থেকে টর্চ্চের আলো এসে পড়লো দুলালীর মুখের উপর। জানলার ওপাশ থেকে চাপা গলায় কে বলে উঠলো,—আমি এখন চল্লুম। বাউরী বুড়ীর গলার আওয়াজ, ছোট সাহেবকে সে এগিয়ে দিতে এসেছে। দুলালীকে বার দিক থেকে এক নজর দেখে নিয়ে টর্চ্চের আলোটা আবার সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে ফেললে টমাস সাহেব, খুশী হয়ে সে বলে উঠলো,—ঠিক হ্যায়।

দুলালী আবার ধীরে ধীরে জানলাটা ভিতর দিক থেকে বন্ধ ক'রে দিলে। মোহনের সর্ব্বাঙ্গ গুর গুর ক'রে কাঁপছে। দুলালীকে অন্ধকারেই কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে মোহন গিয়ে দাঁড়ালো দরজার ঠিক পিছনে, আগে থেকেই দরজায় খিল আঁটা আছে। চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ ক'রে দুলালী হঠাৎ কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো মোহনকে, মৃদু একটা শিস্ দিয়ে দুলালীকে থামিয়ে দিলে মোহন।

দু'এক মিনিট পরেই দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ, একবার—দু'বার—তিনবার; ভিতর থেকে কোন সাড়া নাই, দরজার খিলটা বেশ শক্ত ক'রে এঁটে ধরেছে মোহন। দরজার উপর বার দিক থেকে আরও কয়েকটা টোকা পড়লো, তারপর হঠাৎ মৃদুগলায় আওয়াজ,—খোলো।

দুলালী বা মোহন কেউ কোন সাড়া দিলে না। চাপা গলায় বার থেকে আবার আওয়াজ হলো,—জল্‌দি খোলো, ডরো মৎ বিবি।

এবার কিন্তু দরজাটা সত্যি সত্যি খুলে গেল। দরজার পিছনে চুপচাপ যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে টমাস সাহেবকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সে কিন্তু টমাস সাহেবের বিবি নয়, স্বয়ং বাবা। গম্ভীর গলায় একটা হাঁক দিলে মোহন,—কে?

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের সুইচটা টিপে দিলে টমাস সাহেব। মোহনকে দেখে হঠাৎ সে একটু চমকে উঠলো. দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো সাহেব,—ও মাই গড, টুমি শালা ইখানে!

মোহন কিন্তু সাহেবের এই মোলায়েম সম্বোধনটা বরদাস্ত করতে চাইলে না মোটে, সাহেবকে সে বোনাই বলে স্বীকার করলে না, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—শালা কাকে বলছিস সায়েব, খবরদার।

টমাস সাহেব মনে মনে এঁচে নিলে—ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক নয়, এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র আছে, মোহন মাঝির বৌটা বিট্রে করেছে টমাস সাহেবকে। টমাস সাহেবের মনের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠলো, সামান্য একটা মালকাটা সাহেবের মুখের উপর তাকে যা-তা বলতে সাহস করে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে! কিন্তু উপায় কি, স্থান কাল এবং পারিপার্শ্বিক সাহেবের পক্ষে অনুকূল নয়, বাধ্য হয়ে সাহেবকে তাই এ অপমান সয়ে নিতে হলো। কিন্তু সাহেবের পক্ষে এ অসহ্য, খাপ্পা হয়ে উঠলো টমাস সাহেব, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলে উঠলো,—টুমি শয়টান

আনটাইমলি কাম ছোড়কে আণ্ডার গ্রাউণ্ডসে ভাগা হায়, টুমকো হাম পুলিশ বোলাকে হাজটমে চালান করে গা।

মোহন মাঝিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—আর তুই ? তুই যে নিজের বাংলা ছেড়ে রাত দুপুরে কুলিকামিনদের ধাওড়ায় এসে মেয়ে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস, তুই শালাকে চালান দিবেক কে !

টমাস সাহেব দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো,—স্কাউণ্ড্রেল !

মোহন একটু উত্তেজিত ভাবে বললে,—খবরদার সায়েব, মুখ সামলে কথা বলিস।

টমাস সাহেব থ মেরে গেল, মোহনের ভাবগতিক এবং কথাবার্ত্তার ধারাধরণ ভাল মনে হলো না সাহেবের; ধীরে ধীরে সে পিছু হঠতে আরম্ভ করলে। মোহন গিয়ে তাড়াতাড়ি সাহেবের পথ আগলে দাঁড়ালো, বললে,—পালাবি কুথা সায়েব, এমনি তোকে ছেড়ে দিব ভেবেছিস।

দুলালী পিছন থেকে ডাক দিলে,—মোহন !

টমাস সাহেব মোহনের মুখের উপর আর একবার টর্চ্চের আলো ফেলে কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলো,—হঠো ম্যান—যানে দেও হামকো, হামসে টুম ক্যা মাংতা হায় ?

টমাসের ডান হাতটা হঠাৎ খপ্ ক'রে চেপে ধরলে মোহন, বললে,—তুমি শালা রাত্তির বেলা কার হুকুমে আমার ধাওড়ায় এসেছ শুনি ?

টমাসের সাহেবী রক্ত গরম হয়ে উঠলো, মোহন মাঝির এ স্পর্দ্ধা অসহ্য, হাতটা তার ঝাঁকি মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুষি পাকিয়ে মোহনের বুকের উপর জোড় ভরতি ঝেড়ে দিলে সাহেব হঠাৎ এক ঘুসি। বাঘের মত সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মোহন। ধ্বস্তাধস্তি করতে করতে

দু'জনেই গড়িয়ে পড়লো ধাওড়ার দাওয়ার উপর। দুলালী একটু ভয় পেয়ে বলে উঠলো,—মোহন—মোহন!

মোহনের দেহখানা যেন পাথর দিয়ে গড়া, অসুরের মত শক্তি তার গায়ে। মোহনের হাতে কতকগুলো চড় চাপড় আর ঘুষি খেয়ে সাহেব একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো। দুলালী গিয়ে তাড়াতাড়ি সাহেবের সামনে থেকে সরিয়ে নিলে মোহনকে। ধীরে ধীরে টমাস সাহেব উঠে দাঁড়ালো, হাঁটবার তার সঙ্গতি নাই, মোহনের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করতে করতে বাঁ পা-টা তার মচকে একেবারে জখম হয়ে গেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ধাওড়ার নীচে গিয়ে নামলো টমাস, সর্ব্বাঙ্গ তার থর থর ক'রে কাঁপছে, মোহনের দিকে পিছন ফিরে গর্জ্জে একবার তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো টমাস সাহেব,—আই ওন্ট্ লিভ ইউ মোহন মাঝি, টুমকো হাম ডেখেগা।

মোহন গিয়ে আবার হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে ধরে নিয়ে এলো টমাস সাহেবকে একেবারে ধাওড়ার মধ্যে, বললে,—তুমি শালাকে আজ আর আমি বাংলায় ফিরে যেতে দিচ্ছি না, থাকো শালা সারারাত এই ধাওড়ায় পড়ে।

মোহন আর একটা ধাক্কা দিতেই টমাস একধারে ছিটকে পড়লো। তাশভাবে ধাওড়ার মেঝের উপর ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়লো টমাস সাহেব। ন্ধকারেই ঠোঁটের উপর সে হাত বুলিয়ে দেখে তার নীচের পাটির মনেকার দাঁত একটা নাই, ঠোঁট গড়িয়ে গল গল ক'রে রক্ত ঝরছে। জের মনেই অস্ফুটস্বরে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো টমাস,—হরিব্‌ল্—রিব্‌ল্।

জিনিসপত্র আগে থেকেই গোছ করা ছিলো। মোট পোঁটলা গুলো ওড়া থেকে টেনে বের ক'রে এনে দুলালীকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি

বেরিয়ে পড়লো মোহন। যাবার আগে দরজার শিকলটা সে বার দিক থেকে টেনে দিয়ে গেল। চমকে উঠলো টমাস সাহেব, ঘর থেকে বেরোবার আর কোন উপায় নাই। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো টমাস, ভিতর থেকে সে ডাক দিতে লাগলো,—মোহন মাজি—মোহন মাজি!

মোহনের আর সাড়া শব্দ নাই। অন্ধকার ধাওড়ার মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দে মশা ডাকছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো টমাস সাহেব। এর চেয়ে যে সামনা সামনি ফাইট দিয়ে আরও গোটা-কয়েক সাঁওতালী থাপ্পড় খেতে রাজি ছিলো টমাস, ধাওড়ার মধ্যে পড়ে পড়ে এমনভাবে মশার কামড় অসহ্য। ধাওড়ার ভিতর থেকেই উদ্‌ভ্রান্তের মত আর একবার হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো সাহেব,—মোহন মাজি—মোহন মাজি!

কারো কোন সাড়া পাওয়া গেল না, জানলার পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে গেল খানিকটা দমকা বাতাস। মেঝের উপর পড়ে পড়ে নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মনেই মাঝে মাঝে গর্জ্জে উঠতে লাগলো টমাস সাহেব। ধাওড়া থেকে বেরোবার উপায় নাই, বার দিক থেকে দরজায় শিকল টানা।

মোহন আর দুলালী চরণপুর কলিয়ারির সীমা ছাড়িয়ে এসেছে। জমাট বাঁধা অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা, পথ ঘাট কিছু দেখা যায় না, মাঝে মাঝে শুধু এক একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের সেই আবছা আলোয় পশ্চিম দিকে যাবার পথ তারা একটা ধরে নিয়েছে, কোথায় যে তাদের যেতে হবে সঠিক কিছু জানা নাই। তবু যেতে হবে, যেখানে হোক যেতে তাদের হবেই, সেই অজানা ঠিকানায় পথই হয়ত তাদের পৌঁছে দেবে যথা সময়ে।

সাত

চরণপুর কলিয়ারি ছেড়ে আসার পর আরও কয়েকটা জায়গা ঘুরে ফিরে মোহন আর দুলালী শেষ পর্য্যন্ত উঠেছে এসে পাথরডিতে। দেশছাড়া এই দু'টি প্রাণী ক্রমাগত দুঃখকষ্ট ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে বহুদিন কাটানোর পর এখানে এসে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে। দিন এখানে কেটে যাচ্ছিলো ভালই। ভুলেও কোনদিন দুলালীকে এতটুকু অবহেলা করেনি মোহন, তার আদর যত্ন ভালবাসা দুলালীর মন থেকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছিলো সব কিছু দুঃখ কষ্টের আঘাত। এক ফোঁটা ওই মেয়েটা পৃথিবীর বুকে নেমে আসার পর সংসার যেন এদের চোখে হয়ে উঠলো মধু হতে মধুময়। কি নিবিড় আকর্ষণ ওই একরত্তি মেয়ের। কতদিন খাদের নীচে কাজ করতে করতে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসেছে মোহন মেয়েটাকে শুধু একবার দেখতে, মেয়েটা যেন ওদের চোখে পরম এক বিস্ময়, ছন্নছাড়া জীবনের মাঝখানে নতুনতর এক মধুর আকর্ষণ। দুলালীর উপর শ্রদ্ধা যেন বেড়ে গেছে মোহনের, আজ শুধু দুলালী তার একমাত্র জীবন-সঙ্গিনীই নয়, দুলালী আজ মোহনের সন্তানের জননী। পাথরডি কলিয়ারির কুলিধাওড়ায় দুটো বছর প্রায় দেখতে দেখতে কেটে গেল স্বপ্নের মত। স্বজন বান্ধবহীন পলাতক জীবনের তবু একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছিলো দুলালী, মনে মনে পেয়েছিলো পরিপূর্ণ সান্ত্বনা; মোহনের সাহচর্য্যে মন তার ভরে উঠেছিলো ছোট্ট একটি সংসারকে ঘিরে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে সুখটুকু সইলো না হয়ত দুলালীর ভাগ্যে, নৈলে মোহন হঠাৎ এমন ধারা বিগড়ে যাবে কেন। দুশ্চরিত্রা একটা বাউরীর মেয়ের খপ্পরে পড়ে

নিজের চরিত্রকে আজ কলুষিত ক'রে তুলেছে মোহন, দুলালীর সঙ্গে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। ফেরাতেই হবে তাকে ওপথ থেকে, দুলালীর চোখের সামনে মোহনকে সে এমনভাবে বয়ে যেতে দেবে না, কোন মতেই না।

বিছানায় পড়ে পড়ে কত কথাই ভাবছে দুলালী, চোখে তার ঘুম নাই। রাত বারোটার ভোঁ বাজলো হঠাৎ তিন নম্বর খাদে, দুলালীর যেন চমক ভাঙ্গলো এতক্ষণে; রাত হয়ে গেছে এতখানা—মোহন ত কই ফিরলো না এখনো। সত্যিই কি সে দুলালীর উপর রাগ ক'রে সরে পড়লো? রাত্রে যদি আর না ফিরে! পড়েছে হয়ত গিয়ে সুন্দরা বাউরীনের খপ্পরে, সে যে বড় কঠিন ঠাঁই। সুন্দরার গোরো গা আর বিনুনী খোঁপার চটক দেখেই শেষ পর্য্যন্ত ভুলে গেল মোহন! আজ হয়ত সারাটা রাত ওরা একসঙ্গেই কাটাবে, হয়ত বা এক শয্যায়। রাগ ক'রে নতুন শাড়ীখানা পর্য্যন্ত মোহনকে আজ ফিরিয়ে দিয়েছে দুলালী, কাজটা কিন্তু ভাল হয় নি, দিলে হয়ত মোহন শাড়ীখানা সুন্দরাকেই দিয়ে। কি ভুলই করেছে দুলালী, কেন সে মরতে শাড়ী-খানা ফিরিয়ে দিতে গেল। এতক্ষণ হয়ত সুন্দরার বাড়ীতে আসর ওদের জমে উঠেছে। বোতল বোতল মদ চলছে হয়ত, মদ ত ওরা খাবেই, আজ হয়ত খুব বেশি ক'রেই খাবে। কিন্তু অতিরিক্ত মদ খাইয়ে মোহনকে যদি বেহুঁস ক'রে দেয় সুন্দরা! ঐ ত ওদের কাজ; নেশার ঝোঁকে টলতে টলতে মোহন হয়ত একধারে গড়িয়ে পড়বে, আর সেই ফাঁকে কোমরের গেঁজে থেকে টাকাপয়সাগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে বিলকুল হাতিয়ে নেবে সুন্দরা। তারপর দেবে হয়ত ঘর থেকে লাথি মেরে বিদেয় ক'রে। মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে চীৎকার করলেও কেউ সাড়া দেবে না। না—না—এর ব্যবস্থা

করতে হয়েছে, বাড়ী ফিরিয়ে আনতে হবে মোহনকে যেমন ক'রে হোক।

শয্যা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো দুলালী। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত, অন্ধকারে চারিদিক থম্ থম্ করছে। ঘুমন্ত মেয়টাকে কোলে ফেলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো দুলালী। সুন্দরার ধাওড়ায় তাকে যেতে হবে, এক্ষুনি এই রাত্রেই, সেই রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচাতে হবে মোহনকে।

পথ ঘাট নিঝুম। ছাইবিছানো একটা অপরিসর রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো দুলালী। তিন নম্বর খাদের ধাওড়া গুলো নেহাত কাছে নয়, বেশ খানিকটা দূর আছে দুলালীদের ধাওড়া থেকে; মাঝখানে কোম্পানীর বিজলি-বাতির কারখানা। বিজলি ঘরের ফটকে কোম্পানীর সেপাইরা বন্দুক ঘাড়ে ক'রে পাহারা দেয় চব্বিশ ঘণ্টা, দেখতে পেলে হয়ত বা তাড়া ক'রে আসবে। ছাই বিছানো সড়পটা ছেড়ে দিয়ে বিজলি ঘর বাঁয়ে রেখে ডান দিকের একটা সরু পথ ধরে এগিয়ে চললো দুলালী। ভয়ে তার গা ছম ছম করছে, কিন্তু তবু তাকে যেতে হবে সুন্দরার ধাওড়া পর্য্যন্ত। সুন্দরার ধাওড়া সে চিনে না, কোন রকমে খুঁজে নিতে হবে; ওপাড়ার এক দুলেবুড়ীর সঙ্গে দুলালীর চেনাশোনা আছে, এই যা একটু ভরসা। বুড়ীর বাসাটা একদিন দেখে এসেছে দুলালী, তাকেই গিয়ে ডেকে হেঁকে তুলতে হবে কোন রকমে। দুলেবুড়ী লোক খুব ভাল, দুলালীর সঙ্গে কাজ করে সে এক কুঠিতে।

পূবদিকের আকাশটা কিছু ফরসা লাগছে, ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে দূরের একটা কয়লা খাদের বয়লারের পাশ দিয়ে। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই একটা তে-মাথার মোড়ে জন দুই মালকাটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দুলালীর, রাত পালিতে কাজে যাচ্ছে লোকগুলো।

দূর থেকে দুলালীকে দেখেই হাঁক দিয়ে উঠলো একটা লোক,—কে যায়?

দুলালী সাড়া দিলে না, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। দুটো ছোঁড়া ওর সামনে এসে দাঁড়ালো, দুলালীকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে শিস্ দিতে আরম্ভ করলে একজন, আর একজন রসিকতা ক'রে বললে,—এত রেতে ইকলা কেনে মাইরি!

অপর লোকটা দুলালীর আর একটু কাছ ঘেঁষে বলে উঠলো,—দোকলার খোঁজে বেরিয়েছ নাকি?

দুলালী থমকে একটু দাঁড়ালো, ছোঁড়াগুলোর ভাব গতিক ভাল নয়; সামনা সামনি দাঁড়িয়ে দুলালী হঠাৎ বলে উঠলো,—কি চাস তোরা?

একটা ছোঁড়া বলে উঠলো,—তোর মতন একজন সঙ্গী।

দুলালীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। ছোঁড়াটা আবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—আমরা অবশ্য দাম দিতে রাজি আছি, কয়েক আনা পয়সা এখনো পড়ে আছে গেঁজেতে, বের করবো নাকি?

দুলালীর কণ্ঠ স্বর কঠোর হয়ে উঠলো, জোর গলায় সে বলে উঠলো,—খবরদার, ভাল চাস ত পথ ছেড়ে দে।

ছোঁড়াটা একটু হকচকিয়ে সরে দাঁড়ালো। ওর সঙ্গীটা আরও খানিক এগিয়ে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ দুলালীর সামনে, বললে,—পথ যদি না ছাড়ি, কি করবি শুনি?

দুলালী বললে,—চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো, বিজলিঘরের দারোয়ানদের ডেকে ধরিয়ে দিব তোদের; যদি ভাল চাস ত চুপচাপ সরে পড়।

দুলালীর ভাবগতিক সুবিধের নয় দেখে একটা ছোঁড়া আগেই খানিকটা সরে পড়েছে, ওর সঙ্গীটা কিন্তু ইতস্ততঃ করছিলো তখনো,

সামনের একটা বস্তির মোড়ে হঠাৎ দেখা গেল কতকগুলো মালকাটা মগবাতি হাতে ঝুলিয়ে রাতপালিতে খাটতে বেরিয়েছে, লোকগুলোকে দূর থেকে দেখেই ছোঁড়া দুটো তাড়াতাড়ি সরে পড়লো। দুলালী আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালো না, হন্ হন্ ক'রে পা চালিয়ে দিলে দুলেবুড়ীর ধাওড়ার দিকে মুখ ক'রে। দুলে বুড়ীর দোরের সামনে গিয়ে যখন পৌছলো দুলালী—থর থর ক'রে ওর হাত পা গুলো কাঁপছে। দোরে একটা ধাক্কা দিয়ে দুলালী ডাকতে লাগলো,—মাসী, ও মাসী!

ভিতর থেকে সাড়া দিলে দুলেবুড়ী,—কে, এত রেতে কে গো?

দুলালী বললে,—দোরটা একটু খোল্ মাসী, আমি দুলালী।

লম্ফটা জেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে দোর খুলে দিলে দুলেবুড়ী, দুলালীকে দেখে বুড়ী অবাক হয়ে গেল, বললে,—এত রেতে যে?

দুলালী একটু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে,—মোহনকে খুঁজতে এসেছি, আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঘর থেকে আজ পালিয়ে এসেছে।

দুলেবুড়ী একটু হতাশ ভাবে বলে উঠলো,—হায়রে আমার কপাল, রাত দশটার গাড়ীতে যে সুন্দরার সঙ্গে মেলা দেখতে চলে গেল খালভরা।

দুলালীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো, আজ আর সন্দেহের কিছু থাকলো না, রটনা তাহলে পুরোপুরি সত্যি। এতদিন তবু কতকটা ঢেকে ঢুকে চলছিলো, এখন আর কোন সঙ্কোচ নাই। একটা বাউরীর মেয়ের সঙ্গে অনায়াসে রথ দেখতে চলে গেল মোহন দুলালীকে ধাওড়ার মধ্যে একা ফেলে রেখে! এতখানা বে-পরোয়া এর আগে ত সে ছিলো না। সুন্দরা হয়ত গুণ করেছে, জড়িবড়ি হয়ত খাইয়েছে কিছু মোহনকে। ঝর ঝর ক'রে হঠাৎ কেঁদে ফেললে দুলালী, বললে,—মাসী, উয়োকে নিয়ে যে আমি জ্বলে পুড়ে মলুম।

ডুলেবুড়ী সায় দিয়ে বললে,—তাই দেখছি, পুরুষটি কি তোর সোজা, আর খানিক হলে মটুকধারীর সঙ্গে আজ লাঠালাঠি হয়ে যেতো।

মটুকধারী সিং—কোম্পানীর এক হিন্দুস্থানী কর্মচারী, ভয়নক লোক সে। আধময়লা গায়ের রঙ, বেঁটে দো-হারা চেহারা, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়, বহুকাল থেকে পশ্চিম মুলুক ছেড়ে এই অঞ্চলে এসে বাস করছে মটুকধারী সিং, লোকটাকে প্রায় কলিয়ারির সকলেই চিনে। মাথায় একটা তেল-চোঁয়ানো বহুকেলে মলমলের গোলাপী রঙের পাগড়ী, কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা, আর হাতে একগাছা পিতলের তার জড়ানো ভোজপুরী লাঠি; এ তিনটি জিনিস মটুকধারীর সব সময়ের সঙ্গী, এগুলি তার আভিজাত্যের প্রতীকচিহ্ন। মটুকধারীর নামটাও খুব পরিচিত এমহলে, ছেলে বুড়ো থেকে আরম্ভ ক'রে কলিয়ারির প্রায় সকলেই তাকে চিনে। সুন্দরার ধাওড়ায় সে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করে এ খবরটাও জানা আছে সকলেরই। সুন্দরার সঙ্গে অপর কাউকে বেশি রকম মেলামেশা করতে দেখলে মটুকধারী যে সহজে তাকে ছেড়ে কথা কইবে না এ এক রকম জানা কথা, লাঠালাঠি বাধতে কতক্ষণ! ডুলেবুড়ীর কথা শুনে মোহনের জন্য ভয়ানক চিন্তিত হ'য়ে পড়লো ডুলালী।

সুন্দরার ধাওড়ায় আজ সন্ধ্যার পর গোলমাল হয়েছিলো একটু বিশেষ রকমের। ডুলে বুড়ীর কাছ থেকে তারই বিস্তারিত বিবরণ শুনতে শুনতে ডুলালী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। মোহন এসে ঢুকেছিলো সুন্দরার ধাওড়ায়, বোতল বোতল মদ আর হৈ-হুল্লোড় চলছিলো ওদের সন্ধ্যার পর থেকেই। মটুকধারী সিং এসে মোহনের সঙ্গে এই নিয়ে একটা খেখেড়া বাঁধাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সুন্দরার কাছে তার বাজি

খাটেনি, গালাগালির চোটে হদ্দ হয়ে শেষপর্য্যন্ত সে পিছটান দিতে বাধ্য হয়েছে। স্পষ্টই তাকে জানিয়ে দিয়েছে সুন্দরা যে মটুকধারীর সে বিয়ে করা বউ নয়, কোন বেটার সে জোরজুলুমের ধার ধারে না; সুন্দরা যে মাঝে মাঝে এক আধটু অনুগ্রহ করে মটুকধারীকে এই তার সাতপুরুষের ভাগ্যি। মটুকধারী কিন্তু সুন্দরার পিছনে এ পর্য্যন্ত বহু টাকা খরচা করেছে, সুন্দরার সঙ্গ লাভ করবার জন্য গোড়ার দিকে ছ্যাঁচড়ামিও তাকে কম করতে হয়নি; আজ হঠাৎ মোহন বা অপর কেউ এসে যে তার চোখের সামনে সুন্দরার উপর ভাগ বসাবে—এ তার পক্ষে অসহ্য। মটুকধারী সিং আরও দু' একজন সঙ্গী জুটিয়ে সুন্দরার ধাওড়ায় আজ গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করেছিলো। সুন্দরা তাদের ঝাঁটা পেটা ক'রে বিদেয় ক'রে দিয়েছে। হৈ চৈ আর হট্ট গোলের মুখে আর খানিক হলে মটুকধারীর আস্ত একটা কান আজ প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছিলো সুন্দরা, ওর সঙ্গের লোকগুলো খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে। যাবার সময় প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে মটুকধারী—সুন্দরা বাউরীনকে যদি সে জব্দ ক'রে ছেড়ে দিতে না পারে ত মটুকধারী তার নাম নয়। সুন্দরা কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না ও সব শাসানিকে, মটুকধারীর মত ঢের ঢের দেখা আছে তার; কত কত লাঠি-ধারী সুদখোর কাবলিওয়ালা পর্য্যন্ত টিট হয়ে গেছে সুন্দরার পাল্লায় পড়ে—মটুকধারী সিং ত কোন্ ছার। মটুকধারীকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়ে সেজে গুজে মোহনের সঙ্গে মেলা দেখতে রওনা হয়ে গেছে সুন্দরা রাত দশটার ট্রেন ধরে। থিক মেরে সুন্দরার সামনে পৈতে ছুঁয়ে আজ প্রতিজ্ঞা করেছে মটুকধারী—জীবনে যদি সে কোনদিন আর সুন্দরার ছায়া মাড়ায় ত ছত্রি থেকে সে বাতিল। বাউরী কামিনগুলো একধার থেকে সব নিমকহারামের একশেষ—হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছে মটুকধারী, চক্ষুলজ্জার বালাই ওদের এতটুকু নাই।

মটুকধারী সিং—সুন্দরার কাছ থেকে সত্যই সে আজ দাগা পেয়েছে। সুন্দরা চলে যাওয়ার পর কুলিধাওড়ার আশে পাশে পায়চারি ক'রে খানিক ঘুরে বেড়ালে মটুকধারী, মনটা তার ভায়নক খিঁচড়ে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্য্যন্ত সে সুখদা বাগতিনীর ধাওড়ায় গিয়ে হাজির হ'ল রাত দুপুরের পর। সুন্দরার চেয়ে লোক ভাল সুখী, ভদ্রলোকের মান সম্মান জানে। বয়সটা তার যদিও কিছু বেশি, তবু সাবেক দিনের চেহারায় তার একেবারে ভাটা পড়েনি আজো। দরকার হ'লে ও সুখদাকেই আর একটু ঘষে মেজে দিব্যি চালিয়ে নেওয়া যায়। মটুকধারী তাই করবে, ঝাড়ু মারো সুন্দরার মত বাজখাঁই দজ্জাল মেয়ের মুখে। পথঘাট একটু নিচাল হয়ে এলে মটুকধারী সিং সুখদা বাগতিনীর দোরে গিয়ে ধীরে ধীরে ঘা দিতে লাগলো, চুপি চুপি ডাক দিলে,—সুখি ও সুখি!

সুখদা কিন্তু সত্যই খুব লোক ভালো। গলার আওয়াজ চিনবা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ছেড়ে উঠে এসে ধাওড়ার দোর খুলে দিলে। মটুকধারী চুপচাপ ঢুকে পড়লো ভিতরে, সুখী আবার ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভিতর থেকে নিঃশব্দে খিল এঁটে দিলে। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে।

দুলেবুড়ীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে দুলালী আবার চুপচাপ শুয়ে পড়লো নিজের ধাওড়ায়। আরও কিছুক্ষণ আগে গেলে মোহনকে হয়ত ধরতে পারতো। সুন্দরার সঙ্গে তার মেলামেশা যে সত্যি এতখানা এগিয়ে গেছে আগে থেকে ঠিক ভাবতে পারেনি দুলালী। মোহন যে রকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তাতে তাকে বাগ মানানো সহজ কথা নয়, মতিগতি একেবারে বিগড়ে গেছে মোহনের। দুলালীই বা এত সহ্য করবে কেন, মোহনের এই সব অত্যাচার সে সহ্য করবে না; মোহনের সঙ্গে আর

কোন সম্বন্ধই রাখতে চায় না দুলালী। দুলালীর মনে এত খানা আঘাত দিয়ে সুন্দরার মত একটা নামদাগা মেয়ের সঙ্গে এমনধারা যে পথে ঘাটে মাতামাতি ক'রে বেড়াতে পারে, দুলালী তার মুখ দেখতে চায় না। জাহান্নামে যাকগে সে, চুলোয় যাকগে তার ঘরকন্না, দুলালী আর ফিরে তাকাবে না। কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় সেই দিকেই বেরিয়ে পড়বে দুলালী। যেখানে হোক আশ্রয় একটা খুঁজে নেবে, কোথাও যদি ঠাঁই না পায় আবার সে ফিরে যাবে রামপুরের ডাঙ্গায়—যেখান থেকে সে চুপি চুপি চোরের মত পালিয়ে এসেছে। যদি মরতে হয় সেখানে গিয়ে মরাও ভালো, মোহনের ভিটেয় পড়ে পড়ে এ অত্যাচার সে কোনমতেই আর সহ্য করবে না।

রাত্তিরটা কোনরকমে কেটে গেলে হয়, সকাল বেলা যা-হোক একটা ব্যবস্থা করবে দুলালী। সেই ভালো, পাথরডি কলিয়ারি ছেড়ে দূরে কোথাও সে চলে যাবে, যেদিকে দু'চোখ যায়, যেখানে তার খুশি। সকাল হলেই মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে দুলালী, মোহন যেন ফিরে এসে আর তাদের দেখতে না পায়; সেই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। মোহন বুঝুক দুলালীকে হেনস্তা ক'রে কত বড় অন্যায় সে করেছে। ভাববার আর কিছু নাই, দুলালীকে পালাতেই হবে।

দুলালীর মেয়েটা হঠাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে একবার কেঁদে উঠলো, দুলালী তাড়াতাড়ি স্তন ধরিয়ে দিলে মেয়েটার মুখে। মেয়েটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে কত কথাই সে ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে অনেক রাত্রে নিজেও সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দুলালীর যখন ঘুম ভাঙ্গলো চারিদিক তখন ফরসা হয়ে গেছে, জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে সূর্য্যের সোনালী আলো, সামনের দেওয়ালটা একমুঠো সিঁদুর মেখে যেন রেঙে উঠেছে।

রথপরবের দিন, কলিয়ারির কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। কুলিকামিনর দলে দলে রথ দেখতে চলেছে সব ঝরিয়ার ডাঙ্গা। ধাওড়াঃ বারান্দায় একটা মাচুলির উপর সকাল থেকে চুপচাপ বসে আছে দুলালী। মনটা বেশ ভাল নাই দুলালীর। সারা ঘরে ঝাঁট পড়েনি সকাল থেকে, উনুনে আজ আঁচ দেওয়া হয় নি, ভোর বেলা উঠে কল থেকে জল ধরাতে ভুলে গেছে দুলালী। কাল সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে মোহন, এতখানা বেলা হলো এখনো তার দেখা নাই। কে জানে সে মেলা থেকে ফিরবে কিনা আজও। মোহন যে রকম দুঃখু দিতে আরম্ভ করেছে দুলালীকে, তাতে আর একটি দিনও এমন ভাবে তার হিল্লেয় চোখ বুজে পড়ে থাকা উচিত নয় দুলালীর। সকাল বেলা সে তৈরিও প্রায় হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু ধাওড়া থেকে বেরুতে গিয়ে পা যেন তার এগুতে চাইলো না, কে যেন তাকে জোর ক'রে আবার ধরে এনে বসিয়ে দিলে এই মাচুলিটার উপর। মোহনকে ছেড়ে চলে যাবে দুলালী? যে-মোহনের জন্য জীবনের সব কিছু পিছনে ফেলে সে চলে এসেছে—তাকে আজ ছেড়ে যেতে হবে! সেও যে আজ একা, সমাজে তার ফিরে যাবার উপায় নাই আর, সে দিক দিয়ে যে মোহন আর দুলালী দুজনের দুঃখই আজ সমান। না—না—এ অবস্থায় তাকে ফেলে যাওয়া চলে না। তার চেয়ে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে হবে মোহনকে কুসঙ্গীনীদের কুসংসর্গ থেকে, আবার তাকে টেনে তুলতে হবে যেমন ক'রে হোক। এই সব ভেবে চিন্তেই ধাওড়া ছেড়ে শেষ পর্য্যন্ত আর যাওয়া হলো না দুলালীর। কিন্তু মোহন ত কই ফিরলো না, সকালের ট্রেনখানা এসে গেছে অনেকক্ষণ, মোহনের ফিরবার কোন লক্ষণ নাই, আজ হয়ত সন্ধ্যার আগে সে ফিরবেই না, ফিরতে তার কতখানা রাত

হবে তাই বা কে বলতে পারে। ঘর বাড়ীর কথা কি তার মনে আছে এখনো! দুলালী কিন্তু রাগের মাথায় কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে কাল মোহনকে, দুলালীর উপর রাগ ক'রে আর যদি সে না ফিরে। না—না—চুপচাপ আর বসে থাকা নয়, মেলায় গিয়ে খোঁজ খবর একটু করা দরকার; যে মেয়ের পাল্লায় সে পড়েছে—ভয়ের আশঙ্কা পদে পদে, ওই ডাকিনীটার হাত থেকে মোহনকে যে বাঁচাতেই হবে।

দরজায় তালা দিয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে উঠলো দুলালী। দলে দলে লোক যাচ্ছে ঝরিয়ার মেলা দেখতে। দুলালী গিয়ে ভিড়ে গেল একটা দলের সঙ্গে। পাথরডি থেকে ঝরিয়া মাত্র ক্রোশ তিনেকের পথ, পায়ে হেঁটেই চলেছে সব অধিকাংশ যাত্রীর দল। মাঝে মাঝে এক আধখানা এক্কা গাড়ী পিচ দেওয়া রাস্তার উপর দিয়ে হেঁকে চলেছে,—ঝরিয়া ধানবাদ—ঝরিয়া ধানবাদ—চার চার আনা—ঝরিয়া—ঝরিয়া—চার চার আনা। রথপরবের মেলা উপলক্ষে রাস্তা ঘাটে মানুষ জনের ভিড় অন্য দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশি।

চারিদিকে শুধু কয়লার খনি। যে কোন দিকে তাকালেই চোখে পড়ে বড় বড় চিমনি দিয়ে আকাশ ফুঁড়ে কালো রঙের ধোঁয়া উঠছে; কোনটা খুব কাছে, কোনটা একটু দূরে; যতদূর দৃষ্টি যায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। এদেশে পায়ের নীচে কালো পাথর, মাথার উপর কালো ধোঁয়া, দেশের যত কালো মানুষগুলো দলে দলে ছুটে আসে এই কালির দেশে কালো গায়ে কালি মাখতে। কয়লাখনির শ্রমিক এরা, দিনরাত এই কালি আর কালোর সঙ্গে লড়াই ক'রে দুনিয়াটাকে ঠিক মত চালু রেখেছে এরাই। গায়ের রক্ত জল ক'রে এরা মাটির

নীচে কয়লা কাটে, বিনিময়ে এদের নিয়োগকারী ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে হাড়ভাঙ্গা এই পরিশ্রমের কতটুকু মূল্য তারা পায়—বিচার ক'রে ভেবে দেখবার মত ততখানা বুদ্ধি এদের জোগাননিকো ভগবান। খেটে খুটে এরা যা পায় তাতেই খুশী। দৈন্য এদের ঘোচাতে পারেনি কেউ আজ পর্যান্ত, খেয়ে পরে বাঁচার মত বেঁচে থাকবার সমস্যা এদের কাছে চিরদিনই একটা সমস্যা, এ সমস্যার সমাধান এরা খুঁজে পায়নি আজো। তবু দেখি যথানিয়মে সংসার বেঁধে জীবনের বোঝা এরা বয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কোনখানে এতটুকু ব্যতিক্রম নাই, দুঃখ দৈন্য অভাব অনটন ঠিক যেন পোষা কুকুরের মত একধারে বাঁধা আছে এদের জীবনের খোঁটায়। পেটের দায়ে কয়লা এরা কাটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যথাসাধ্য রোজগারের চেষ্টা এদের করতেই হয়; হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর দেহ মনে একটা দুঃসহ অবসাদ এরা অনুভব করে ঠিকই, আবার মদ খেয়ে তাড়ি টেঁসে জীবনের এই সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতেও কিছুমাত্র এদের সময় লাগে না। পদে পদে জীবনের অফুরন্ত অভাব অভিযোগ সহ্য করেও হয়ত এই নেশার জোরেই কোন রকমে আজো টেঁকে আছে নিরক্ষর এই জনমজুরের দল। কোন রকমে বেঁচে থাকবার মত যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিল তিল ক'রে সমস্ত জীবনী শক্তিটুকু অনায়াসে এরা বিকিয়ে দিতে পারে। তার জন্য কোন অনুযোগ নাই, এতটুকু বিক্ষোভ নাই, মনটাকে এরা সব সময়ই চাঙ্গা রেখেছে। জীবন যুদ্ধে লড়তে হলে যেমন ক'রে হোক মনটাকে বাঁচিয়ে রাখা চাই, তাই এরা মনের খোরাক সংগ্রহ করে শস্তা দরের নেশা ক'রে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ভাঙ্গাচালায় এসে মদ ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকে মাতাল হয়ে। চিরন্তন কৃচ্ছ্রতার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে নির্মম

রূঢ়তার মধ্যে থেকেই জীবনের আনন্দ এদের কোন রকমে খুঁজে নিতে হয়। অজ্ঞানতার অমোঘ আশীর্ব্বাদে এরা মৃত্যুঞ্জয়ী, জীবনের মূল্য এরা বড় বেশি দেয় না, নিজেদের সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা এরা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। জয় হোক এদের, জয় হোক এদের ভাগ্যবিধাতার।

ছোট বড় অনেকগুলো কলিয়ারিকে কেন্দ্র ক'রে মাঝখানে ঝরিয়া শহর। শহরের ঠিক পশ্চিম প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা ফাঁকা ডাঙ্গা, শহরের প্রায় লাগালাগি, ঝরিয়া ষ্টেসন থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই। বিস্তীর্ণ এই ময়দানটার উপর রথপরবের মেলা বসেছে। দু'একদিনের মেলা, সমারোহ কিন্তু কম হয় না, আশ-পাশাড়ি কলিয়ারি থেকে বিস্তর লোক এসে জমা হয় এই ঝরিয়ার ডাঙ্গায় রথযাত্রার আগের দিন থেকেই। এদের মধ্যে মালকাটার সংখ্যাই বেশি, কলিয়ারির কুলিকামিনদের অসম্ভব ভিড় হয় এই মেলায়, প্রধানত এদের নিয়েই এবং এদের জন্যই মেলা। চাকুরে বাবু বা অফিসের কেরানী এবং অন্যান্য ভদ্রস্থ ব্যক্তিদেরও সমাগম খুব কম হয় না। তামাসা দর্শক হিসাবে কলিয়ারির সাহেব ও মেম সাহেবরা পর্য্যন্ত এক আধঘণ্টা ঢুঁ মেরে যান এই রথের মেলায় এসে। তার উপর যত 'কলাবেচা' অর্থাৎ ব্যবসাদারদের ভিড় ত এখানে আছেই।

রথটা এখানে নিতান্তই গৌণ ব্যাপার, মেলাটাই মুখ্য। বাঁশ আর বেকারি দিয়ে তৈরি রথের একটা কাঠামোকে রঙিন কাগজ আর হল্‌করা দিয়ে রথের আকারে ছেয়ে নেওয়া হয়। ওর মধ্যে অবশ্য শিল্পকর্ম্মের কারিকুরি বা পরিপাটি আছে যথেষ্ট; রথচারী দেবতার কিন্তু কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এখানে, রথের উপর না একটা কোন ঠাকুর ঠুকুর, না কোন দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি।

নিছক একটা রঙিন কাগজের রথ, তাই দেখতে কাতারে কাতারে লোক জমা হয় এসে প্রত্যেক বছর নির্দ্দিষ্ট এই দিনটিতে, কাগজের এই রথখানাকে উপলক্ষ ক'রে। রথের উপর ঠাকুরের চাঁদমুখ বা সুভদ্রা ও বলরামের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় আসেও না কেউ এসব মেলায় রথ দেখতে, পথ বেয়ে শুধু রথখানাকেই এরা দেখতে আসে। এদের কাছে এই বিশেষ দিনটির বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে, রথদেখার আসল উদ্দেশ্য এদের সিদ্ধ হোক আর না হোক, মেলায় এসে দশজনের সঙ্গে মিলবার যে একটা আনন্দ সেই টুকুই যেন এদের কাছে সব। 'বারো মাসে তেরো পরব'এর দেশে বিপুল আনন্দ কোলাহলের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকতর মিলনের যে আনন্দ তাকে উপভোগ করবার সুযোগ এইভাবে আমরা মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি আজো। মেলার আনন্দ—মানুষে মানুষে মিলনের আনন্দ, মনে মনে প্রাণে প্রাণে মিলনের আনন্দ। তাই আমরা এত আগ্রহ ক'রে মেলা দেখে থাকি, দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যাই মেলার নামে মানুষেরই মেলা দেখতে। সে মেলার পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা লৌকিক ভিত্তি যা-ই হোক না কেন—বিচিত্র এই মিলনের আনন্দ আমাদের মিলনমুখী উৎসুক মনকে সব চেয়ে আকর্ষণ করে বেশি। কাগজের রথ, পটে আঁকা ছবি বা দেবতার দারুমূর্ত্তি আসলে হয়ত একটা রূপক মাত্র, এই রূপককেই আশ্রয় ক'রে তীর্থে তীর্থে গড়ে উঠেছে মানবের মহামিলন পীঠ। শ্রীক্ষেত্রের বালুবেলায় অপরূপ শিল্পখচিত পাষাণপুরীর মধ্যে বৈকুণ্ঠের দেবতা মর্ত্যবাসী ভক্তের ভক্তির শৃঙ্খলে আজো বন্দী হয়ে আছেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁর রূপককে উপলক্ষ ক'রে তাঁর সেই প্রাক্তন পুণ্য আবির্ভাবকে ভক্তিচিত্তে স্মরণ ক'রে বর্ষে বর্ষে লক্ষ কোটি মানবের যে মহামিলন,

সে মিলনের তুলনা আছে কি! অপূর্ব্ব এই বিরাট সমারোহ চোখে দেখে মনে হয় যেন এদের এই মিলনটাই প্রত্যক্ষ সত্য, মনে হয় যেন মঙ্গলের দেবতা দেশ দেশান্তর থেকে এদের টেনে এনে একসঙ্গে সব মিলিয়ে দিয়েছে। এর চেয়ে সুন্দর—এর চেয়ে বিচিত্র ও প্রাণবন্ত আর কিছু যেন কল্পনা দিয়ে ধরা যায় না। এই সব উপলক্ষকে আশ্রয় ক'রে, মানুষে মানুষে মিলনের এই ক্ষেত্র নিজে হাতে গড়ে নিয়েছে মানুষ দেশে দেশে মেলার সৃষ্টি ক'রে।

ঝরিয়ার ডাঙ্গা আজ থৈ থৈ করছে, চারিদিক লোকে লোকারণ্য। অন্যান্য বৎসরের চেয়ে এ বৎসর যেন ভিড়টা কিছু বেশি, এ অঞ্চলের অধিকাংশ কলিয়ারি থেকেই লোকজনের সমারোহ হয়েছে প্রচুর। এদের মধ্যে কিন্তু বেশির ভাগই পায়ে হাঁটার দল, কয়লা খনির মজুর এরা: অপেক্ষাকৃত সৌখিন যাত্রীদের জন্য মেলা পর্য্যন্ত যানবাহনেরও যথারীতি ব্যবস্থা হয়েছে রথযাত্রা উপলক্ষে। মোটর বাস, একাগাড়ী রিক্‌শা ও টমটম হরদম যাওয়া আসা করছে গাড়ী বোঝাই যাত্রী নিয়ে; যাত্রীদের হাঁক ডাক ও হৈ-হুল্লোড়ের শব্দে সারা মেলা গুলজার, প্রকাণ্ড ময়দানটার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত শুধু মানুষের গুঞ্জন। রকমারি লোকের ভিড়ে কোনদিকে আর পা বাড়াবার উপায় নাই, দুপুরের পর থেকে মেলা খুব জমে উঠেছে।

দুলালী এসে এই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে যেন একেবারে হারিয়ে ফেললে। মেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত বার দুই তিন চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়ালে দুলালী, কিন্তু বিরাট জন কোলাহলের মধ্যে থেকে মোহনকে সে কোনমতেই খুঁজে বের করতে পারলেনা। রথতলা থৈ থৈ করছে লোকের ভিড়ে, মাটির একটা বেদির উপর কাগজের রথখানাকে স্থাপন করা হয়েছে ময়দানের এক পাশে, বাঁশের বেকারি

দিয়ে তার চারদিক বেশ শক্ত ক'রে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বেড়ার বাইরে থেকে অসংখ্য দর্শক একদৃষ্টে চেয়ে আছে কাগজের রথখানার দিকে। মেলার অন্যান্য অনুষ্ঠান দোকান পসার ও নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাদি যাত্রীদের কাছে যতই লোভনীয় হোক, কাগজের এই রথখানা আজ তাদের কাছে বিশেষ একটি আকর্ষণের বস্তু। লাল রঙের শালুর উপর বালগোপালের ছোট্ট একটি ধাতু মূর্ত্তি, পিতলের সিংহাসন স্থন্ধ রাখা হয়েছে বেদির এক পাশে কাঠের একটা জলচৌকির উপর। সামনে ঝক ঝকে তকতকে পিতলের একটা পিলসুজের উপর গব্যঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে, ধূপধুনার গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে চারিদিক। ফুল ফল মিষ্টান্নাদি উপকরণ সহযোগে নৈবিদ্যের থালা সাজিয়ে রথতলায় এসে পূজা দিয়ে যাচ্ছে অনেকেই। বেদির নীচে সামনের দিকে প্রকাণ্ড একখানা কানাউঁচু পিতলের থালা, যাত্রীরা সব বেড়ার ধার থেকে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে কানাউঁচু সেই থালাটার উপর। আনি দু-আনি সিকি আধুলি গোটা টাকা ও খুচরো পয়সায় থালাটা প্রায় ভ'রে উঠেছে। ত্রিপুণ্ড্রধারী পূজকঠাকুর ও তাঁর সহযোগী শিষ্য সামন্তের দল কাঁসরঘণ্টা ও রামটাকির শব্দে জায়গাটাকে একেবারে গুলজার ক'রে রেখেছে।

বহুকষ্টে লোকের ভিড় ঠেলে দুলালী গিয়ে বেড়ার এক পাশে দাঁড়ালো। কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে; কত রকমারি লোকই না চোখে পড়লো দুলালীর, কিন্তু মোহনকে সে এ পর্য্যন্ত কোন মতেই খুঁজে বের করতে পারলে না। দুলালী ক্রমশঃ চিন্তিত হয়ে পড়তে লাগলো। একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে সে কাগজের রথখানার দিকে; এওত এক বংহা, বাঙ্গালীদের ঠাকুর। সাঁওতালদের বংহা আর দিকুদের এই ঠাকুরের মধ্যে তফাৎ কি—মনে মনে প্রশ্ন জাগে দুলালীর;—কে জানে তফাৎ কি, দুলালী অত বোঝে না; কিন্তু এত এত

লোক এসে যার সামনে মাথা নুইয়ে একে একে গড় ক'রে যাচ্ছে—সে যে একটা নিশ্চয় কোন বড় রকমের বংহা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই দুলালীর। আর পাঁচটা মারাং বংহার মতই এও হয়ত একটা উঁচুদরের বংহা। বাঙ্গালীদের কত বংহা কত ঠাকুরকেই ত আজ পর্য্যন্ত মেনে চলে সাঁওতালরা, বিশ্বাস করে তাদের অস্তিত্বে বাঙ্গালীদের মতই। কালী বংহা, দুগ্গা বংহা, লক্ষী বংহা, কার্ত্তিক বংহা, অন্নপূন্নো বংহা, আরও কত বংহা-পরবে সাঁওতালরা গিয়ে এক জায়গায় অনন্দ করে বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশে, তাদের এই দেবতা গুলিকে বাঙ্গালীদের চেয়ে সাঁওতালরা ভক্তি কিছু কম করে না। এও হয়ত কাগজের তৈরি সেই রকমের একটা কোন বংহা। নামটা এর ঠিক জানা নাই দুলালীর, সম্ভবতঃ রথ বংহাই হবে। দুলালী মাথা নুইয়ে বার কয়েক গড় করলে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে, মনে মনে প্রার্থনা করলে মোহন আর সুকুরমনির জন্য। কচি মেয়েটার মাথাটা হাত দিয়ে একবার নুইয়ে দিলে রথ বংহার সামনে, এতে তার কল্যাণ হবে; বংহার দয়ায় সুকুর-মনির আলাই বালাই সব দূর হয়ে যাবে। আঁচলের খুঁট থেকে একটা চৌকোণা ডবল পয়সা বের ক'রে পিতলের থালাটার উপর ছুঁড়ে দিলে দুলালী। আর একবার রথ বংহাকে প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে সে মেলার দিকে আবার এগিয়ে চললো।

সার দিয়ে দু'পাশাড়ী বাজার বসেছে। ডান ধারে বড় বড় মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান, ফলের দোকান, মাঝে মাঝে খিলি পান ও তেলেভাজার দোকান। অপর সারিতে সামনাসামনি মনিহারির দোকানগুলি বেশ পরিপাটি সাজানো। তার পাশে বাসনপটি, লোহা-পটি, ষ্টীল ট্রাঙ্ক পাথরের বাসন ও কাটা পোষাকের দোকান। আরও কত রকমারি জিনিসের দোকান সাজিয়ে মেলা জুড়ে বসে আছে বেপারীর

দল। প্রত্যেক দোকানের সামনে অসম্ভব ভিড়, একটা খাবারের দোকান থেকে সামান্য কিছু খাবার কিনে কোলের মেয়েটাকে পেট ভরে খাইয়ে নিলে দুলালী, সারা দিন ওদের খাওয়াই হয়নি। কাটা পোষাকের দোকানে লাল নীল নানা রঙের পিরান বিক্রি হচ্ছে; দুলালী একটা দোকানের সামনে থমকে একটু দাঁড়ালো, সুকুরমনির জন্যে জামা সে একটা কিনেই নেবে নাকি? পয়সা কড়ি কিছু তার সঙ্গেই আছে। কিন্তু মোহনের দেখা না পেয়ে ভয়ানক মুসড়ে পড়েছে দুলালী, কোন কিছুই তার ভাল লাগছে না, দোকানের সামনে একপাশে দাঁড়িয়ে মোহনের কথাই সে ভাবতে লাগলো, কাল থেকে লোকটা গেল কোথায়? দোকানের একটা লোক দুলালীকে লক্ষ্য ক'রে বললে,—কি বিবি মেঝেন, সায়া সেমিজ চাই কিছু? দুলালী একটা রঙিন দেখে জামা কিনে নিলে সুকুরমনির জন্যে, জামার দাম মিটিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওটা পরিয়ে দিলে সুকুরমনির গায়ে। লাল টুকটুকে ছোট্ট একটি পেনি, চমৎকার কিন্তু মানিয়েছে সুকুরমনিকে, দুলালীর মনটা সত্যিই খুব খুশী হয়ে উঠলো। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কাঠের একটা পুতুল, কাগজের ফুল, ছোট ছোট গোটা কয়েক খেলনা কিনে ফেললে দুলালী সুকুরমনির জন্য। পাশেই এক ভালুকওয়ালা ডুগডুগি বাজিয়ে ভালুকের নাচ দেখাচ্ছিলো, অসংখ্য লোক তার চারদিক থেকে ভালুকওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। দুলালী গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে চারিদিক বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখে নিলে একবার; কিন্তু না, মোহন মাঝি এদের মধ্যে নাই। মেলার প্রায় সব জায়গাই খুঁজে দেখা হলো, মোহনের কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না। ভাবতে ভাবতে দুলালী আবার এগিয়ে চললো।

মেলার একপাশে মাঝারি রকমের একটা তাঁবু খাটানো। তাঁবুর চারিদিক মার্কিন কাপড় দিয়ে ঘেরা, তাঁবুর সামনে লাল সালুর উপর

বড় বড় হরপে লেখা আছে—'দি গ্রেট ইষ্টার্ণ ম্যাজিক পার্টি।' আশে পাশে তাঁবুর গায়ে কতকগুলো অদ্ভুত ধরণের ছবি আঁকা, ম্যাজিক পার্টির চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। তাঁবুর বাইরে বাঁশের মাচানের উপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা লোক মুখোস পরে আর চুন কালি মেখে নানা রকম খেলা দেখাচ্ছে, টাটক বাজির খেলা। প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা মুখোস পরা একটা লোক নানা রঙের তালি মারা একটা আলখাল্লা গায়ে দিয়ে তাঁবুর সামনে মাচানের উপর দাঁড়িয়ে আছে দরজার ঠিক পাশেই, গলায় তার প্রকাণ্ড একটা সাপ জড়ানো। দুহাতে দু'টো বড় বড় রামচাকি, ঝাঁই-ঝপক ঝাঁই-ঝপক শব্দে রামচাকি বাজিয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গিমায় মাচানের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে লোকটা। মাথা দুলিয়ে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করতে করতে রামচাকির তালে তালে সেকি তার নাচ! হাজার লোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে ভুঁড়িওয়ালার দিকে। মানুষের মনের অবস্থা কতখানা উদ্দাম ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠলে এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এমন ধারা উৎকট নাচ সে অনায়াসে নেচে যেতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে— সত্যিই তা ভেবে দেখবার কথা। তামাসা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য যত রকম অভিনব পন্থা থাকতে পারে—এরা তার কোনটাই বাদ দেয় নি।

নাচনদার এই লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে লোহার কয়েকটা রিং নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে আর একটা লোক। রিং গুলোকে একটা একটা ক'রে পৃথক ভাবে দেখিয়ে একটাকে আবার আর একটার মধ্যে অদ্ভুত উপায়ে গলিয়ে দিচ্ছে লোকটা চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। রিং এর গায়ে রিং গলিয়ে হাতে পায়ে নানান জায়গায় নিজেকে একেবারে নাগপাশের মত জড়িয়ে ফেলছে লোকটা, আবার ওয়ান টু থ্রি বলতে না

বলতে এক লহমায় সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে দেহের উপর ঈষৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে। এই ধরণের আরও কত রিং এর খেলা, লোকটার কিন্তু কেরামতি আছে।

রিংওয়ালার পাশে আর একজন বাজিকর লাল রঙের টুকরো কাগজ মুখে পুরে নলের আকারে গোটা কাগজ টেনে বের করছে দর্শকদের সামনে। দেখতে দেখতে মাচানের উপর স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে রঙিন কাগজ, নল ধরে যত টান দেয় কাগজ যেন বাড়তে থাকে ততই। দর্শকরা হাঁ ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাজিকরের দিকে, এত কাগজ ওর মুখের মধ্যে ছিলো কোথায়,—আশ্চর্য্য! তাঁবুর বাইরে মাচানের উপর বাজিকরদের এই খেলাগুলো—এ নাকি তাদের অত্যাশ্চর্য্য যাদুবিদ্যা ও ভৌতিক ইন্দ্রজালের সামান্য কিছু নমুনা মাত্র। কে জানে তাঁবুর মধ্যে 'দি গ্রেট ইষ্টার্ণ ম্যাজিক পার্টি'র' আরও কত অদ্ভুত খেলা ও অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রজালের নিদর্শন পর্দার অন্তরালে দর্শকদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছে।

ড্রিম্ ড্রিম্ শব্দে জয় ঢাক বাজছে তাঁবুর বাইরে, তার সঙ্গে গলায় সাপজড়ানো ভুঁড়িওয়ালা সেই মুখোস পরা লোকটার উৎকট নাচ আর ঝাঁই-ঝপক ঝাঁই-ঝপক রামচাকির আওয়াজ। তাঁবুর ফটকে দাঁড়িয়ে তালিমারা পাতলুন পরা আর একটা লোক ধরাগলায় প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার ক'রে যাচ্ছে দর্শকদের লক্ষ্য ক'রে,—চার চার পয়সা—চার চার পয়সা—অদ্ভুত যাদুবিদ্যা ভৌতিক ইন্দ্রজাল—চার চার পয়সা। শূন্যে নরমুণ্ডের আবির্ভাব—প্রেত ও প্রেতিনীর ভয়াবহ সঙ্ঘর্ষ—তাল-বেতালের কথোপকথন—চার চার পয়সা—চার চার পয়সা। যাদু সম্রাট ছিনিবাস মাইতির অদ্ভুত তাসের খেলা, জীবন্ত সর্প ভক্ষণ, হাত পা বন্ধ অবস্থায় তালাআঁটা তোরঙ্গের মধ্যে থেকে আকস্মিক অন্তর্দ্ধান, চার চার পয়সা—

চার চার পয়সা। পারাবতের অদ্ভুত স্মৃতি শক্তি, হনুমান ও হনুমানীর সাঁওতাল নাচ, রামছাগলের ঘোড়দৌড়, টিঁয়া পাখীর কামান দাগা, চার চার পয়সা—চার চার পয়সা—টিকিটের দাম চার চার পয়সা। এমন খেলা আর হবে না—চার চার পয়সা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না—চার চার পয়সা।

বিস্তর লোক জমে গেছে ম্যাজিক পার্টির তাঁবুর সামনে। নগদ এক আনা মূল্যে টিকিট খরিদ ক'রে দলে দলে লোক ঢুকছে তাঁবুর মধ্যে ম্যাজিক দেখতে। দুলালী চুপ চাপ এসে দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর এক পাশে। বহুক্ষণ থেকে যাত্রীদের আনাগোনা সে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে। কতলোকই ত এর মধ্যে এলো, চার পয়সার টিকিট কিনে একে একে ঢুকে পড়লো সব তাঁবুর মধ্যে। আবার কতলোক তাঁবুর সামনে ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিনা পয়সায় রকমারি টাটকবাজির শুধু নমুনাগুলো দেখে নিয়েই যে যার আপনার সরে পড়লো কে কোন্ দিকে। কত অচেনা লোক এলো গেল দুলালীর চোখের সামনে দিয়ে, কিন্তু যার খোঁজে তার মেলা দেখতে আসা সে লোকটিকে খুঁজে বের করা কোন রকমেই সম্ভব হলো না দুলালীর পক্ষে। কে জানে, মোহন যদি এর মধ্যে মেলা দেখা শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে থাকে। এমনও ত হতে পারে দুলালী বাড়ী থেকে রওনা হওয়ার পর মোহন গিয়ে ধাওড়ার সামনে একলাটি বসে আছে তারই অপেক্ষায়। সারা মেলা খোঁজাখুঁজি ক'রেও যখন তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন এমনটা হওয়া আশ্চর্য্য নয় মোটেই। দুলালীর মনটা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলো, ধাওড়ায় তাকে ফিরে যেতে হবে; বেলাও যে আর বেশি নাই, এইবেলা চটপট রওনা না হলে ফিরতে হয়ত রাত হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে দুলালী, তাঁবুর মধ্যে ম্যাজিক পার্টির খেলা সুরু হলো।

মানুষের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে দুলালী এগিয়ে চললো বাইরের দিকে। মেলার মাঝখান দিয়ে কাগজের রথখানাকে তখন দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এধার থেকে ওধার, আবার ওধার থেকে এধার পর্য্যন্ত। কতলোক যে রথের দড়ি ধরে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অহেতুক ব্যস্ততার সঙ্গে কাগজের রথখানাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া আরম্ভ করেছে তার ইয়ত্তা নাই; এই ওদের আনন্দ, এই ওদের সখ; এই হলো এখানকার নিয়ম। কতবার যে ধাক্কা খেলে দুলালী মেলা থেকে বেরোবার সময় কে তার হিসাব রাখবে। যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেও ভিড় ঠেলে তাকে এগিয়ে যেতে হলো, এক মূহুর্ত্ত আর অপেক্ষা করা চলে না। মেলার এক প্রান্তে এসে দুলালী একটুখানি ফাঁকার মধ্যে দাঁড়ালো, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো যেন এতক্ষণে। এধারটায় সাঁওতালদের নাচগান চলছে, মেঝেনরা সব একসঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে নাচছে, আর মাঝিরা তাদের নাচের তালে তালে মাদল বাজাচ্ছে, সেই সঙ্গে মিঠেস্বরে আড়বাঁশি বাজছে মেঝেনদের গানের সুরে সুর মিলিয়ে। দুলালীর মনে হলো মেলা থেকে বেরোবার আগে নাচগানের আসরগুলো আর একবার দেখে যাবে নাকি। কিন্তু বার দুই তিন তন্ন তন্ন ক'রে ওগুলো খুঁজে দেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে মোহন মাঝিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি পাথরডি কলিয়ারি থেকেই দু'তিনটে দল নাচ করতে এসেছে এই ঝরিয়ার মেলায়, মোহন কিন্তু তাদের মধ্যে নাই। নাচগানের সে পাশ মাড়ায়নি, আশ্চর্য্য।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাচ্ছে দুলালী, মেলার একপ্রান্তে সে প্রায় এসে পড়েছে। সামনে একটা নাগরদোলা, দোলার খাটলাগুলো বন্ বন্ শব্দে ঘুরে চলেছে উপর থেকে নীচে আবার নীচে থেকে

পারের দিকে। এক এক খাটলায় দু'জন ক'রে লোক, পরমানন্দে তারা ঘুরপাক খাচ্ছে নাগরদোলায় চড়ে। দুলালীর হঠাৎ চোখে পড়লো একটা খাটলায় মোহন মাঝি দিব্যি আরামসে গ্যাট হয়ে বসে আছে খাটলা ঠেস দিয়ে, সামনে তার একেবারে মুখোমুখি বসে সুন্দরা বাউরীন। নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে হাসির চোটে যেন ফেটে পড়ছে সুন্দরা, ভাওয়ালিয়া সুরে সে গান ধরেছে মোহনের একদম কানের কাছে বসে। মোহন মাঝি সুন্দরার মুখের দিকে চেয়ে আড়বাঁশি বাজাচ্ছে তার গানের সুরে সুর মিলিয়ে। দুলালী থমকে একেবারে দাঁড়িয়ে গেল নাগরদোলার সামনে, তার বুকের ভিতরটায় মন মোচড় দিয়ে কে টানছে। মোহন তাহলে মেলা দেখে ফিরে যায়নি, সুন্দরাকে নিয়ে এখনো মশগুল হয়ে আছে এই মেলার মধ্যেই। কিন্তু সুন্দরার ওই শাড়ীখানা, ও শাড়ী যে দুলালীর জন্য কিনে এনেছিল মোহন। দুলালীর চোখ দুটো যেন ঝলসে যেতে লাগলো, সুন্দরাকে দেখেই বিষিয়ে উঠলো তার সর্ব্বাঙ্গ। রঙিন ওই শাড়ীখানা পরে মোহনের সঙ্গে মেলা দেখতে আসবার কথা আজ দুলালীর, সুন্দরা তার সে অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু সে নিয়ে আর আক্ষেপ করা বৃথা, সুন্দরা বাউরীন মোহনকে একেবারে যাদু ক'রে ফেলেছে। তুলে বুড়ীর কথাগুলো কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল আজ, একবর্ণ সে মিথ্যে বলেনি; মটুকধারী সিংএর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ক'রে কাল রাত্তির থেকেই মেলায় এসে আড্ডা গেড়েছে ওরা। দুলালীর কথা হয়ত একেবারে ভুলে গেছে মোহন। কিন্তু চোখের সামনে এ দৃশ্য যে আর সইতে পারছে না দুলালী, সুন্দরার সঙ্গে নাগরদোলায় চড়ে এইভাবে যে মেলা ময়দানে ফুর্ত্তি ক'রে বেড়াবে মোহন, দুলালীর পক্ষে এ অসহ্য। নাগরদোলা বন্ বন্ শব্দে ঘুরে চলেছে, দুলালী হঠাৎ

খাটলাগুলোর দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে ডেকে উঠলো,—মো
মোহন !

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই মোহনের। দুলালীর সঙ্গে হ
চোখোচোখি হয়ে গেল সুন্দরার; নাগরদোলার উপর থেকেই
হো ক'রে হেসে উঠলো সুন্দরা দুলালীকে দেখে। ক্ষোভে দু
অপমানে দুলালীর সর্ব্বাঙ্গ যেন রি রি ক'রে উঠলো। নাগরদোল
অধিকারী দোলা থামিয়ে দিয়ে একে একে লোকগুলোকে নাি
দিতে লাগলো, আরও কতকগুলো নতুন লোক ঠেলাঠেলি ক'
উঠে বসলো দোলার উপর। সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরু হয়ে গে
নাগরদোলার উঠা নামা, খাটলাগুলো বন্ বন্ শব্দে ঘুরতে লাগ
নবাগত যাত্রীদের নিয়ে।

নাগরদোলা থেকে নীচে নেমে সুন্দরা কয়েক পা এগিয়ে যেতে
মোহনও তার পিছু ধরলে। মোহনের ঘন ঘন পা টলছে, নেশ
তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। সুন্দরা হঠাৎ মোহনের দি
চেয়ে বলে উঠলো,—তোর বৌ যে তোকে নিতে এসেছে, বৌএ
আঁচল ধরে নাচতে নাচতে এবার ঘরে যাবি না ?

মোহন নেশার ঘোরে টানা সুরে বলে যেতে লাগলো,—বৌ-
আমার আবার বৌ কুথা পেলি ! তুই শালীকে শাড়ী পরালুম—ম
খাওয়ালুম—এক গেঁজে টাকা দিলুম মেলা দেখতে, -ইসময় আবা
বৌ কুথা খুঁজে বেড়াব।

সুন্দরা মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠলো,—আ মরণ !

মোহন টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে সুন্দরার শাড়ীর আঁচলাটা হঠা
চেপে ধরলে, বললে,—ইদিকে আয়—মাইরি বলছি ইদিকে আয়—
ভাঁল চাস ত ইদিকে আয় বলছি।

সুন্দরা টান মেরে শাড়ীর আঁচলটা ছাড়িয়ে নিলে মোহনের হাত থেকে। মোহন একটু রুখে উঠলো, দুলালী গিয়ে পিছন দিক থেকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে মোহনকে। মোহন হঠাৎ পিছন ফিরে বলে উঠলো,—কে ?

দুলালীকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠলো মোহন, বললে,—তুই—তুই আবার কিসকে এলি ই-সময়ে ?

দুলালী বললে,—ঘরে ফিরে যাবি চল, তোকেই আমি খুঁজতে এসেছি।

মোহন মাঝি নেশার ঘোরে চোখ তেড়ে বলে উঠলো,—ঘর—কার ঘর ? ঘর না আর কিছু, যা—যা—চলে যা তুই এখান থেকে।

মোহন একটা ঝাঁকানি দিয়ে দুলালীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে, তারপর সে টলতে টলতে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। এর মধ্যে সুন্দরা হঠাৎ কোন্ দিক দিয়ে সরে পড়েছে। সুন্দরাকে দেখতে না পেয়ে মোহন আবার বেতালা সুরে হাঁক দিতে আরম্ভ করলে,—সুন্দরা—সুন্দরা !

দুলালী গিয়ে আবার ধরে ফেললে মোহনকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মেলা থেকে যেমন ক'রে হোক মোহনকে বের ক'রে নিয়ে যেতে হবে ; দুলালী একটু মিনতির সুরে বললে,—আর মাতলামি করিস না মোহন, চল এবার ঘরে ফিরে চল।

মোহনের হঠাৎ চোখে পড়লো সুকুরমনি দুলালীর কোল থেকে মোহনের দিকে হাত বাড়াচ্ছে আর খিল খিল ক'রে হাসছে নিজের মনেই। মোহন স্থিরভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো মেয়েটার দিকে, তারপর সে একটুখানি হেসে বললে,—আর একবার হাস ত বিটি, সেড়্ দিব হাস,—হিহিহিহি—।

মোহনের হাসি দেখে মুকুরমনিও হিহি ক'রে হেসে উঠলো সেই সঙ্গে মোহনও হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো দুলালীর গায়ে। মোহনের পা টলছে, হাত ধরে তার টানতে টানতে দুলালী বললে,—চল আর দেরি করিস না, বেলা যে গেল—ঘরে ফিরবি কখন!

মোহন আবার পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললে,—না, সুন্দরাকে না নিয়ে আমি ফিরবো না কিছুতেই, যা—যা—এখন বিরক্ত করিস না।

এই বলে মোহন মেলার মধ্যেই ধপ্ ক'রে বসে পড়লো এক জায়গায়। নিজের মনেই সে নেশার ঝোঁকে বলে যেতে লাগলো, —সুন্দরা, সুন্দরা, মাইরি বলছি ফিরে আয়; পেটভরে মদ খাওয়াব—ফিরে আয়। মটুকধারী করবে আমাদের কচু, জানটি রেখে মেরে ফেলবো না শালাকে!

দুলালী আবার ডাক দিলে,—মোহন!

মোহন বলেই যেতে লাগলো,—শালা আবার সুন্দরাকে বলে—আর যদি তোর মুখ দেখি ত আমি ছত্তি থেকে খারিজ। আরে ছি ছি ছি ছি—তুই শালা আবার ছত্তি হলি কবে থেকে! সুন্দরা—সুন্দরা!

দুলালী ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়লো, মোহন যে রকম মাতলামি সুরু করেছে তাতে পাথরডি পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে যাওয়া ভয়ানক মুস্কিল হবে। দুলালী এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, চেনা শোনা যদি কারো সাহায্য পাওয়া যায়, মোহনকে একলা এ অবস্থায় বাড়ী নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। দুলালী এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, হঠাৎ তার চোখে পড়লো কে একটা লোক,—মুড়ি-মুড়কির দোকানের সামনে বসে কে ও লোকটা? দুলালী হঠাৎ চমকে উঠলো, ও যে রাবণ মাঝি, দুলালীর বাবা! রাবণ মাঝির পাশে বসে জনচারেক তার দেশের লোক, একসঙ্গে বসে পাতার

ঠোঙায় ক'রে সব মুড়ি খাচ্ছে। কি সর্ব্বনাশ, দুলালীর সন্ধানেই হয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা; হঠাৎ আজ এই মেলার মধ্যে ধরা পড়ে যাবে নাকি দুলালী? না—না—ধরা দেওয়া হবে না, যেমন ক'রে হোক পালাতে হবে। কিন্তু রাবণ মাঝির মুখখানা ভয়ানক শুকনো দেখাচ্ছে, আর যেন সে চেহারা নাই; পাঁজরের হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, চুলগুলো বেবাক পেকে উঠেছে রাবণ মাঝির, একেবারে পেকে উঠেছে। দুলালী দূর থেকে রাবণ মাঝির অবস্থা দেখে হু হু ক'রে কেঁদে ফেললে। পরক্ষণেই আবার সে সজাগ হয়ে উঠলো, ওদের হাতে ধরা দেওয়া চলবে না, মেলা থেকে পালাতে হবে। মোহন নেশার ঝোঁকে সেই ভাবেই চীৎকার ক'রে যাচ্ছে এখনো,—সুন্দরা—সুন্দরা!

দুলালী মোহনের হাত ধরে টান দিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে দাঁড় করিয়ে দিলে, কানে কানে তার চাপা গলায় বলে উঠলো দুলালী,—সুন্দরা যে তোকে একলা ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে, ওই দেখ সামনের দিকে—পারিস ত ওকে ধর এই বেলা।

মোহন হঠাৎ চকিতের মত বলে উঠলো,—কৈ—কৈ—কোন দিকে?

দুলালী বললে,—ঐ যে—আয় আমার সঙ্গে।

মেলা থেকে বেরিয়ে দুলালী সোজা একেবারে পাথরডির পথ ধরলে। মোহনের হাত ধরে টানতে টানতে বহু কষ্টে সে মাইল দুয়েক পথ হেঁটে উঠলো গিয়ে পাথরডির সড়কে। এতক্ষণে দুলালীর ধড়ে যেন প্রাণ এলো। রাবণ মাঝিকে ওরা অনেক দূরে ছেড়ে এসেছে, আর কোন ভয় নাই। পথ কিন্তু এখনো অনেকখানা। মোহন আবার মাতলামি সুরু করলে, দুলালীর ধাপ্পায় ভুলে একটি পাও সে আর এগুতে রাজি নয়, সুন্দরাকে তার চাই। সড়কের উপর আবার ধপ্‌ ক'রে বসে পড়লো মোহন।

সূর্য্য তখন একেবারে ডুবে গেছে, দুলালী বহু সাধ্য সাধনা ক'রেও মোহনকে আর কোন মতেই ওঠাতে পারছে না। রাস্তায় মেলাফেরত যাত্রীদের ভিড় লেগে গেছে, মোহন তাদের লক্ষ্য ক'রে মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে উঠছে,—সুন্দরা,—সুন্দরা!

দুলালী চুপি চুপি মোহনকে জানালে রাবণ মাঝি তাদের খোঁজে বেরিয়েছে, ঝরিয়ার মেলা পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে সে সঙ্গে কয়েক জন লোক নিয়ে। রাস্তার মাঝখানে ধরা পড়ে গেলে ভয়ানক বিপদ, দুলালী সে কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে মোহনকে। মোহন কিন্তু ইস্তক মাতাল হয়েই আছে, অতিরিক্ত মদ খেয়ে তার মাথাটা গেছে একেবারে বিগড়ে। রাবণ মাঝির নাম শুনে হঠাৎ যেন সে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলো, বললে,—চল্—চল্ তবে—সোজা একেবারে উঠবো গিয়ে পাথরডিহির খাদে।

দুলালীর কোলে সুকুরমনি ঘুমিয়ে পড়েছে। মোহনের হাত ধরে সড়কের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলে দুলালী। মোহনের কিন্তু নেশা ছুটেনি, সুন্দরার কথা কোনরকমেই সে ভুলতে পারছে না। সুন্দরার নাম ক'রে মাঝে মাঝে আবোল তাবোল বকে যাচ্ছে মোহন। রাস্তায় ভয়ানক লোকজনের ভিড়, যানবাহনেরও চলাচল কিছু বেশি, দুলালী খুব সাবধানে মোহনের হাত ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো। টলতে টলতে রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে মোহন, হঠাৎ একটা এক্কাগাড়ী ঘর্ ঘর্ শব্দে এগিয়ে এসে মোহনের ঠিক পিছনে দাঁড়ালো; জোরগলায় হেঁকে উঠলো কোচোয়ান,—এই বেটা মাতাল, হঠো হিঁয়াসে।

মোহন হঠাৎ রুখে উঠলো পিছন ফিরে, বললে,—কোন্ শালা মাতাল বলে, কারো বাবার পয়সায় মদ খেয়েছি নাকি।

কি মাতাল লোকের সঙ্গে বচসা ক'রে কোন লাভ নাই দেখে কোচোয়ান একটু পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। মোহনের হাত ধরে রাস্তার ধার দিকে তাকে টানছে দুলালী; মোহন কিন্তু কোনমতেই পথ ছাড়বে না, নেশায় সে একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। এক্কাগাড়ীর উপর থেকে কে একটা লোক হঠাৎ জোর গলায় হেঁকে উঠলো,—মারো শালাকে—লাগাও চাবুক, মাতলামি করবার আর জায়গা পাওনি শালা!

মোহন হঠাৎ চেয়ে দেখে সুন্দরা আর মটুকধারী সিং পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে পাশাপাশি বসে আছে এক্কাগাড়ীর উপর। সুন্দরা মটুকধারীর কাঁধের উপর ডানহাতটা এলিয়ে দিয়ে গাড়ীর উপর বসে বসে দিব্যি আরামসে বাঁ-হাত দিয়ে একটা সিগারেট টানছে। মোহনের মাথায় যেন খুন চেপে গেল, জোর গলায় সে হেঁকে উঠলো,—সুন্দরা—সুন্দরা—ইধার আও শালী।

কোচোয়ান মোহনকে পাশ কাটিয়ে গাড়ীটা খানিক এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। মোহন হঠাৎ দুলালীর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে ঘোড়ার লাগামটাকে শক্ত ক'রে টেনে ধরে জোর গলায় বলে উঠলো,—রোখো—রোখো গাড়ী, খবরদার।

গাড়ীর উপর থেকে গর্জ্জে উঠলো মটুকধারী সিং,—মার ডালো—মার ডালো শালাকো।

কোচোয়ান মোহনের হাত থেকে টান মেরে ছাড়িয়ে নিলে ঘোড়ার লাগামটা। টলতে টলতে সুন্দরার দিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে সুন্দরার শাড়ীর আঁচলটা চেপে ধরলে মোহন, বললে,—কোন্ বাপের টাকায় শাড়ী পরে মেলা দেখতে গিয়েছিলি হারামজাদী। ভাল চাস ত নেমে আয়—নেমে আয় বলছি গাড়ী থেকে।

মটুকধারী সিং কোচয়ানের হাত থেকে চাবুকটা হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো,—তবে রে শালা মাতাল, মাতলামি তোর ঝেড়ে দিচ্ছি থাম্।

মোহনকে লক্ষ্য ক'রে মটুকধারী চাবুকটা যেই উঁচিয়ে ধরেছে দুলালী গিয়ে অমনি তাড়াতাড়ি মটুকধারীর সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো,—খবরদার, গায়ে যদি ওর হাত দিয়েছিস—কামড়ে তোর গলাটা এখনি ছিঁড়ে ফেলবো।

সুন্দরা মোহনের হাত থেকে শাড়ীর আঁচলটা টানতে টানতে বললে,—ছাড় খালভরা ছাড়, ঝেঁটিয়ে এখনি বিষ ঝেড়ে দিব না!

দুলালী গিয়ে মোহনের হাত ধরে তাকে সুন্দরার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। মোহন হঠাৎ সুন্দরার বাঁ হাতটা চেপে ধরে বললে,—নেমে আয় শালী—নেমে আয়।

সুন্দরা হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—তবে রে আঁটকুড়ো, তোর মাতলামির নিকুচি করেছে; ভাগ্ হারামজাদা—ভাগ্।

এই বলে সুন্দরা গাড়ীর উপর থেকে মোহনের বুকে ঝেড়ে দিলে জোরসে একটা লাথি, পিছন দিকে ছিটকে পড়লো মোহন রাস্তার একপাশে। মটুকধারী বলে উঠলো,—হাঁকাও গাড়ী—জোরসে।

সুন্দরা আর মটুকধারীকে নিয়ে এক্কাগাড়ী আবার ছুটে চললো পাথরুডির পাকা সড়ক ধরে।

রাস্তার উপর একেবারে গড়িয়ে পড়েছে মোহন, মাথার পিছন দিকটায় বেশ খানিকটা চোট লেগেছে। দুলালী বহুকষ্টে টেনে তুললে মোহনকে, মোহনের অবস্থা দেখে তার কান্না পাচ্ছে; কিন্তু প্রতিকারের উপায় নাই, দুলালী শুধু ফুঁপিয়ে একবার কেঁদে উঠলো মোহনের দিকে চেয়ে। সুন্দরা আর মটুকধারী দূর থেকে হো হো ক'রে একবার হেসে

উঠলো, একাগাড়ীর শব্দ এখনো শোনা যাচ্ছে। মোহন ধীরে ধীরে দুলালীর গায়ে হাত রেখে বললে,—কাঁদছিস ?

দুলালী বললে,—ঘর চল, রাত হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করলে মোহন, এখনো তার একটু একটু পা টলছে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ধপ্ ক'রে আবার বসে পড়লো মোহন, দেহে তার এতটুকু শক্তি নাই, রাস্তার ধারে বসে হঠাৎ সে বমি করতে আরম্ভ করলে; দুলালীর দিকে চেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—একটু জল।

এখানে কিন্তু জল পাবার কোন উপায় নাই, আঁচল দিয়ে মোহনের মুখটা শুধু মুছিয়ে দিলে দুলালী। ধীরে ধীরে আবার উঠে দাঁড়ালো মোহন, দুলালীর গলাটা সে বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁধে তার ভর নিয়ে বললে,—চল্, দেখি যদি কোন রকমে হাঁটতে পারি।

মোহনের পক্ষে এ অবস্থায় এতটা পথ হেঁটে যাওয়া কিন্তু সম্ভব নয়। দুলালী বেশ শক্ত করে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মোহনকে, পাথরডির পথ ধরে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। অন্ধকারে চারিদিক ঝাপসা হয়ে গেছে, লোক জনের রহট অনেকটা কমে এসেছে। কিছু দূর গিয়েই মোহন আবার বসে পড়লো, বললে,—পা গুলো আমার কাঁপছে।

দুলালী বললে,—থাম্, দেখি।

পাথরডি থেকে একখানা রিক্সা গাড়ী ঠন্ ঠন্ শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে ঝরিয়ার পথ ধরে এগিয়ে আসছে। খালি গাড়ী দেখে রিকসার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো দুলালী, বললে,—এই থাম্, পাথরডি ভাড়া যাবি ?

রিকসাওয়ালা জবাব দিলে,—বারো আনা পয়সা লাগবে।

দুলালী বললে,—তাই দিব, চল্।

মোহন আর দুলালীকে গাড়ীর উপর তুলে নিয়ে রিক্‌সাওয়ালা আবার পাথরডির পথ ধরে টুং টুং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে চললো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুলালীর কোলে মাথা রেখে রিক্‌সার উপর ঘুমিয়ে পড়লো মোহন। রাত তখন প্রায় প্রহর খানেকের কাছাকাছি।

আট

পাথরডি কলিয়ারির ধাওড়া। মোহনের কাজকর্ম্ম আবার যথারীতি সুরু হয়ে গেছে। সুন্দরা বাউরীনের সঙ্গে মেলা মেশা করাটা বেশ ভাল হয়নি, মেলা থেকে ফিরে আসবার পর মোহন সে কথা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। দুলালীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিয়েছে মোহন, দুলালীর গা ছুঁয়ে সে প্রতিজ্ঞা করেছে—জীবনে কখনো ও পথে আর পা বাড়াবে না; ও সব দুশ্চরিত্রা বজ্জাত মেয়ের পাল্লায় যারা পড়ে তাদের মত বেকুব আর দু'টি নাই। সুন্দরার খপ্পরে পড়ে রীতিমত শিক্ষা হয়ে গেছে মোহনের, দুলালীকে মোহন কথা দিয়েছে আবার সে ভাল হয়ে উঠবে। ভুল সে একটা সত্যিই ক'রে ফেলেছে, ভয়ানক মারাত্মক ভুল; বাউরীর মেয়ের সঙ্গে মদের ভাঁড়ে একসঙ্গে চুমুক দিয়েছে মোহন, সুন্দরার হাতের রান্না পর্য্যন্ত সে মদের সঙ্গে চাট ক'রে খেয়েছে। কি ভয়ানক কথা, সুন্দরাকে নিয়ে ক'দিন ধরে কি কেলেঙ্কারিটাই না করলে মোহন। হয়ত এ একরকম ভালই হয়েছে, এমন ধারা একটা ঘা না খেলে মোহন হয়ত ক্রমশঃ আরও নীচের দিকেই নেমে যেতো।

দুলালীর মনটা আজ ক'দিন থেকে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মেলা থেকে ফিরে আসার পর মাঝে মাঝে কেবলই তার মনে পড়ছে দেশের

কথা মা বাপ ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের কথা, পিছনে ফেলে আসা তার সারা জীবনের কথা। বিশেষ ক'রে যাকে তার আজ মনে পড়ছে, বুড়ো বাপের কথা স্মরণ ক'রে চোখ ফেটে আজ জল আসছে দুলালীর। ঝরিয়ার মেলায় সেদিন রাবণ মাঝির অবস্থা সে নিজের চোখে দেখে এসেছে, ভীমের মত চেহারা শুকিয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেছে। সেই দিনই মনে হয়েছিলো দুলালীর ছুটে গিয়ে একবার রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ায়, রাবণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে তার মাথা রেখে ফুঁপিয়ে খানিক কেঁদে আসে। কিন্তু উপায় নাই, সমাজের চোখে দুলালী যে আজ অপরাধী, আর রাবণ মাঝি সেই সমাজেরি একজন মাতব্বর। এতকাল পরে আজ যদি রাবণ মাঝি তার স্নেহের দাবি নিয়ে দুলালীকে শুধু চোখের দেখা দেখতে আসতো, দুলালী আজ পরম আগ্রহে ছুটে গিয়ে দাঁড়াতো তার সামনে, দু'দিন তাকে নিজের কাছে রেখে বুড়ো বাপের একটু সেবা যত্ন ক'রে দুলালী আজ ধন্য হয়ে যেতো। কিন্তু সমাজের চোখে দুলালী যে অপরাধী, তাই রাবণ মাঝি ক্ষমা তাকে করতে পারেনি আজো; ক্ষমা যদি করতো তাহলে সে দল বেঁধে এমন ভাবে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতো না দুলালীর খোঁজে। ভালুকপোতার লোক পর্য্যন্ত সঙ্গে এসেছে রাবণ মাঝির, এর মধ্যে যে তাদের একটা কোন মতলব আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। টুয়াই মাঝি সোজা লোক নয়, তারই ইঙ্গিত হয়ত আজ রাবণ মাঝিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, হয়ত ওরা জোট পাকিয়ে দুলালীকে ধরে নিয়ে যেতেই এসেছে; হয়ত কেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ধরা ওদের হাতে দেওয়া চলবে না কোন মতেই। নিজের জন্য খুব বেশি ভাবে না দুলালী, কিন্তু দুলালীকে ওরা ধরে নিয়ে গেলে মোহনের যে দাঁড়াবার আর ঠাঁই নাই। সমাজ যদি কোনদিন দুলালীকে ক্ষমাও করে কোন গতিকে, মোহনকে ওরা কোন মতেই

ক্ষমা করবে না ; দুলালীর এ দৃঢ় বিশ্বাস। কি হবে আর সে সমাজে ফিরে গিয়ে, দুর্ভোগ তাতে বাড়বে বই কমবে না। সুখে হোক দুঃখে হোক মোহনের ভিটে আঁকড়েই পড়ে থাকতে হবে দুলালীকে, এ ছাড়া যে আর পথ নাই।

মোহনের জন্য অনেক কিছু সহ্য করেছে দুলালী, সব কিছু সহ্য করতেও সে রাজি, কিন্তু মোহনের এতটুকু অবহেলা তার পক্ষে অসহ্য। তাই ঝরিয়ার মেলা থেকে ফিরে আসবার পর তিনদিন কথা কয়নি দুলালী মোহনের সঙ্গে, দুলালীর কাছে ক্ষমা চেয়ে অনেক সাধাসাধি ক'রে দুলালীর সঙ্গে আবার ভাব করতে হয়েছে মোহনকে। দুলালীকে শেষ পর্য্যন্ত সব কিছুই আবার সয়ে নিতে হয়েছে ; মোহনকে ছেড়ে যাবার যে তার উপায় নাই। সে চেষ্টাও ত একবার করেছিলো দুলালী, রথ-পরবের দিন ভোর বেলা উঠে মোট পৌটলা বেঁধে পাথরড়ি থেকে চুপি চুপি সরে পড়বার সে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু মোহনের এই ধাওড়ার মায়া সে কাটাতে পারলে কই। এ মায়া যে সারা জীবনের মায়া, এ বাঁধন কি কোন দিন আর খুলতে পারবে দুলালী? তাই সেদিন রথের মেলায় রাবণ মাঝিকে দেখে দুলালী যেন আঁতকে উঠেছিলো, লোকে যেমন চোখের সামনে বাঘ ভালুক দেখে আঁতকে উঠে ভয়ে। আজ ক'দিন থেকেই দুলালী তাড়া দিচ্ছে মোহনকে পাথরডি থেকে তাদের পালাতে হবে, মোহনও আজ ক'দিন থেকে সেই কথাই ভাবছে। রাবণ মাঝি শেষ পর্য্যন্ত যদি পাথরডি পর্য্যন্ত এসেই পড়ে। মোহনের উপর ততটা হয়ত জুলুম খাটবে না তার, কিন্তু দুলালী যে রাবণ মাঝির মেয়ে, দুলালীকে হয়ত সে ধরে নিয়ে যাবে। মোহন তাই ঠিক করেছে পাথরডি থেকে একবার সরতেই হবে, চলে যাবে আরও খানিক পশ্চিমে,

হাজারিবাগ অঞ্চলে। সেখানকার এক আড়কাঠির সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেছে মোহনের, অভ্রের খনিতে গিয়ে কাজ করবে মোহন, এর চেয়ে ঢের ভাল কাজ। এখানকার ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা পয়সা কিছু পাওনা হয়েছে মোহনের, এই হপ্তায় টাকাগুলো আদায় ক'রে নিয়ে চুপি চুপি সে সরে পড়বে। দুলালীকে তিন বেলা ভরসা দিচ্ছে মোহন, পুরোপুরি আড়াইটা বছর এইভাবেই যখন কেটে গেল তাদের, তখন আর দু'চারটে দিনের জন্য বিশেষ কিছু এসে যায় না; এর মধ্যে ধরা তারা পড়বে না নিশ্চয়ই, মোহনের মনে ভরসা আছে যথেষ্ট। দুলালী কিন্তু মোট পোঁটলা বেঁধে পশ্চিমে রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে আছে, এ ক'টা দিন ভালোয় ভালোয় কোন রকমে কেটে গেলে হয়।

হপ্তার দিন সকালবেলা গাঁইতি ঘাড়ে ফেলে কাজে বেরুচ্ছে মোহন। দুলালী গিয়ে পিছন দিক থেকে গাঁইতিটা তার চেপে ধরলে। মোহন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, ধাওড়ার দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে দুলালী একটু চাপাগলায় বললে,—ধাওড়া থেকে বেরুস না এখন—থাম।

দুলালীর মুখের ভাব দেখে মোহন একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। দুলালীর মুখ দিয়ে কথা সরছে না, হাত পা গুলো ওর ঠুর ঠুর ক'রে কাঁপছে। মোহনের হাত ধরে টানতে টানতে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো দুলালী, বার দিকে হাত বাড়িয়ে চুপি চুপি সে ইসারা ক'রে দেখিয়ে দিলে ধাওড়ার পিছন দিকে প্রকাণ্ড একটা শিরীষ গাছের নীচে কাঁধের উপর একটা চাদর ফেলে ছোট একটা লাঠি হাতে চুপচাপ বসে আছে রাবণ মাঝি। সঙ্গে তার লোক জন কেউ নাই—রাবণ মাঝি একা, গাছতলায় বসে বসে গম্ভীর ভাবে শাল পাতার

একটা চুটি টানছে রাবণ। দুলালী মোহনের দিকে চেয়ে বলে উঠলো, —কারো কাছে হয়ত সন্ধান পেয়েছে।

মোহন একটু গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে,—সম্ভব।

ধীরে ধীরে একটা খাটিয়ার উপর সেইখানেই বসে পড়লো মোহন। দুলালী একটু চিন্তিত ভাবে বলে উঠলো,—তা হলে?

মোহন কোন জবাব দিলে না। সুকুরমনি ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে সুরু করেছে, দুলালী গিয়ে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিলে মেয়েটাকে। খাটিয়ার উপর বসে বসে ভাবতে লাগলো মোহন, এমন ভাবে কত দিন চলে! রাবণ মাঝি তাদের ক্রমাগত তাড়া ক'রে চলেছে এক জায়গা থেকে অপর জায়গা—ঠিক যেন শিকারী কুকুরের মত। কি তাদের অপরাধ? অপরাধ তারা এমন কিছু করেনি। ধরতে গেলে অপরাধী তারা—অন্যায় একটা গোঁ ধরে অসঙ্গত একটা প্রস্তাবকে সমর্থন ক'রে মোহন আর দুলালীকে যারা দেশ ছাড়া করেছে; রাবণ মাঝিই প্রধাণতঃ এর জন্য দায়ী। মোহনের মন বলছে অপরাধ সে করেনি, অপরাধ যদি কেউ ক'রে থাকে সে তাদের একরোখা সাঁওতালী সমাজ। সত্যই কি পারে আজ রাবণ মাঝি মোহনের বুক থেকে দুলালীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে? হতে পারে দুলালী তার মেয়ে, কিন্তু মোহনের সঙ্গেও তার সম্বন্ধটা আজ খাটো নয় কোন দিক থেকেই। ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে ওরা মালা বদল করেছে, যেদিন তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসে সমাজের ভয়ে। সাক্ষী আছে নির্জ্জন পথ, সাক্ষী আছে আকাশের এক ফালি চাঁদ, সাক্ষী আছে শাল আর পিয়াল বনে ঘেরা কৃষ্ণবাঁধির পাহাড়। পাহাড়ের নীচে 'শালুই বংহার' নামে শপথ ক'রে দুলালীকে গ্রহণ করেছে মোহন, মোহনকেও সে দেবতার নামে মেনে নিয়েছে। সমাজ হয়ত এ বিয়ে তাদের স্বীকার করবে

না, কিন্তু মোহন আর দুলালীর চোখে মূল্য এর এতটুকু কম নয়। তবে তারা এমনধারা অত্যাচার চোখ বুজে সহ্য করবে কেন? না—না—রাবণ মাঝির এ জুলুম, এ জুলুম আর কোনমতেই সইবে না মোহন। যে-শয়তান মোহনের সংসারে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য কুগ্রহের মত তার আশে পাশে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে আর কোনমতেই ক্ষমা করবে না মোহন মাঝি। রাবণ মাঝিকে এর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার, সে ব্যবস্থা করবে মোহন যেমন ক'রে হোক। এমন একটা শিক্ষা তাকে দিয়ে দিতে হবে যেন জীবনে সে কখনো আর মোহন মাঝির পিছু না লাগে। কোম্পানীর অফিসে গিয়ে খবর একটা দিয়ে দেবে নাকি মোহন, রাবণ মাঝি কোম্পানীর কুলিকামিন ভাঙ্গিয়ে বেড়াচ্ছে। সত্য মিথ্যায় কিছু এসে যায় না, রাবণ মাঝিকে জব্দ করা দরকার। কোম্পানীর আড়কাঠি সে বড় ভয়ানক লোক, তার কানে একটু ফেলে দিলেই রাবণ মাঝি কুঠি ছেড়ে পালাবার আর পথ পাবে না। সেই ব্যবস্থাই ভাল, মোহনকে আজ এই রকমেরি একটা কিছু করতে হবে, শয়তানের সঙ্গে শয়তানিই দরকার।

ভাবতে ভাবতে ধাওড়া থেকে বেরিয়ে পড়লো মোহন, দুলালী আবার পিছন থেকে ডাক দিলে, বললে,—চললি কুথা?

মোহন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—এক্ষুনি ফিরে আসছি।

এই বলে ধাওড়ার দোর খুলে দক্ষিণ দিকের গলি পথ ধরে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললো মোহন কোম্পানীর অফিস দিকে মুখ করে। দুলালী ধাওড়ার দরজাটা ঠেসিয়ে দিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়ালো সেই জানলার সামনে। রাবণ মাঝি ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছে শিরীষ গাছের নীচে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রাবণ মাঝি, তার

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে এই কুলি-বস্তির আশে পাশে। সত্যই কি রাবণ মাঝি দুলালীকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে, কিন্তু তার সঙ্গের লোকগুলো গেল কোথায়! ঝরিয়ার মেলায় সেদিন রাবণ মাঝিকে দেখে যতখানা ভয় পেয়েছিলো দুলালী—আজ ত কই ঠিক তেমনধারা মনে হচ্ছে না। এমনও ত হতে পারে যে দুলালীর সঙ্গে শুধু দেখা করবার জন্যই রাবণ মাঝি তার খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছে, হয়ত দুলালীর মা কেঁদেকেটে জোর ক'রে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, দুলালী ছাড়া আপনার বলতে আর যে তাদের কেউ নাই। কিন্তু দুলালী কি পারবে আজ রাবণ মাঝির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে? না—না—সে আর হয় না, রাবণ মাঝির সঙ্গে আজ আর কোন সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয় দুলালীর পক্ষে, দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ সে একেবারে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে।

দূর থেকে রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে চেয়ে দুলালীর চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরতে লাগলো, এর বেশি তার করবার যে কিছু নাই। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে জানলাটা আবার ধীরে ধীরে বন্ধ ক'রে দিলে দুলালী। সুকুরমনি দুলালীর মুখের দিকে চেয়ে নিজের মনেই খিল্ খিল্ ক'রে হাসছে, কচি দাঁতের মন ভুলানো সে কি তার মিষ্টি হাসি! দুলালী দু'হাত দিয়ে মেয়েটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গাল দুটো তার চুমায় চুমায় ভরে দিলে। চোখ দুটো আবার ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো দুলালীর; রাবণ মাঝি নিজের চোখে দেখলে না একবার মেয়েটাকে। এত কাছে এসেও সুকুরমনিকে একবার না দেখেই সে ফিরে যাবে! দুলালীর সারা মন তোলপাড় করতে লাগলো। সুকুরমনিকে কোলে নিয়ে দুলালী গিয়ে দাঁড়াবে নাকি একবার রাবণ মাঝির সামনে? কিন্তু মোহন যদি রাগ করে? এ সময় সে হঠাৎ আবার গেল কোথায়!

যাকগে সে যেখানে তার খুশি, চুলোয় যাকগে; দুলালী যে এ সময়টা একলা আছে ধাওড়ার মধ্যে এই তার পক্ষে যথেষ্ট।

মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পা টিপে টিপে দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল দুলালী, সর্ব্বাঙ্গ তার দুর দুর করছে, হঠাৎ আবার কি মনে ক'রে ফিরে এসে দাঁড়ালো সে জানলার কাছে; বাইরে যেতে সাহস হচ্ছে না দুলালীর, কিছুতেই সাহস হচ্ছে না। ধীরে ধীরে জানলাটা সে আবার খুলে ফেললে, রাবণ মাঝি ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছে শিরীষ গাছের নীচে। মেয়েটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো দুলালী,—রাবণ মাঝি জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় যদি একটিবার বাইরের দিকটায়, ক্ষতি কি? চোখ ভরে সে দেখবে না এক নজর সুকুরমনিকে! মোহন হয়ত এক্ষুনি আবার এসে পড়বে, দুলালীর সঙ্গে রাবণ মাঝির হয়ত আর দেখাই হবে না! না—না—তার আগেই রাবণ মাঝির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎটা একবার সেরে নিতে চায় দুলালী, কোন মতেই দুলালী যে নিজেকে আর চেপে রাখতে পারছে না। জানলাটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে ধাওড়ার মধ্যে থেকেই দুলালী হঠাৎ জোর গলায় ডেকে উঠলো,—বাবা—বাবাগো!

রাবণ মাঝি একটু সজাগ হয়ে উঠলো, কে যেন কাকে ডাকছে, কান খাড়া ক'রে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো রাবণ মাঝি।

দুলালী আবার মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলো,—এই যে এখানে আমি—আমি এখানে।

কার যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। রাবণ মাঝি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, ধাওড়ার দিকে চেয়ে চকিতের মত বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—কে?

জন চার পাঁচ পশ্চিমা লোক কোত্থেকে হঠাৎ হন্ হন্ ক'রে ছুটে এসে চারদিক থেকে রাবণ মাঝিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

শ্রীকালীপদ ঘটক

একটা লোক রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলো,—এই বুড়ো, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ?

আর একজন বললে,—কুলিকামিন ভাঙ্গাবার আর জায়গা পাওনি বেটা, মেরে তোমার হাড় ভেঙ্গে ফেলবো।

রাবণ মাঝি এদের ভাবগতিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ডুলালী জানলার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছে, লোকগুলো সব বিলকুল কোম্পানীর নোকর, কিন্তু এমনধারা রাবণ মাঝিকে ওরা চড়াও করে এলো কেন হঠাৎ ? কোম্পানীর বড় চাপরাসী ঘণ্টেশ্বর চোবে রাবণ মাঝির দিকে লাঠি উঁচিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো,—মার ডালেগা শালাকো, হাড্ডি তোড়কে আভি ছাতু বানা দেগা।

দূর থেকে চমকে উঠলো ডুলালী, রাবণ মাঝিকে এরা এমনধারা অপমান করে কেন ! লোকগুলোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়।

ধাওড়ার দোরে শিকল টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো ডুলালী। ধাওড়া থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়ালো বাইরে, ধাওড়ার পশ্চিম দিকে একটা পোড়ো বাড়ীর দেওয়ালের আড়ে কে যেন একটা লোক নিঃশব্দে চোরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডুলালী একটু এগিয়ে দেখে মোহন, দূর থেকে লোকগুলোকে সে ইসারা করছে। ডুলালী অবাক হয়ে গেল মোহনের এই কাণ্ড দেখে। কলিয়ারি থেকে কতকগুলো লোক জুটিয়ে এনে দূর থেকে রাবণ মাঝির দিকে লেলিয়ে দিচ্ছে মোহন। ডুলালীর মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠলো, ধীরে ধীরে ওখান থেকে নিঃশব্দে সরে পড়লো ডুলালী, ধাওড়ার পূব ধার দিয়ে বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটতে আরম্ভ করলে। লোকগুলো তখন রাবণ মাঝিকে ধরে টানাটানি আরম্ভ করেছে। রাবণ মাঝি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছে যে কুলিকামিন ভাঙ্গাতে সত্যই সে আসেনি, এমনি হঠাৎ

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ছে; কিন্তু শোনে কে তখন রাবণ মাঝির কথা। গলায় তার গামছা জড়িয়ে ঘণ্টেশ্বর চোবে জোর করে টেনে ধরেছে রাবণ মাঝিকে। ধাওড়ার পাশ থেকে একটা থান ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে দুলালী গিয়ে ছুটতে ছুটতে দাঁড়ালো হঠাৎ লোকগুলোর সামনে, ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে উঠলো দুলালী,—খবরদার, গায়ে যদি কেউ হাত দিস ওর—তার মাথাটা এই ইঁট দিয়ে আমি গুঁড়ো ক'রে দিব।

রাবণ মাঝি চমকে উঠলো দুলালীকে দেখে, উদ্‌ভ্রান্তের মত হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো রাবণ মাঝি,—দুলালী—দুলালী!

দুলালী গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাবণ মাঝির বুকে, ডুকরে সে কেঁদে উঠে বললে,—বাবা—বাবাগো!

লোকগুলো অবাক হয়ে গেল, দুলালী মেঝেনকে তারা সকলেই চিনে। কে তাহলে এই বুড়ো লোকটা?

রাবণ মাঝি ভাঙ্গা গলায় বললে,—তোকেই যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি মা, তোর লেগে যে ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়ে গেলুম। তোকে যে আবার ফিরে যেতে হবে মা, যাবি আমার সঙ্গে?

রাবণ মাঝির সামনে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ মোহন মাঝি। বিদ্রূপের স্বরে সে বলে উঠলো,—তোর সঙ্গে যাবে তার মানে?

রাবণ মাঝির চোখ দুটো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো একবার। দুলালী বললে,—যাব বাবা, আমি যাব; আমাকে তুই সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল্, এক্ষুনি—এই পথেই।

মোহন একটু আশ্চর্য্য হলো, আড়চোখে তাকালো একবার দুলালীর দিকে, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—দুলালী!

দুলালী হঠাৎ গর্জ্জে উঠে বললে,—কলিয়ারি থেকে লোকজন জুটিয়ে এনে আমার চোখের সামনে আমার বুড়ো বাপকে যে এমন

ভাবে অপমান করতে পারে, তার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

লোকগুলো ব্যাপার দেখে সরে পড়লো একে একে। রাবণ মাঝি ব্যগ্রভাবে বলে উঠলো,—সত্যিই যাবি ত মা, পারবি তুই যেতে আমার সঙ্গে ?

দুলালী বললে,— পথে আমি পা বাড়িয়েছি বাবা, এখানে আর এক লহমা থাকতে চাই না।

দুলালীর কথাগুলো শুনে গর্জ্জে আর একবার তাকালো মোহন দুলালীর দিকে। রাবণ মাঝি সামনের মেঠো পথটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, —এই আমাদের পথ, চলে আয় মা—তাহলে আর দেরি করিস না।

দুলালী সঙ্গে সঙ্গে পা চালিয়ে দিলে।

সামনের সেই সুড়ি পথটা ধরে ধীরে ধীরে উত্তর মুখে এগিয়ে চললো রাবণ মাঝি, দুলালী মেয়েটাকে বুকের উপর ফেলে রাবণ মাঝির পিছু পিছু হেঁটে চললো। যাবার বেলা পিছন ফিরে ভুলেও সে একবার তাকালো না আর মোহনের দিকে।

মোহনের সর্ব্বাঙ্গ যেন গুর গুর ক'রে কাঁপছে, দুলালীর দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো মোহন,—শয়তানী—শয়তানী !

শিরীষ গাছটার নীচে ধপ্ ক'রে বসে পড়লো মোহন, দুলালী আজ সত্যিই তাকে ছেড়ে যেতে পারলে ! এ যে তার ধারণার বাইরে।

রাগে মোহনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগলো, বেইমান---দুনিয়াটাই বেইমান। কিন্তু সুকুরমনিও যে চলে গেল আজ মোহনকে ফেলে, একটা বেলা তাকে দেখতে না পেলে মোহন যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠে। ওরা আজ চলে গেল, চলেই গেল, যাকগে— ভাবনার আর থাকলো না কিছু, মোহন আজ নিশ্চিন্ত।

মোহনের অজ্ঞাতে কয়েক ফোঁটা জল ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়লো তার দু'চোখ বেয়ে। ছি ছি—মোহন কাঁদছে, কার জন্য কাঁদছে মোহন? জীবনে সে কোনদিন কারো জন্যে কথনো ত কাঁদেনি, তবে? চোখ দুটো তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে ধীরে ধীরে গাছতলা থেকে উঠে পড়লো মোহন, পাগলের মত টলতে টলতে এগিয়ে চললো সে ধাওড়ার দিকে। ধাওড়ার দরজাটা ভিতর দিক থেকে ঠেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে মোহন ঢুকে পড়লো। দুলালীর রঙিন শাড়ী খানা মেলা রয়েছে বারান্দার এক পাশে। মোহনের চোখ দুটো জ্বালা ক'রে উঠলো, এটা কেন এখানে? শাড়ীখানা তুলে ঘরের মধ্যে একটা কাঠের বাক্সে ভরে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলে মোহন। বাক্সের পাশে দুলালীর মুখ দেখবার আয়নাটা এখনো তেমনি ভাবে ঠেসানো রয়েছে দেওয়ালের গায়ে, কাঠের একটা চিরুনি, চুল বাঁধার ফিতে, লোহার কয়েকটা কাঁটা,—কি সব এগুলো! কি আপদ, যাবার সময় দুলালী এগুলো মনে করে নিয়ে গেল না কেন। কি হবে আর এগুলো বেহুদ এখানে জমিয়ে রেখে! দুলালীর কোন স্মৃতি মোহন যে আর বরদাস্ত করতে পারছে না, কোনমতেই না। আয়নাটা দেবে নাকি মোহন আছাড় মেরে ভেঙ্গে! দুলালীর বলতে যা কিছু সব আছে মোহন চুরমার ক'রে ফেলে দিয়ে আসবে পুকুরের জলে। কিন্তু ধাওড়ার চারিদিকেই যে তারই হাতের ছাপ, প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে দুলালীর ছোঁয়াচ যে এখনো লেগে রয়েছে। মোহনকে পালাতে হবে, এখান থেকে একেবারেই পালাতে হবে। দোরের পাশে ওটা কি, মেঝের উপর পড়ে রয়েছে একধারে? সুকুরমনির কাঠের পুতুলটা না? মোহনের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। এগুলো ওরা ফেলে রেখে গেল কেন। মোহনকে কি ওরা পাগল না ক'রে ছাড়বে না।

শ্রীকালীপদ ঘটক

কাঠের পুতুলটা মেঝের উপর থেকে তুলে নিয়ে ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো মোহন, ওরা কি সত্যিই চলে গেল! কিন্তু পুতুলটা যে সুকুরমনির দরকার, এটা যে ওর খেলার সাথী। জানলাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ চীৎকার ক'রে ডেকে উঠলো মোহন,—মনি—মনি—সুকুরমনি!

বার থেকে সাড়া দিলে না কেউ। সাড়া যারা দেবার তারা তখন মোহনের দৃষ্টি ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে পড়েছে। বেলা হয়ে গেছে অনেকখানা, প্রচণ্ড রৌদ্রে চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। জানলা খুলে সামনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মোহন। দূরে একটা কলিয়ারির চিমনি থেকে অজস্র ধোঁয়া উঠছে। [illegible]-বাঁধা সেই কালো ধোঁয়া বিরাট একটা কুণ্ডলি পাকিয়ে সূর্য্যকে আড়াল ক'রে সমস্ত আকাশখানা জুড়ে ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মোহনের চোখের সামনে দুনিয়াটা যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে খাটিয়ার উপর ধপ্ ক'রে অসাড় ভাবে বসে পড়লো মোহন।

নয়

টুংরার মনে আবার নতুন ক'রে আশা জেগেছে, এবার হয়ত সে দুলালীকে পেতে পারবে। মোহন তাকে চুপি চুপি ঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে গিয়ে চোরের মত রাতারাতি সরে পড়েছিলো, টুংরার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁড় চালাতে সে সাহস পায়নি। পঞ্চগেরামী লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নিশানা বিঁধে যাকে জয় ক'রে নেবার কথা, মোহন তাকে কাপুরুষের মত চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে ধিকৃত করেছে নিজের পৌরুষকে, কলুষিত করেছে তার সমাজ জীবনকে। মোহনের এ অপরাধ কোন মতেই সইবে না সাঁওতালী সমাজ, সাঁওতালী বিধিবিধানকে অবজ্ঞা ক'রে এমন ভাবে সমাজের শৃঙ্খলা যারা ভঙ্গ করেছে, শাস্তি তাদের পেতেই হবে। সমাজের নির্দেশ মত দুলালীকে তাই জোর ক'রে ধরে আনা হয়েছে। মোহন মাঝি আজ একঘরে, আবার যদি কোনদিন সে ফিরে আসে—সাঁওতালী সমাজ তাকে ঠাঁই দেবে না, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে শেয়াল কুকুরের মত, এই তার শাস্তি। এ শাস্তি কিন্তু যথেষ্ট বলে মনে হয় না টুংরার, দুলালীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে যে শত্রুতা করেছে মোহন টুংরার সঙ্গে, শাস্তি তার আরও বেশি কঠোর হওয়া উচিত। সমাজ তার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই করুক—টুংরা কিন্তু নিজের হাতে একটা কিছু না ক'রে কোন মতেই ক্ষান্ত হবে না। সামনা সামনি মোহনের সঙ্গে আবার যদি কখনো দেখা হয় টুংরার—টুংরা তাকে আস্ত রাখবে না; দুলালীকে সে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে টুংরা মাঝির বুক থেকে। টুংরা যদি হেরে

যেতো বাঁড়ধেনুকের পরীক্ষায়—টুংরার কিছু বলবার ছিলো না। মোহন মাঝি কিন্তু বেইমানি করছে, চরম দুষমনী ক'রে গেছে সে টুংরার সঙ্গে। কিন্তু মোহন মাঝিকে ত এরা ধরে আনতে পারলে না, রামপুর আর ভালুকপোতার সাঁওতালরা মিলে দুলালীকে শেষ পর্যন্ত কোন রকমে পাকড়াও ক'রে এনেছে! কিন্তু মোহন? মোহনকেও যে সেই সঙ্গে ধরে আনা উচিত ছিলো। শাস্তি যদি দিতে হয়—দুলালীর চেয়ে কঠোরতর শাস্তি মোহন মাঝির প্রাপ্য। সমাজ যদি তাকে ক্ষমাও করে টুংরা তাকে ক্ষমা করবে না, তার জন্য জান কবুল টুংরার, মোহন মাঝিকে সে এক হাত দেখবে।

টুয়াই মাঝি সমাজের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করেছে দুলালীর বিয়েটা এবার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। রাবণ মাঝি নাকি রাজি হয়েছে এ প্রস্তাবে। পাড়ার ছোকরাদের কাছ থেকে নিজের কানে শুনে এসেছে টুংরা, টুংরার সঙ্গে দুলালীর বিয়ে। খবরটা অবশ্য একেবারে নতুন নয় টুংরার পক্ষে, কথাবার্তা ছোট বেলা থেকেই পাকা হয়ে আছে, মাঝখানে দুলালী হঠাৎ নিরুদ্দেশ না হয়ে গেলে বিয়েটা ঢের আগেই চুকে যেতো। কিন্তু টুয়াই মাঝি বলে মেয়েটা নাকি দুষী হয়ে গেছে, মোহন মাঝিকে নিয়ে ঘরকন্না করেছে সে বছর দুয়ের উপর, তাই ও মেয়ের সঙ্গে টুংরার বিয়ে দিতে বিশেষ নাকি আগ্রহ ছিলো না টুয়াই মাঝির। কয়লা কুঠি থেকে দুলালী ফিরে আসার পর টুয়াই মাঝি কিন্তু মত পাল্টেছে, টুয়াই নাকি কথা দিয়ে দিয়েছে রাবণ মাঝিকে। ভালুকপোতার ভীম মাঝি টুংরা মাঝির সাঙ্গাত,—খবরটা সে নিজের কানে শুনে এসেছে রামপুরের সাঁওতালদের কাছ থেকে। বিয়ের শুধু দিনটা এখন স্থির হতেই বাকি, তারও নাকি ব্যবস্থা হচ্ছে; ভীম মাঝি বলে 'লগন বাঁধা' খুব শিগ্‌গীর

মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। টুংরার বন্ধু বান্ধবরা এখন থেকেই ধরে বসেছে টুংরাকে বিয়ের পর একদিন তাদের পেট ভরে খুব খাওয়াতে হবে। টুংরার তাতে আপত্তি নাই কিছুমাত্রই, ভোজের ব্যবস্থা একটা করতে হবে বৈকি, ভীম মাঝিকে কথা দিয়েছে টুংরা, দুলালীর সঙ্গে বিয়েটা তার চুকে যাক আগে—তারপর তারা মদ মাংস যত খেতে পারে।

দুলালী ফিরে আসার পর থেকে টুংরার মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এতদিন সে একেবারে মুসড়ে পড়েছিলো, খেতে শুতে স্বস্তি ছিলো না টুংরার, দিনরাত সে দুলালীর কথাই ভাবতো। বিয়ের মজলিসে দুলালীকে প্রথম দেখার পর থেকে টুংরা যেন মাতাল হয়ে উঠেছিলো দুলালীর নেশায়, হলুদ-রাঙা শাড়ী পরে কি চমৎকারই না মানিয়েছিলো সে দিন দুলালীকে। ডগ্‌ডগে কাজল টানা ডাগর দুটি চোখ, খোঁপায় গোঁজা কৃষ্ণচূড়ার ফুল, গলায় ছিলো গুলঞ্চ ফুলের মালা। দুলালীর সে চেহারাখানা জীবনে কখনো ভুলবে না টুংরা, সেইদিন থেকে দুলালী যেন ছাপ মেরে বসে গেছে টুংরার মনে। টুংরা সে দিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, দুলালীকে পেতেই হবে, যেমন ক'রে হোক। চাঁদরায় মাঝির বিচার মত ব্যবস্থা হলে কাজ এদ্দিন হাঁসিল হয়ে যেতো। দুলালী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর টুংরার মনের অবস্থা যে কতখানি সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিলো, টুংরা ছাড়া অপর কেউ তা বুঝবে না। পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে টুংরা দুলালীর খোঁজে, মোহন মাঝিকে ধরবার জন্য চেষ্টা সে বড় কম করেনি। তরণীর পাহাড় থেকে আরম্ভ ক'রে অজয় নদীর ধার পর্য্যন্ত খুঁজতে কোথাও বাকি রাখেনি টুংরা, প্রত্যেকটি বন—প্রত্যেকটি পাহাড় সে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছে। দিন নাই

রাত নাই কাঁড়ধেনুক কাঁধে ফেলে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছে টুংরা, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম' এ বন থেকে ও বন, কিন্তু মোহন বা দুলালীর কোন সন্ধানই সে করতে পারেনি। টুয়াই মাঝি অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে টুংরাকে শেষে ধরে নিয়ে আসে বাগবাদির পাহাড় থেকে।

এতদিন ধৈর্য্য ধরে কোন রকমে শান্ত ছিলো টুংরা, মনে মনে সে জানতো দুলালীকে একদিন ফিরতেই হবে। দুলালী ফিরে আসার পর টুংরার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে; আর কিন্তু দেরি করা উচিত নয়, বিয়েটা এবার চটপট সেরে ফেলা দরকার। কিন্তু টুংরার এই বিয়ের ব্যাপারে টুয়াই মাঝির কাছ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ রাবণ মাঝিকে নাকি কথা দিয়েছে টুয়াই, ভীম মাঝি নিজের কানে শুনে এসেছে। ভীম মাঝি কি তাকে মিথ্যে বলবে! ক'দিন ধরে ক্রমাগত দুলালীর কথাই ভাবছে টুংরা, দুলালীকে না পেলে টুংরা এবার সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে। মনে মনে মনকলা খেয়ে চুপচাপ আর বসে থাকা নয়, নিজে থেকেই কথাটা এবার পাড়তে হবে টুংরাকে টুয়াই মাঝির কাছে; টুয়াই মাঝিকে সে খোলাখুলি জানিয়ে দেবে দুলালীকে বিয়ে করতে আপত্তি নাই টুংরার। দোষ হয়ত সে সত্যই একটা ক'রে ফেলেছে, কিন্তু সে জন্য এমন কিছু আসে যায় না, সাঁওতালদের সমাজে একটা মেয়ের দু'বার বিয়ে—এ ত হামেশাই হচ্ছে। এ বিয়ের নাম সাঙা, মেয়েমানুষের দ্বিতীয়পক্ষ মানেই হলো সাঙা; তা হোক, টুংরা মাঝির আপত্তি নাই তাতে। সাঙালে বৌ নিয়ে কত লোকই ত ঘর করছে, সাঙা আর বিয়ে কথা দু'টো শুনতেই যা আলাদা, মানে ওর একই; সাঙাও বিয়ে, বিয়েও বিয়ে; যাহোক একটা হলেই হলো, টুংরার তাতে কিছু মাত্র আসে যায় না।

একটা কথা শুধু ভেবে পায়না টুংরা, দুলালীর মেয়েটাকে নিয়ে সে কি করবে; এ যেন টুংরার পক্ষে একটা মস্ত বড় সমস্যা। টুংরা শুধু দুলালীকেই চায়, কিন্তু সেই সঙ্গে তার জলজ্যান্ত মেয়েটাকে কেমন ক'রে মেনে নেবে টুংরা; ও মেয়ে যে মোহনের, মোহন মাঝির বিষ ওর সারা দেহে ছড়িয়ে রয়েছে। দুলালীর মুখ চেয়ে পারবে কি টুংরা মেয়েটাকে চোখ বুজে বরদাস্ত ক'রে যেতে? না—না—তা হয় না, ওটাকে কোন রকমে সরাতে হবে—একেবারেই সরিয়ে দিতে হবে, এ ছাড়া ত আর পথ দেখেনা টুংরা। বিয়েটা আগে চুকে যাক, তারপর ও মেয়ের ব্যবস্থা টুংরার হাতে।

ভীম মাঝি এসে খবর দিয়ে গেল সেদিন দুলালীর বিয়ের নাকি লগন বাঁধা হচ্ছে, দিন দশেকের মধ্যেই 'গুনুং শাশাং'* দা-বাপালা†— সিঁদুর দান চুকে যাবে বেবাক। রাবণ মাঝিকে একেবারে পাকা কথা দিয়ে দিয়েছে টুয়াই মাঝি। খবরটা পাওয়ার পর থেকেই টুংরার মনটা উশখুশ করছে। আর কিন্তু দেরি করা চলে না টুংরার, এবার তাকে তৈরি হতে হয়েছে।

পরের দিন সকালবেলা ভালুকটাকে সঙ্গে নিয়ে তীর ধনুক কাঁধে ফেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো টুংরা, হাটে যেতে হবে, বিয়ের জামা কাপড় গুলো এখন থেকে কিনে না রাখলে হয়ত আর সময় পাওয়া যাবে না। ধুতি শাড়ী পাগড়ী বাঁধবার কাপড় মাকন্দার পোষাক বিয়ের আগেই হলুদ রঙে ছুপিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু এগুলোর জন্য বিশেষ কোন তাড়া নাই টুংরার, টুয়াই মাঝি সময় মত ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবে। টুংরা শুধু বিয়ের জামাখানা নিজে একটু দেখে

* গুনুং শাশাং—তেলহলুদ।

† দা-বাপালা—জল সওয়া।

শুনে পছন্দ ক'রে কিনে রাখতে চায়, যত দামই লাগুক রঙিন ছিটের হাতকাটা জামা একখানা চাই-ই। সাজ পোষাকের ব্যবস্থাটা একটু ভালরকমই করতে হবে টুংরাকে, লোকে যাতে নিন্দে করতে না পারে, চাই কি—বনকাটার মুচিদের হাতের বার্নিশ করা একজোড়া জুতো পর্য্যন্ত কিনে ফেলবে টুংরা, কতই বা দাম। পাঁচজনে দেখুক যে টুংরা মাঝি একেবারে হাবাগোবা নয়, জুতোও সে পায়ে দিতে জানে; জুতো একজোড়া কিনবে টুংরা, যত দামই লাগুক। আর সেইসঙ্গে ঝাবড়ুর লেগেও একখানা পোষাক কেনা দরকার, ঝাবড়ুকেও যে টুংরার সঙ্গে বরিয়াত যেতে হবে। ভালুকের বাচ্চাটাকে ঝাবড়ু বলেই বরাবর ডাকে টুংরা, আদর ক'রে ওই নামে ডেকে ডেকে ঝাবড়ু ওর নাম হয়ে গেছে। ঝাবড়ুকে ফেলে একটি পা কোথাও বেরোয় না টুংরা, যেখানেই সে যাক চব্বিশ ঘণ্টা ঝাবড়ু ওর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বিয়ের সময় ঝাবড়ুকে খালি গায়ে রাখা ভাল দেখায় না, ওর জন্যেও পোষাক একখানা কিনতে হবে টুংরাকে।

টাকা পয়সা কতকগুলো কাপড়ের খুটে বেঁধে নিয়েছে টুংরা। তার জন্য টুয়াই মাঝির কাছে তাকে হাত পাততে হয়নি, ওর ছুটুমা যদ্দিন বেঁচে আছে তদ্দিন অন্তত টুংরার কোন ভাবনাই নাই সেদিক থেকে। টুয়াই মাঝির ছোট মেয়ে থাদী মেঝেন, মার সম্পর্কে টুংরার সে মাসী, বাপের সম্পর্কে টুংরার সে সৎমা। টুয়াই মাঝির বড় মেয়েটা, অর্থাৎ টুংরা মাঝির মা মারা যাওয়ার পর থাদী মেঝেনকে ফের বিয়ে করে টুংরার বাপ। তার কিছুদিন পরেই টুংরার বাপ হঠাৎ মারা পড়ে যায়। বিধবা হওয়ার কিছুদিন পর সোয়ামীর ভিটে ছেড়ে টুংরাকে নিয়ে চলে আসে থাদী মেঝেন টুয়াই মাঝির বাড়ীতে, টুংরা তখন নেহাত ছোট। তখন থেকেই বরাবর ওরা রয়ে গেছে ভলুকপোতায়,

থাদী মেঝনকে ছোট বেলা থেকেই টুংরা মাঝি ছুটুমা বলেই ডাকে; এইটুখানি বয়েস থেকে টুংরাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে থাদী। টুয়াই মাঝির আপনার জন বলতে একমাত্র ওরাই, ওই বিধবা মেয়েটা আর আধপাগলা ওই নাতিটাকে নিয়েই টুয়াই মাঝির সংসার। থাদী মেঝেনের ছেলে পিলে নাই, টুংরাকেই সে ছোটবেলা থেকে ছেলের মতই জানে; টুংরার যত কিছু সখ আহ্লাদ, যা কিছু খেয়াল খুশি আব্দার মেটাতে হয় থাদী মেঝেনকেই। টুয়াই মাঝির অবস্থা বেশ ভাল, সংসারে তার অভাব নাই কোন দিক থেকেই, জমিজমা মই লাঙ্গল গরুবাছুর সবই আছে টুয়াই মাঝির, ভবিষ্যতে টুংরাই তার এক মাত্র ওয়ারিশ। তাই টুংরার সখ আহ্লাদে কোনদিনই বাধা দেয় না থাদী মেঝেন, যখন যা তার দরকার থাদী মেঝেনের কাছ থেকে না চাইতেই পায়। কিন্তু এত করেও টুংরাকে ওরা মানুষের মত মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে পারলে না কোনমতেই, থাদী মেঝেনের এই যা একটু দুঃখ। আজ পর্য্যন্ত সংসারের সে কোন কাজেই এলো না, দিন রাত খালি কাঁড় ধেনুক আর শিকারের ধান্দা নিয়েই মেতে আছে টুংরা; সংসারের কোন ঝামেলায় সে মাথা গলায় না। টুংরার সম্বন্ধে আশা ভরসা প্রায় ছেড়ে ফেলেছে থাদী মেঝেন, ওর দ্বারা যে ভবিষ্যতে ঘর সংসার ঠিক মত বজায় থাকবে, সে ভরসা খুব কম। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় থাদী মেঝেনের কোন রকমে টুংরাকে একবার সংসারী ক'রে দিতে পারলে হয়ত খানিকটা চাপে পড়েও কিছুটা সে শুধরে যেতে পারে। থাদী মেঝেন টুয়াই মাঝিকে ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছে টুংরার বিয়েটা এবার দেওয়া দরকার। টুয়াই মাঝি শুধু হুঁ হাঁ ক'রেই সেরে দেয়, ব্যবস্থা সে এ পর্য্যন্ত কিছুই ক'রে নি। টুংরা কিন্তু বিয়ের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, ভাবে

ইঙ্গিতে খাদী মেঝেন বুঝতে পারে সবই। খাদী মেঝেনের উপর্যুপরি তাগিদের ঠেলায় টুয়াই মাঝি শেষ পর্যন্ত স্বীকার পেয়েছে—সুবিধা মত কনে একটা পাওয়া গেলেই ঝঞ্ঝাট সে মিটিয়ে ফেলবে।

টুংরা মাঝি কিন্তু খবর পেয়ে গেছে এর মধ্যে বিয়ের নাকি আর দেরি নাই মোটেই, চটপট এবার তৈরি হলেই হলো। খাদী মেঝেনের কাছ থেকে টাকা পয়সা কিছু যোগাড় ক'রেছে টুংরা, হাটে তার না গেলেই নয়। টুংরার ভাবগতিক দেখে খাদী মনে মনে হাসে, কিন্তু বিয়েটা তার সত্যি সত্যি এবার চুকে যাওয়া দরকার; সে বিষয়ে খাদী মেঝেনের আগ্রহ টুংরার চেয়ে কম নয় কিছু।

হাটে যাবার মুখে ভীম মাঝির খোঁজ করেছিলো টুংরা। ভীম মাঝি তার সাঙ্গাত, সে সুদ্ধ সঙ্গে থাকলে টুংরার জিনিসপত্রগুলো দেখে শুনে পছন্দ ক'রে কিনে দিতে পারতো। ভীম মাঝি কিন্তু সকাল থেকেই আকন্দডাঙাতে সিনি* ধরতে চলে গেছে। জুধাই রসক্যা মাতলা মুংলা কেউ এরা আজ বাড়ী নাই, খাল কাটতে চলে গেছে সব নদীর ধারে।

সিনি* ডুনীর† ক'রে নদীর জল উপরে তুলে বীজধানের ক্ষেতগুলো কোন রকমে বাঁচাতে না পারলে আকরের অভাবে চাষ আবাদ এবার কঠিন হয়ে উঠবে। এই সবে শায়ন মাসের প্রথম, দেবতা কিন্তু এর মধ্যে একেবারে ধরে দিয়েছে, গোড়ার দিকে বৃষ্টি যা এক আধটু হয়েছিলো কয়েকদিনের খর রোদে একদম তা টেনে নিয়েছে। 'রোহিণীর' আফর গুলো এবার জলে পুড়ে শুকিয়ে গেল বেবাক, বৃষ্টির অভাবে নতুন ক'রে বীজধান ফেলবার সুযোগ পাওয়া যায় নি, কাদার

* সিনি—টিনের তৈরি জল সেচনের ত্রিকোনাকৃতি আধার বিশেষ।

† ডুনী—লোহার তৈরি জলসেচনের আধার।

আফর যে কতদিনে পড়বে দেবতাই জানে। চাষীরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে, বৃষ্টির অভাবে চাষ আবাদ প্রায় বন্ধ। রীতিমত সেচনের ব্যবস্থা করতে পারলে ধূলোর আফরগুলো কিছু কিছু এখনো বাঁচতে পারে। চারদিক থেকে তাই নদীনালা খুঁড়ে যতটুকু সম্ভব আফরের ক্ষেতগুলোতে জল ধরাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, টুংরার বন্ধুবান্ধবরা সকলেই এখন মাঠে। খাঁদী মেঝেন টুংরাকেও ক'দিন থেকে তাড়া দিতে আরম্ভ করেছে, মুনিস মান্দের সঙ্গে নিয়ে আফরের ক্ষেতগুলো সেয়াত করবার ব্যবস্থা করা দরকার। টুংরার ধাতে কিন্তু পোষায় না ওসব, মাটি খুঁড়ে নালা কেটে জল তোলাতুলির মধ্যে টুংরা মাঝি নাই ; বৃষ্টি যেদিন হবে সেদিন আপনা থেকেই হবে, তার জন্য বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নাই টুংরার। এর চেয়ে যদি জঙ্গল থেকে দুটো খরগোস বা গোধা মেরে আনতে হয় টুংরাকে সে বরং কতকটা চলতে পারে, ওসব কাজে কোনদিনই পিছু হটবে না টুংরা। কিন্তু তাই বলে মাঠে গিয়ে সিনি হেঁচা বা টেঁড়ার দড়ি ধরে নদীর মানায় 'ঝরোল ঝাঁপ' খেলা—টুংরার ধাতে এ পোষাবে না কোন রকমেই। ও দিকে আবার বিয়ে লাগছে টুংরার, এ সময় তার মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াবার অবসর কোথায়।

খাঁদী মেঝেন টুংরাকে ভাল রকমই চিনে. তাই টুংরার উপর ভরসা সে বড় বেশি রাখে না, মাঠে গিয়ে মুনি কৃষাণদের সঙ্গে নিজে তাকে মদত দিতে হয়। ঘরসংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম থেকে আরম্ভ ক'রে জমি জমার তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত সব কিছুই লক্ষ্য রাখতে হয় খাঁদী মেঝেনকে। গায়ে গতরে খেটে খুটে এইভাবেই সে টুয়াই মাঝির সংসারটাকে আজ পর্য্যন্ত কোন রকমে বজায় রেখেছে।

হাটে গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর ডগ্‌ডগে লাল রঙের হাতকাটা জামা একটা কিনে ফেললে টুংরা। কাপড়টা বেশ পুরু আছে, টিঁকবে অনেকদিন; তা ছাড়া কোমরের দু'ধারে পকেট আছে দুটো, জিনিস পত্র রাখবার কোন অসুবিধা নাই, জামা খানা টুংরার গায়ে মানিয়েছে ও বেশ চমৎকার। কাপড়ের দোকান থেকে [illegible] একটা চৌখুড়ে গামছা আর সেই সঙ্গে ছাপছোপ দেওয়া রুমাল [illegible]না কিনে ফেললে টুংরা। ছোট একটা আয়না, সরুদাঁড়া কাঠের একটা চিরুনি, ছড়া তিনেক পাহাড়ী বেলের মালা, মায় গোলাপী রঙের গায়ে মাখা একখানা সাবান পর্য্যন্ত খরিদ ক'রে গামছার খুঁটে বেঁধে নিলে টুংরা, বিয়ের সময় এগুলো সব কাজে লাগবে বেবাক। ভালুকের জামা কিন্তু কোন দোকানেই পাওয়া গেল না, কাজেই দরজীর কাছে মাপ দিয়ে জংলী ছিটের কুর্ত্তা একটা সেলাই করিয়ে নিলে টুংরা ঝাবড়ুর জন্যে, নগদ পাঁচ সিকে খরচা ক'রে। জুতো কিনতে গিয়ে একটু মুস্কিলে পড়লো টুংরা, জুতো আর কোনমতেই জুতসই হয় না। দেশী মুচির হাতের তৈরি কয়েক জোড়া জুতো সে একে একে পরখ ক'রে দেখে নিলে দু'তিন জায়গা ঘুরে ঘুরে, কোনটা পায়ে খাটো হয়, কোনটা বা ঢিলে; যে দু'একজোড়া ওরই মধ্যে পায়ের ঠিক মাপে মাপে বসে গেল সেগুলো কিন্তু পায়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করা সহজ বলে মনে হলো না টুংরার, জুতো পরে হাঁটতে গেলেই পাগুলো যেন বে[illegible]া হয়ে ওঠে, শরীরের ভার কেন্দ্র সমান রেখে চলা—সে যেন এক দুরূহ ব্যাপার, হাঁটতে গেলেই মনে হয় পা পিছলে গেলাম বুঝি উল্টে। কিন্তু না, জুতো টুংরাকে পরতেই হবে, দু'চার দিন অভ্যাস ক'রে নিলেই তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে আপনা থেকেই। দেখে শুনে পছন্দ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত জুতো একজোড়া কিনে ফেললে টুংরা, খাঁটি মোষের চামড়া,

সেলাইয়ে মধ্যে ফাঁকি নাই কোন জায়গায়, গোটাটাই চামড়ার সেলাই, মচ্‌মচে আওয়াজটাও বেশ ভাল আছে। পোয়া খানেক সরষের তেল কিনে জুতোগুলো বেশ ভাল ক'রে একবার ভিজিয়ে নিলে টুংরা, চামড়টা মোলাম থাকবে। জুতোগুলো এবার পায়ে দিয়ে কিছুটা যেন আরাম বোধ হচ্ছে, হাট বাজার সেরে নিয়ে টুংরা এবার বাড়ী ফিরবার ব্যবস্থা করতে লাগলো, বেলা প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে। হাট থেকে বেরুবার আগে মকর বাঁশের আড় বাঁশী একটা কিনে ফেললে টুংরা; বাঁশীর গায়ে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে কেটে নানা রকমের ছক তোলা হয়েছে, বাঁশীটা বেশ ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আড় বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে আজ পর্য্যন্ত আওয়াজ কখনো বের করতে পারেনি টুংরা, কোন্ দিকের ফুটো দিয়ে কেমন করে যে হাওয়া বেরিয়ে যায় কিছুতেই সে ধরতে পারে না। টুংরা আর একবার চেষ্টা করে দেখবে; আওয়াজ ওঠে ভালই, আর না উঠলেও পয়সা ক'টা নেহাত জলে পড়বে না—বাঁশীটা বেশ লম্বা আছে, দরকার হলে এটাকে হাত-লাঠিও করা যেতে পারে।

ঝাবড়ুর গলার শিকলটা ধরে টানতে টানতে হাট থেকে টুংরা বেরিয়ে পড়লো। টুংরার গায়ে রঙিন জামা, পায়ে মোষের চামড়ার জুতো, গলায় একছড়া পাহাড়ী বেলের মালা, হাতে একটা আড়বাঁশী পর্য্যন্ত। অন্যান্য হাট বাজারগুলো চৌঘুড়ে গামছাটায় বেঁধে আগে পিছে ক'রে ডান কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে টুংরা, বাঁ-কাধে কাঁড় ধেনুকখানা ঠিক ঝোলানো আছে বরাবরকার অভ্যাস মতই। রাস্তায় যেতে যেতে মুস্কিল হলো ঝাবড়ুকে নিয়ে, মাঝে মাঝে সে থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই আর এগুতে চায় না, জামাখানা ঝাবড়ুর গায়ে পরিয়ে দেওয়ার পর থেকে ওর মেজাজটা কিছু রুক্ষ হয়ে উঠেছে। জঙ্গলের জানোয়ার কি না, সভ্যতার মর্য্যাদা সে বুঝবে কেমন ক'রে। গলার শিকলটা ধরে টানতে

টানতে ঝাবড়ুকে নিয়ে এগিয়ে চললো টুংরা বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে। মাইল খানেক যেতে না যেতে টুংরার জুতোগুলো কিন্তু ভয়ানক বে-আদপি আরম্ভ করলে টুংরার সঙ্গে। ডান পায়ের গোড়ালিতে একটু একটু জ্বালা করতে আরম্ভ করেছে, বাঁ-পায়ের আঙুলগুলো চেপে যেন সেঁটে গেছে গায়ে গায়ে লেপ্‌টি লাগা হয়ে, কড়ে আঙুলটা জ্বালা করছে ঠিক যেন চিমটি কাটার মত। জুতোগুলো খুলে ফেললে টুংরা, আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার পরে নিলেই চলবে, পা গুলো ততক্ষণ ছাড়ুক একটুখানি। জুতো খুলে তাড়াতাড়ি পা দু'টো একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে টুংরা, জখম তেমন বিশেষ কিছু হয়নি, শুধু ডানপায়ের গোড়ালিতে ছাল ছেড়ে গেছে খানিকটা জায়গা, আর বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলে একটুখানি ফোস্কা পড়েছে। ও এমন মারাত্মক কিছু নয়, দু'দিনেই বেবাক ঠিক হয়ে যাবে। জুতোগুলো ধুলো ঝেড়ে গামছার খুঁটে বেঁধে নিলে টুংরা।

মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য আকাশটাকে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে, পথের মাটি গরম হয়ে উঠেছে, মাঠঘাট সব খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। গরমটা যেন এবার কিছু বেশি পড়েছে। হাট থেকে বেরিয়ে ক্রোশ দুই আড়াই পথ ভেঙ্গে গাঁয়ের ধারে ছোট কাঁদরটার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো টুংরা, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তার কল্ কল্ ক'রে ঘাম ঝরছে, ভালুকটা পর্য্যন্ত হাঁপিয়ে উঠেছে রোদের তাতে। কাঁদরের ডোবায় ঝাবড়ুকে একবার জল খাইয়ে নিলে টুংরা, তারপর সে পাড়ের উপর একটা বটগাছের শিকড়ে শক্ত ক'রে ওটাকে বেঁধে দিয়ে কাঁদরের জলে হাত পা ধুতে নামলো। বেশ ক'রে মুখ হাত ধুয়ে পোটলা থেকে জুতো জোড়া বের ক'রে আর একবার পায়ে দিলে টুংরা, জুতো পরে গাঁ ঢুকতে হবে। জুতোগুলো কিন্তু ভাল রকম বাগ মানেনি এখনো, পা টিপে টিপে কাঁদরের পাড় বেয়ে

খুব সাবধানে উঠে যেতে লাগলো টুংরা। বটতলায় গিয়ে দেখে ওদিকে আবার এক নতুন উপসর্গ, ঝাবড়ু একেবারে মরিয়া হয়ে দাঁত মুখ খিঁচে গা ঘষতে আরম্ভ করেছে বটগাছের শিকড়ে। কি সর্ব্বনাশ! আর একটু না দেখলেই জামাখানা হয়ত সে একেবারে ছিঁড়েই ফেলতো। তাড়াতাড়ি শিকলটা ধরে টান দিয়ে ঝাবড়ুকে একটু সামলে নিলে টুংরা, ঝাবড়ুকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে গায়ে তার হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে,—বরিয়াত যাবি বেটা—ভাবনা করিস না, আমার যে বিহারে, বহুকে তুই নাচ দেখাবি না?

টুংরার দিকে চেয়ে কোঁ কোঁ ক'রে একবার ডেকে উঠলো ঝাবড়ু, টুংরার বিয়েতে বরিয়াত যাবার আনন্দে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। টুংরা বললে,—আজ তোকে একটা নতুন রকমের নাচ শেখাব বেটা, লাঠি ঘাড়ে থান্দার সেজে রণ দিতে পারবি ত?

ঝাবড়ু কোন সাড়া দিলে না, অস্বস্তি ওর ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। শিকলটা ধরে টানতে টানতে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চললো টুংরা। গাঁ ঢুকতে হঠাৎ ভীম মাঝির সঙ্গে দেখা। টুংরার সাজ পোষাক দেখে ভীম মাঝি অবাক, ঝাবড়ুর গায়ে অদ্ভুত রকমের পোষাকটা দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠলো ভীম মাঝি। টুংরাও হিহি ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে ভীম মাঝির দেখাদেখি। তারপর সে হাসি চেপে একটু গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো,—আর কোন খবর পেলি ভা...?

ভীম মাঝি টুংরার সাঙ্গাত, পাড়ার পাঁচজন ছোকরা মিলে টুংরার বিয়ের কথা নিয়ে এতদিন শুধু হাসি ঠাট্টাই ক'রে এসেছে ওরা, টুংরাকে নিয়ে মাঝে মাঝে রগড় করা ওদের একটা আমোদ। আজ কিন্তু সত্য সত্যই খবর পাওয়া গেছে টুংরার জন্যে কনে একটা নাকি ঠিক করে ফেলেছে টুয়াই মাঝি, খবরটা আজ-খাঁদী মেঝেনের কাছ

থেকে শুনে এসেছে ভীম মাঝি আকবাড়ীতে জল ধরাতে গিয়ে। টুংরা আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ভীম মাঝির সঙ্গে গোটা কয়েক দরকারী কথাবার্ত্তা সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে টুংরা। সময় আর বেশি নাই মোটে—এর মধ্যে ঝাবড়ুকে একটু তালিম ক'রে নেওয়া দরকার, আরও দু' একটা নতুন রকমের খেলা তাকে শিখিয়ে নিতে হবে, ঝাবড়ুকেও যে বিয়ের সময় যেতে হবে বরিয়াতদের সঙ্গে।

বাড়ী ঢুকে নাচদুয়ারের আগলটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভালুকটাকে উঠানের মাঝখানে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে টুংরা, ভালুকটা তখনও হাঁপাচ্ছে। বেলা প্রায় প্রহর তিনেক হয়ে এলো, থাঁদী মেঝেন মাঠ থেকে এখনো বাড়ী ফিরেনি। দাওয়ার একপাশে জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি জুতোগুলো টুংরা খুলে ফেললে, এতক্ষণ সে টের পায়নি জুতোর চাপে টুংরার পায়ের চারিপাশে বড় বড় কতকগুলো ফোস্কা পড়ে গেছে, জুতোগুলো পা থেকে খুলে টুংরা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। রঙিন ছিটের নতুন জামাখানাও সে তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। ভয়ানক গরম পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কল্ কল্ ক'রে ঘাম ঝরছে টুংরার, পুরো আড়াইটি ক্রোশ পথ বরাবর জামা গায়ে দিয়ে হেঁটে আসছে টুংরা। ঘাম একটু ঝরবারই কথা। জামাখানা দাওয়ার একটা খুঁটির উপর ঝুলিয়ে দিয়ে চাটাই পেতে টুংরা বসে পড়লো, একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে ঝাবড়ুকে আবার তালিম দিতে হবে, সময় যে আর হাতে নাই মোটেই। শাল পাতার একটা চুটি বানিয়ে চকমকির আগুনে ধরিয়ে নিলে টুংরা। বসে বসে আরাম ক'রে চুটিটায় সে দু' একটা মাত্র টান দিয়েছে এমন সময় টুংরার চোখে পড়লো ভালুকটা আবার দাঁত মুখ খিঁচে গা রগড়াতে আরম্ভ করেছে

খুঁটির সঙ্গে। আড়বাঁশীটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল টুংরা, ভালুকটার কাছে গিয়ে দেখে খস্‌খসে খুঁটির গায়ে গা ঘষে ঘষে জামাটা খানিক ছিঁড়ে ফেলেছে ঝাবড়ু। টুংরার মনটা ভয়ানক খিচড়ে উঠলো, ঝাবড়ুকে একটা ধমক দিয়ে টুংরা ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ঝাবড়ু যেন দাঁত খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে এলো টুংরার দিকে। টুংরার মেজাজ গরম হয়ে উঠলো, হাতের আড়বাঁশীটা উঁচিয়ে ধরে জোর ভরতি কষে দিলে টুংরা ঝাবড়ুর মাথায় ঝড়াম করে এক লাঠি। ঝাবড়ুর মেজাজ আরও উগ্র হয়ে উঠলো, যেই টুংরা ঝাবড়ুর সামনে বসে শিকলটা তার টেনে ধরে জামাখানা খুলবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, ঝাবড় অমনি হাঁ ক'রে যেন তেড়ে এলো টুংরাকে, সঙ্গে সঙ্গে পড়লো আর এক লাঠি। ভালুকটা এবার মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো টুংরার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে সে রাগের মাথায় টুংরার বুকে বসিয়ে দিলে প্রচণ্ড এক থাবা। ঝাবড়ুর সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লো টুংরা, ঝাবড়ুর এ বেইমানি তার সহ্য হলো না, টুংরার মেজাজ ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠলো, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আগাপাস্তালা আরম্ভ করলে টুংরা আড়বাঁশী দিয়ে ঝাবড়ুকে বেদম প্রহার। যে জানোয়ার এমন ধারা গোলা গোঁসাই মানে না, মিছেমিছি তাকে তিনসন্ধ্যে আহার জুগিয়ে পুষে রেখে লাভ কি! মরুক বেটা—লাঠি খেয়েই মরুক, টুংরা আজ ওকে আস্ত রাখবে না।

ভালুকটাকে মারতে মারতে আড়বাঁশীটা শেষ পর্য্যন্ত ফেটে ফুটে চৌচির হয়ে গেল। এতেও কিন্তু রাগ পড়লো না টুংরার, ভয়ানক সে চটে গেছে ঝাবড়ুর উপর, এত বড় আস্পর্দ্ধা বেটা জানোয়ারের যে টুংরা মাঝিকে থাবা চালায়। আড়বাঁশীটা ভেঙ্গে যেতেই টান মেরে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে টুংরা, তারপর সে এক লহমায় চড়ে

বসলো হঠাৎ ভালুকটার পিঠের উপর। ভালুকটাকে বাগিয়ে ধরে গা থেকে তার জামাখানা কোন রকমে খুলে ফেললে টুংরা। ভালুকটাও ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, রাগে সে একেবারে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। টুংরা ভালুকটাকে মাটির উপর কাত ক'রে ফেলে গলাটা তার দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলে; টুংরা বনাম ঝাবড়ু, চললো ওদের ধ্বস্তাধস্তি কিছুক্ষণ ধরে; কেউ কারো কাছে হার মানতে চায় না, এমন ধারা ব্যাপার।

টুংরা মাঝির ছুটুমা থাঁদী মেঝেন মাঠ থেকে বাড়ী ফিরছে। সদর দোরের আগুড় ঠেলে বাড়ী ঢুকতেই টুংরার কাণ্ড দেখে সে অবাক হয়ে গেল। ভালুকটার সঙ্গে টুংরা একেবারে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে, ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওরা দুটোতেই, এ যেন ঠিক জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ারের লড়াই। কারণটা ঠিক বুঝতে পারলে না থাঁদী মেঝেন, শশব্যস্তে ছুটে গিয়ে পিছন দিক থেকে তাড়াতাড়ি ডাক দিলে থাঁদী মেঝেন,—টুংরা—টুংরা!

টুংরা তখন ভালুকটার উপর চেপে বসে এলোপাথাড়ি ঘুষি মারতে আরম্ভ করেছে। থাঁদী মেঝেন টুংরার হাত ধরে টানতে টানতে ভালুকটার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দাওয়ার একপাশে বসিয়ে দিলে টুংরাকে। ভালুকটা একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাঠফাটা রোদে খুঁটির একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিব বের ক'রে হাঁপাতে লাগলো ভালুকটা, মুখ দিয়ে ওর অবিশ্রান্ত লালা ঝরছে।

থাঁদী মেঝেন টুংরাকে একটা ধমক দিয়ে বললে,—এ সব তোর কি কাণ্ড বল্ দেখি, এই ক'রেই দেখছি কোন্ দিন হয়ত বিপদ ঘটাবি।

দাঁতে দাঁত চেপে টুংরা বললে,—বেটাকে আজ আমি নিঘাত খুন করবো।

খাঁদী মেঝেন একটু শাসিয়ে বললে,—তেল মেখে আগে চানটা ক'রে আয় দেখি, খাবার আমি ঠাঁই করছি ততক্ষণ।

পাখা দিয়ে খানিক বায়ড় ক'রে টুংরাকে একটু ঠাণ্ডা করলে খাঁদী মেঝেন। তারপর সে তেলের ভাঁড়টা টুংরার দিকে এগিয়ে দিলে। ছোট একটা গামলা ক'রে হেঁসেল থেকে কতকগুলো ভাত বেড়ে খানিকটা পচুই মদের সঙ্গে ভাতগুলোকে চটকে ঝাবড়ুর কাছে নিয়ে গিয়ে গামলাটা তার মুখের সামনে ধরে দিলে খাঁদী মেঝেন। সঙ্গে সঙ্গে গামলায় মুখ ডুবিয়ে চক্ চক্ শব্দে ভাতগুলো খেতে আরম্ভ করলে ঝাবড়ু, এতক্ষণে ওর ধড়ে যেন প্রাণ এলো। ভালুকটাকে একবার জল দেখিয়ে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিয়ে এলো খাঁদী। টুংরা তখন মাথায় খানিকটা তেল রগ্ড়ে গামছা কাঁধে ফেলে চান করতে বেরুচ্ছে।

টুংরাকে খাইয়ে দাইয়ে ঠাণ্ডা ক'রে হাঁড়ি হেঁসেল গুটিয়ে দিলে খাঁদী মেঝেন, বেলা তখন প্রায় পড়ে এসেছে। দাওয়ার একপাশে মাচুলির উপর বসে বসে চুটি ফুঁকছে টুংরা, খাঁদী মেঝেন হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে,—বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে বেটা, কাল যাবে সব লগন বাঁধতে।

টুংরা একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, ভীম মাঝি তা হলে ঠিকই বলেছে। টুংরা একটু মুচকি হেসে বললে,—কালই—লগন তাহলে কালই বাঁধা হবে ?

খাঁদী মেঝেন বললে,—হঁ বেটা, তুইও যাবি ওদের সঙ্গে—কনেটা এক নজর দেখে আসবি।

টুংরা হাসতে হাসতে বললে,—কনে আমার দেখা আছে ছুটুমা, রামপুরের সবাই আমার চেনা।

থাঁদী মেঝেন বললে,—কনে দেখতে যেতে হবে কিন্তু বাগঝাঁপা, ওই গাঁয়েরই লখু মাঝির বিটির সঙ্গে কথা চলছে কিনা, আজ সকাল বেলা লখু মাঝিকে কথা দিয়ে এসেছে তোর গড়ম বাবা।*

বাগঝাঁপার লখু মাঝি, কে সে? টুংরা ত তাকে চেনে না, তার বেটীর সঙ্গেই বা সম্বন্ধ কি টুংরার,—থাঁদী মেঝেন এ বলে কি! টুংরা একটু আশ্চর্য্য হলো, থাঁদী মেঝেনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে একটু গম্ভীর ভাবে সে বলে উঠলো,—ছুটুমা!

থাঁদী মেঝেন সাড়া দিলে,—কি বেটা।

টুংরা একটু অপ্রসন্ন ভাবে সুর টেনে বললে,—ও আবার কি বলছিস, রামপুরের রাবণ মাঝির বিটির সঙ্গেই ত কথাবার্ত্তা চলছিলো।

থাঁদী মেঝেন জবাব দিলে,—রাবণ মাঝির বিটিটা যে দুষী হয়ে গেছে বেটা, বাবা যে ওখানে মত করবেক নাই।

টুয়াই মাঝি মত করবে না, এ আবার কি গোলমেলে কথা। মত ত সে আগেই করেছে, ভীম মাঝি নিজের কানে শুনে এসেছে। ভীম কি তাহলে টুংরার কাছে মিথ্যে বলেছে? কিন্তু মিথ্যে বলবার লোক ত ভীম মাঝি নয়। টুংরা একটু গোলমালে পড়লো। ব্যাপারটা আজ টুয়াঁই মাঝির কাছে পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে টুংরাকে, বাগঝাঁপায় বিয়ে টুংরা করবে না, জান গেলেও না।

মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল টুংরার। ভীম মাঝিকে আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আসবে নাকি,—বাগঝাঁপা, না, রামপুর? রামপুরের কথাই ত সে বরাবর বলে আসছে। দুলালীকে হাতছাড়া করতে কোনমতেই রাজি নয় টুংরা, যে যা বলে বলুক; বিয়ে যদি

* গড়ম বাবা—মাতামহ

করতে হয় টুংরাকে তাহলে ওই রামপুরেই, বাগঝাঁপা ভালুকঝাঁপায় মধ্যে টুংরা মাঝি নাই।

খাঁদী মেঝেন জানে ডুলালীর নামে টুংরা আজও পাগল, ডুলালীর কথা সে ভুলতে পারেনি আজ পর্য্যন্ত। কিন্তু উপায় কি, সেটি যে আর হবার নয়। টুংরাকে নিঝুম মেরে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে খাঁদী মেঝেন বলে উঠলো,—বসে বসে কি ভাবছিস বেটা,—খা আর একটা চুটি খা।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো টুংরা, ভীম মাঝির কাছে একবার যেতে হবে, ভীমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা বিশেষ দরকার। পচুই মদের ভাঁড়টা এনে টুংরার সামনে ধরে দিলে খাঁদী মেঝেন। মদ ত আজ খেতেই হবে টুংরাকে, ডবল মাত্রায় খেতে হবে; একটু নেশা না করলে টুয়াই মাঝির সামনে হয়ত গুছিয়ে সব কথা বলতে পারবে না টুংরা। মদের ভাঁড়টা মুখের উপর তুলে ধরে ঢক ঢক ক'রে পচুই মদ খানিকটা গিলে ফেললে টুংরা, তারপর সে ভাঁড়টা একধারে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে, বেলা পড়ে আসছে।

সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া সেরে ছোট ঘরের দাওয়ায় একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়েছে টুংরা। ভীম মাঝির সঙ্গে তার দেখা হয় নি, শুয়ে শুয়ে টুংরা নিজের মনেই আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো, থেকে থেকে শুধু ডুলালীর কথাই ভেসে উঠছে টুংরার মনে। ডুলালীকে না পেলে টুংরা মাঝি বাঁচবে কেমন ক'রে!

টুয়াই মাঝি এতক্ষণে বাড়ী ফিরলো। খাটিয়ার উপর শুয়ে শুয়েই টুংরা একটু উঁকি মেরে দেখে নিলে। টুয়াই মাঝির খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই রাত হয়ে গেল প্রায় প্রহর দেড়েকের উপর। বড় ঘরের

চালার টুয়াই মাঝির শোবার জন্য একটা মাদুর পেতে দিলে থাদী মেঝেন। টুংরা এখনো ঘুমোয়নি, ইচ্ছে করেই সে জেগে আছে আজ। টুয়াই মাঝি মাদুরের উপর বসে বসে খইনি রগড়াচ্ছে, শোবার আগে একটু চুন-তামাকুল খাওয়া তার বরাবরকার অভ্যাস। ধীরে ধীরে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো টুংরা, টুয়াই মাঝির কাছে কথাটা এবার পাড়তে হবে। থাদী মেঝেনের সঙ্গে টুয়াই মাঝির পরামর্শ চলছে টুংরারই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। টুংরা গিয়ে ধীরে ধীরে টুয়াই মাঝির সামনে দাঁড়ালো।

টুয়াই মাঝির সঙ্গে কথাবার্তা যে টুকু হলো—টুংরার পক্ষে তা লোভনীয় নয়। বাগঝাঁপার লখু মাঝির মেয়ের সঙ্গে টুংরার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, মেয়েটা দেখতে শুনতে ভালই, বয়েস হয়েছে এককুড়ির কাছাকাছি। দেখে শুনে মেয়েটাকে পছন্দ ক'রে এসেছে টুয়াই মাঝি, কথা এক রকম দিয়েই এসেছে; টুংরাকে এবার যেতে হবে টুয়াই মাঝির সঙ্গে বাগঝাঁপায় লগন বাঁধতে।

টুংরার মনটা ভয়ানক দমে গেল, কথাটা তাহলে মিথ্যে বলে নি থাদী মেঝেন। রামপুরে টুংরার বিয়েটা কি তাহলে ভেঙ্গে গেল শেষ পর্য্যন্ত? কিন্তু টুংরা ত ও বিয়ে ভাঙ্গতে চায়নি। বিয়ে যদি করতে হয় টুংরাকে তাহলে ওই রামপুরেই, আর যদি না হয় ত বিয়ে ক'রে কাজ নাই টুংরার। বাগঝাঁপার লখু মাঝির মেয়ে—টুংরার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কেন সেখানে কথা কইতে গেল টুয়াই মাঝি! টুংরা ওসব মানে না, বিয়ে ওখানে করবে না টুংরা, কোনমতেই না।

চুন-তামুকুল শেষ ক'রে একটা চুটি ধরালে টুয়াই মাঝি, চুটি খেতে খেতে টুংরার দিকে চেয়ে সে বললে,—সকালবেলা পাড়ার পাঁচজনকে খবর দিয়ে দে, লগন বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে।

টুংরা মাঝি বহুক্ষণ থেকে ইতস্তত করছে, মনের কথাটা সে খুলে বলতে পারছে না টুয়াই মাঝির সামনে। ফয়সালা কিন্তু এর একটা হওয়া দরকার, এক্ষুনি—দেরি ক'রে লাভ নাই কোন। টুংরা একটু অনুযোগের সুরে বলে উঠলো,—গড়ম বাবা!

টুয়াই মাঝি টুংরার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইলে একটুখানি, বললে,—কিছু বলছিস ?

টুংরা একটু জোর গলায় বলে উঠলো,—বাগঝাঁপায় বিয়ে টিয়ে আমি করবো না, উকথাটি আর বলিস না।

টুয়াই মাঝি একটু বিস্মিত হয়ে বললে,—কেনে বল্ দেখি ?

টুংরা মাঝি জবাব দিলে,—ওখানে ত আগে থেকে কথা হয়নি, কথাবার্ত্তা ত ঠিক হয়ে আছে আর এক জায়গায়।

টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—তার মানে ?

টুংরা বললে,—রাবণ মাঝিকে তুই কথা দিস নাই ?

টুয়াই মাঝি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে সবই, দুলালীকে টুংরা এখনো ভুলতে পারেনি; কিন্তু সেটি যে আর কোনমতেই হবার নয়। টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—কথা আমি সত্যই দিয়েছি রাবণ মাঝিকে, দুলালীর বিয়ের ব্যবস্থা আমাকেই ক'রে দিতে হবে, তার জন্যে ছেলে আমি একটা খুঁজছি।

টুংরা মরিয়া হয়ে বলে উঠলো,—আমার সঙ্গে ওর কথা হয়ে আছে গোড়া থেকেই।

টুয়াই মাঝি একটু গম্ভীর ভাবে বললে,—সে আর হয় না, পঞ্চগেরামী সমাজ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে দুলালীর বর হবে কানা, কিম্বা খোঁড়া, কিম্বা কুঠে বা ওই রকমেরি একটা কিছু; এই তার শাস্তি।

টুংরা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—কানা—খোঁড়া—কুঠে,—এ তুই কি বলছিস গড়মবাবা!

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—খাঁটি কথাই বলছি।

টুংরার মাথাটা যেন বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগলো, কানা—খোঁড়া—কুঠে? তাহলে যে টুংরার আর কোন আশাই নাই। টুংরা একটা ঢোক গিলে বললে,—এই কি তোদের শেষ কথা, গড়ম বাবা?

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—এর উপর আর কথা নাই।

টুংরার মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো, জোর গলায় বলে উঠলো টুংরা,—ইটা কিন্তু রীতিমত জুলুম।

টুয়াই মাঝি একটু রূঢ়কণ্ঠে বললে,—চুপচাপ শুয়ে পড়্‌গে যা, রাত হয়েছে।

টুংরা মাঝি বললে,—বাগঝাঁপায় বিয়ে কিন্তু করবো না আমি, এখন থেকেই বলে রাখছি।

টুয়াই মাঝি কিছুক্ষণ টুংরার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে,—তা বেশ, কাল আমি ওদের জবাব দিয়ে দিব।

"টুংরা আর বেশি কিছু বলতে পারলে না, ওর বুকের ভিতরটায় কে যেন হাতুড়ির ঘা দিতে লাগলো; হতাশ ভাবে টুয়াই মাঝির দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো টুংরা। খাঁদী মেঝেনকে লক্ষ্য ক'রে টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—ওকে শুইয়ে দিয়ে আয়।

খাঁদী এসে সামনে দাঁড়াতেই ভাঙ্গাগলায় বলে উঠলো টুংরা,—ছুটু মা!

খাঁদী মেঝেন টুংরার হাত ধরে বললে,—রাত হলো বেটা, শুবি চল্‌।

টুংরা বুঝি এবার ঝর ঝর ক'রে কেঁদেই ফেললে। টুয়াই মাঝির পাথরের মত শক্ত বুক খানা হঠাৎ যেন একটু দুলে উঠলো, তার অজ্ঞাতেই ঝরে পড়লো একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু উপায় নাই, কোন উপায় নাই।

রাত তখন অনেক। কৃষ্ণ পক্ষের জমাট বাঁধা গাঢ় অন্ধকার একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে, মিট মিটে তারার আলো, ঝাপসা হয়ে আছে আকাশ খানা। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল বাতাস একটানা অন্ধকারের বুকে লুটোপুটি খেতে খেতে হঠাৎ যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, মন্থর হয়ে উঠেছে তার গতি; চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব, ধরিত্রীর চোখে যেন সবেমাত্র আলস লেগেছে। নিখিল বিশ্ব চরাচরব্যাপী সীমা-হীন স্তব্ধতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে প্রকৃতি যেন পাহারা দিচ্ছে দিগন্ত বিথারী তার কালোরঙের ডানার মধ্যে ঢেকে। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, সাঁওতাল পাড়া নিঝুম। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে কোন্ এক ঘরছাড়া হ্যাংলা কুকুরের উৎকট ঘেউ ঘেউ শব্দ অন্ধকারের বুক চিরে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

টুংরার চোখে ঘুম নাই, খাটিয়ার উপর পড়ে পড়ে চোখ বুজে সে দুলালীর কথাই ভাবছে। শয়তান মোহন মাঝি টুংরার বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো টুংরার কলজেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে, সে আঘাত আজো ভুলতে পরে নি টুংরা, মোহন মাঝির দুশমনি কোনমতেই সে ভুলতে পারে না। আজ কিন্তু একা মোহন মাঝিই নয়, টুংরার আজ ঘরে বাইরে শত্রু, টুয়াই মাঝি পর্য্যন্ত চরম দুশমনি আরম্ভ করেছে টুংরা মাঝির সঙ্গে। দুলালীর সে বিয়ে দিতে চায় অন্য কারো সঙ্গে, টুংরা মাঝি বাতিল। কি আশ্চর্য্য! যার সঙ্গে দুলালীর বিয়ে হবে সে নাকি হবে কানা কিম্বা খোঁড়া কিম্বা কুঠে—কি ভয়নক কথা। এই নাকি ওদের আইন। কোথাকার এক কানা খোঁড়া এসে লুটে নিয়ে

যাবে দুলালীকে টুংরার চোখের উপর দিয়ে, আর টুংরা—পারবে টুংরা চোখ বুজে তাই সহ্য করতে! টুয়াই মাঝি যে দুলালীর জন্যে কানা ছেলেই খুঁজছে, খোঁড়া ছেলের সন্ধান করছে, হয়ত বা কোন্ কুঠেকেই ধরে নিয়ে আসবে শেষ পর্য্যন্ত যেথান থেকে হোক। দুলালীর বিয়ের ভার যে এখন টুয়াই মাঝির উপর। কেউ এরা বুঝলে না টুংরার মনের কথা, বুঝতে কেউ চাইলে না টুংরা কি চায়; টুংরা যে পাগল, সবাই বলে টুংরা মাঝি আস্ত একটা পাগল, টুংরার নাকি ছিট আছে মাথায়; হবে হয়ত। কিন্তু দুলালীকে যে কোন মতেই ভুলতে পারছে না টুংরা, টুংরা যে তাকে ভালবাসে। কে বলবে এও হয়ত পাগলের এক পাগলামি, কিন্তু টুংরা মাঝি সত্যি তাকে ভালবাসে, দুলালীর জন্যে হাসতে হাসতে জান দিতে পারে টুংরা। কিন্তু টুয়াই মাঝি কি বুঝবে তার মনের কথা, টুংরার এ ভালবাসার কিছুমাত্র কি দাম আছে টুয়াই মাঝির কাছে। তার চাই কানা ছেলে—খোঁড়া বর—কুঠে জামাই, সমাজের বিধান। তাই হোক, কানা ছেলেই পাবে টুয়াই মাঝি; টুংরা তাকে কানা ছেলেই যোগাড় ক'রে দেবে, টুংরার এতে যত ক্ষতিই হোক।

ধীরে ধীরে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়লো টুংরা। তার কানে এসে বাজছে যেন অস্পষ্ট নিশির ডাক, কে যেন জোর ক'রে ঘুম থেকে তুলে দিলে টুংরাকে; তাকে যে আজ তৈরি হতে হবে—যেমন ক'রে হোক তৈরি হতে হবে, আর দেরি নয়—আজ রাত্রের মধ্যেই।

উঠানের এদিক ওদিক একটু ঘুরে ফিরে নিলে টুংরা, কেউ কোথাও জেগে নাই; খাঁদী মেঝেন ঢেঁকি শালে নিঃসাড়ে পড়ে আছে ছেঁড়া একখানা মাদুরের উপর, বড় ঘরের দাওয়ায় টুয়াই মাঝির একটু একটু নাক ডাকছে।

উঠান বেয়ে পা টিপে টিপে আবার ফিরে এলো টুংরা, নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো সে তার ছোট্ট ঘরটার সামনে। দরজার পাল্লা দুটো ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়লো টুংরা ঘরের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলে আবার দরজাটা। ঘরে ঢুকেই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেশ্‌লাইটা খুঁজে নিলে টুংরা, পশ্চিম দিকের ছোট্ট জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা সে দেশ্‌লাইয়ের কাঠি দিয়ে ধরিয়ে নিলে। আচমকা যেন টুংরা একটু চম্‌কে উঠলো, টুংরা কি ভয় পাচ্ছে? না—না—ভয় ত সে পাচ্ছে না, ভয় পেলে যে চলবে না টুংরার। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে উঠতেই দেওয়ালে টাঙ্গানো কাঁড় ধনুক গুলোর উপর নজর পড়লো টুংরার, মুহূর্তের জন্য সে কি যেন একটু ভেবে নিলে, চোখদুটো ওর জ্বলে উঠলো। ছোট বড় মাঝারি তিনটে ধনুক, লোহার গজালে আটকানো গোটা পাঁচেক কাঁড়ভরতি বাঁশের চোঙা পাশাপাশি দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। বাঁশের চোঙার পাশে ঝকঝকে এক খানা ঝালদার টাঙ্গি, বাঘ মেরে টুংরা এই টাঙ্গি বখশিশ পেয়েছে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। গোটা তিনেক বল্লমও ঠেসানো আছে একধারে ঘরের এক কোণে। তীরন্দাজ টুংরা মাঝির শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম এই ঘরেই সে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রেখেছে, এ ঘরখানা তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, এই তার অস্ত্রশালা। চোঙা থেকে বেশ ধারালো দেখে তীর এব বাছাই ক'রে নিলে টুংরা, শান পাথরে ঘষে ঘষে ফলাটা আর একটু চকচকে ক'রে নিলে, তীরের ডগাটা হয়ে উঠলো ছুঁচের মত সরু। এইবার ঠিক হয়েছে, এই আজ পারবে টুংরার মনের আশা মেটাতে।

তীরটাকে দেওয়ালের গায়ে ঠেসিয়ে হাতের কাছেই রেখে দিলে টুংরা। তারপর সে কাঠের একটা ভাঙ্গা বাক্স থেকে বের করলে

ছোট্ট মত একটা আয়না। বাক্সের ডালার উপর কেরোসিনের আলোটা একপাশে নামিয়ে রেখে আয়নার পিছন দিকে একটা ঠেকা দিয়ে আয়নাটাকে খাড়া ক'রে দিলে টুংরা বাক্সের ঠিক মাঝখানটায়। আয়নার সামনে বসে বসে নিজের মুখখানা একবার ভালো ক'রে দেখে নিলে টুংরা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, চুলগুলোতে ভাল ক'রে চিরুনি পড়েনি আজ ক'দিন থেকে, টুংরার মুখ খানা তার নিজের চোখেই যেন শুকনো ঠেকছে, চেহারা খানা হয়ে উঠেছে ঝড়ো কাকের মত। জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলছে টুংরার চোখ দুটো, আয়নার মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। টুংরার তালিম করা শিকারী চোখ, জঙ্গলে শিকার করবার সময় ঠিক এই ভাবেই জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলতে থাকে বাঘের চোখের মত, দৃষ্টি তার তীরের মতই তীক্ষ্ণ। এই চোখ মানুষের কত কাজেই না লাগে, চোখ যার নাই লোকে বলে তাকে অন্ধ। অন্ধরা ত কাঁড় ধেনুক চালাতে পারে না? কাঁড় ধেনুক ওরা চালাবে কেমন ক'রে, চোখে দেখতে পেলে ত! আদপে যে ওরা দেখতেই পায় না,—কি সাংঘাতিক!

আয়নার সামনে মুখ রেখে নিজের চোখদুটোকে আর একবার দেখে নিলে টুংরা, চোখ তার ঠিকই আছে। হঠাৎ কি মনে ক'রে ধীরে ধীরে চোখ দুটো একবার বুজে ফেললে টুংরা; অন্ধকার—চারদিকে শুধু ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। জ্বল্ জ্বল্ ক'রে আলো জ্বলছে টুংরার সামনে, এক ফোঁটা আলো কিন্তু চোখ বুজে সে দেখতে পাচ্ছে না, সমস্তই অন্ধকারে ঢাকা। টুংরার মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন সে ডুবে গেছে একটা অন্ধকার কুয়োর মধ্যে, টুংরাকে যেন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে টুংরা যেন হাঁপিয়ে উঠলো, অন্ধলোকগুলো দিনরাত এই অন্ধকার কুয়োর মধ্যে ডুব মেরে এইভাবে দিনের পর

দিন বেঁচে থাকে কেমন ক'রে, আশ্চর্য্য! টুংরা আবার তাড়াতাড়ি চোখ মিলে তাকালো, আঃ কি আরাম, এইত সে দিব্যি আবার দেখতে পাচ্ছে। অন্ধের চেয়ে কানা কিন্তু ঢের ভালো, কানা লোকগুলো একটা চোখে তবু দেখতে পায়, দেখতে হয়ত ভালই পায়, কাজকর্ম্ম কোন কিছুই আটকায় না তাদের।

ডান হাতের চেটো দিয়ে নিজের ডান চোখটা হঠাৎ চেপে ধরলে টুংরা, চোখটা সে একেবারে বন্ধ ক'রে দিলে। এরি নাম কানা, একটা চোখ না থাকলেই কানা; কিন্তু একটা চোখ বন্ধ করেও সব কিছুই ত দেখতে পাচ্ছে টুংরা, তবে আর ক্ষতিটা কি? কোন ক্ষতি নাই, এতেই টুংরার কাজ চলে যাবে। লোকে বলবে কানা—তা বলুক, লোকের কথা গ্রাহ্য করে না টুংরা। ঢুলালীর জন্যে চোখ যদি একটা উপড়ে ফেলতে হয় টুংরাকে, সেটা কি তার পক্ষে খুবই একটা কঠিন কাজ হবে? কঠিন হয়ত হবে একটু, কিন্তু উপায় নাই, টুয়াই মাঝি যে ঢুলালীর জন্যে কানা ছেলেই চায়। ভেবে আর লাভ নাই কোন, ঢুলালীকে পেতে হলে এ ক্ষতিটুকু টুংরাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে, টুংরা সে জন্য প্রস্তুত।

ডান-হাতি পূবধারের দেওয়ালে ঠেসানো ঝক ঝকে তীরটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে টুংরা। আয়নার সামনে মুখ রেখে ডান চোখের মনিটাকে লক্ষ্য ক'রে তীরের ডগাটা সে চোখের কাছে [illegible]য়ে ধরলে। টাটকা শানধরানো তীরের ফলা ঝক ঝক ক'রে উঠলো লম্ফের আলো লেগে, ছুঁচুলো ওর ডগাটা যেন লক লক করছে সাপের জিবের মত। এই তীর দিয়ে কত জানোয়ারকেই না ঘায়েল ক'রে দিয়েছে টুংরা, ঝিঙেফুলি বাঘ পর্য্যন্ত সে সাবাড় ক'রে দিয়েছে একটি তীরেই। আজ কিন্তু বাঘ নয়, ভালুক নয়, বনবরা বা শামকল পাখী নয়, টুংরার আজ

শিকারের লক্ষ্য তার নিজেরি একটা চোখ। পারবে না টুংরা জোর ক'রে এই তীরটা চোখে বসিয়ে দিতে? পারবে, এটুকু যে তাকে পারতেই হবে। টুংরার সামনে হঠাৎ কে যেন এসে দাঁড়ালো না? কার যেন ছায়া পড়লো সামনের দেওয়ালে,—কে ও? টুংরার চোখের সামনে কার ও ছায়ামূর্ত্তি? ও যে দুলালী, দুলালী যেন টুংরার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে; কি মিষ্টি তার হাসি, টুংরা যে একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তাকে; টুংরার দিকে এক দৃষ্টে করুণ ভাবে চেয়ে আছে দুলালী। কি সে চায় আজ টুংরার কাছে? টুংরার এই চোখটা? তাই দেবে, দুলালীকে আজ খালি হাতে ফেরাবে না টুংরা, কোনমতেই না।

তীরটাকে দু'হাত দিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে ডগাটা তার চোখের সামনে উঁচিয়ে ধরলে টুংরা,—চোখটা তার বুজে গেল কেন হঠাৎ? টুংরার কি হাত কাঁপছে? না—না—হাত ত তার কাঁপেনি, হাত টুংরার কাঁপবেনা।

আয়নার দিকে লক্ষ্য রেখে দেহ মনের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ডান চোখের মনির উপর তীরটাকে হঠাৎ ঘ্যাচ ক'রে বসিয়ে দিলে টুংরা, ফলাটা প্রায় আধখানা সেঁধিয়ে গেল চোখের মধ্যে। তীরটা টেনে তুলতেই ফিং দিয়ে রক্ত ছুটলো, ডানহাত দিয়ে চোখটাকে চেপে ধরলে টুংরা, হঠাৎ সে ভয় পেয়ে যেন আঁতকে উঠলো নিজের মনেই। খেয়ালের ঝোঁকে হঠাৎ আজ একি কাণ্ড ক'রে বসলো টুংরা! কাজটা কি বেশ ভাল হলো? টুংরার মন সায় দিয়ে বললে,—ঠিক হয়েছে। কিন্তু একি, রক্ত যে আর কোনমতেই বন্ধ হতে চায় না। মেটে ঘরের শুকনো মাটি ভিজে গেল টুংরার চোখের রক্তে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো টুংরা। টুংরা কি

সত্যি সত্যি কানা হয়ে গেল? তা হয়ত গেল, তা যাক—তার জন্ত কোন আপসোস নাই টুংরার, দুলালীর জন্য সে কি না করতে পারে। চোখের জ্বালা কিন্তু ক্রমশই বেড়ে চললো, এ যে আর কোনমতেই সহ্য করতে পারছে না টুংরা। মেঝের উপর পড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো টুংরা, হাত বাড়িয়ে কোন রকমে দরজাটা খুলে বার দিকে সে বেরোবার চেষ্টা করতে লাগলো। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না টুংরা, হাত পা গুলো থর থর ক'রে কাঁপছে, ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে টুংরা আবার দরজার উপর মুখ থুবড়ে সেই খানেই গড়িয়ে পড়লো। চৌকাঠের উপর মাথা রেখে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে টুংরা হঠাৎ জোর গলায় চীৎকার করে উঠলো,—গড়ম বাবা—গড়ম বাবা!

টুয়াই মাঝিকে জাগাতেই হবে, সে এসে একবার দেখুক টুংরা মাঝি নিজের হাতে চোখ একটা উপড়ে ফেলেছে, কানা ছেলে যে তার দরকার। টুংরা প্রাণপণ শক্তিতে জোর গলায় আর একবার চীৎকার ক'রে উঠলো,—গড়ম বাবা—গড়ম বাবা!

টুয়াই মাঝির ঘুম ভেঙ্গে গেল আচম্বিতে, কে যেন কাকে ডাকছে। টুংরার গলা না? টুয়াই মাঝি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানার উপর। উঠানের ওদিক থেকে কি রকম যেন একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। টুংরার ঘরে আলো জ্বলছে না? আবার সেই গোঙানির শব্দ। টুয়াই মাঝি জোর গলায় একটা হাঁক দিলে,—ধাঁদী—ধাঁদী!

টুয়াই মাঝি হঠাৎ কিছু বুঝে উঠতে পারলে না, তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়ালো, ছুটতে ছুটতে টুংরার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বুকটা তার দুর দুর ক'রে কেঁপে উঠলো হঠাৎ; দরজার মাঝখানটায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে টুংরা, চৌকাঠের বার দিকে মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে। ঘরের ভিতর থেকে লম্ফের আলোটা তাড়াতাড়ি বাইরে

এনে এদিক ওদিক একটু দেখে নিলে টুয়াই মাঝি। মেঝের উপর রক্তের ছড়াছড়ি, রক্ত মাখানো ঝকঝকে তীর একটা দরজার পাশে পড়ে রয়েছে, টুংরার মুখ চোখ ভেসে গেছে রক্তে। টুয়াই মাঝি ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো; এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড! ধপ্ ক'রে সেই খানেই বসে পড়লো টুয়াই মাঝি, টুংরার মাথাটা কোলের উপর তুলে ধরে ব্যগ্রকণ্ঠে সে ডাকতে লাগলো,—টুংরা—টুংরা!

সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না কিছু মাত্রই। টুংরার ডান চোখের কোণ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে রক্ত ঝরছে। আলোটা টুংরার মুখের সামনে তুলে ধরে চোখের পাতাটা তার একটু খানি ফাঁক ক'রে দিতেই গল্ গল্ ক'রে আরও খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়লো। টুয়াই মাঝি একটু লক্ষ্য ক'রে চেয়ে দেখলে টুংরার চোখের মধ্যে গর্ত্ত হয়ে গেছে অনেক খানা। টুংরার অবস্থা দেখে টুয়াই মাঝি আঁতকে উঠলো, জোর গলায় সে ডাক দিলে আবার,—খাঁদী—খাঁদী!

ঢেঁকি-শাল থেকে সাড়া দিলে খাঁদী মেঝেন। টুয়াই মাঝি ব্যস্তভাবে বলে উঠলো,—এক ঘটি জল আর একটা পাখা, শিগগীর নিয়ে আয়—খুব শিগগীর।

তারপর সে টুংরার কানের কাছে মুখ রেখে আকুলকণ্ঠে ডাকতে লাগলো আবার,—টুংরা—টুংরা!

টুংরার চৈতন্যের লেশমাত্র নাই, বহুক্ষণ আগেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

দশ

ছোট্ট একটি কুঁড়ে। রামপুর সাঁওতাল-পল্লীর পশ্চিম প্রান্তে প্রকাণ্ড যে মহুলের বাগানটা সরাসরি প্রায় কাঁদরের ধারে গিয়ে ঠেকেছে, সেই বাগানের শেষ প্রান্তে ফাঁকা ময়দানের উপর কুঁড়ে একখানা বাঁধা হয়েছে কাঁদরের ঠিক তীর ঘেঁষে। ছোট্ট এই কাঁদর—নিতান্ত অপরিসর একটা পার্ব্বত্য নদী, ছোট ছোট পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে স্রোত জোগায় এই পাহাড়ী নদীর বুকে। বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায় কাঁদরের জল। বৎসরের বাকি সময়টা কাঁদরের বুকে জমে থাকে শুকনো বালির স্তূপ, কাঁদর থেকে জল পাবার দরকার হলে উপরের শুকনো বালিগুলো সরিয়ে দিয়ে একটু খানি খুঁড়ে নিতে হয়। রামপুর গাঁ ছেড়ে মহুল বাগান পার হয়ে এসে নির্জ্জন এই কাঁদরের ধারে দুলালীর জন্য কুঁড়ে একখানা তোলা হয়েছে, লোকালয়ের সঙ্গে আজ আর তার কোন সম্পর্ক নাই, সমাজ থেকে সে বিতাড়িত। সর্দ্দার রাবণ মাঝি চেয়েছিলো দুলালীকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিতে, যেখান থেকে দুলালীর বার্ত্তাটুকু পর্য্যন্ত তার কানে এসে না পৌছয়। সমাজ কর্ত্তারা কিন্তু রাবণ মাঝির এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি, দুলালীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে দশ জনের চোখের সামনে থেকে। তাই ইচ্ছা ক'রেই গ্রামের এক প্রান্তে জঙ্গলের ধারে একদম ফাঁকার মধ্যে দুলালীর বসবাসের জন্য কুঁড়ে ঘর একখানা তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট ওই কাঁদরের ধারে। সমাজের বিধি বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে, সমাজের মুখে চুন কালি দিয়ে যে দুশ্চারিনী এমন ভাবে কুলত্যাগ করে

অনায়াসে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে ; সাঁওতালী সমাজ তাকে ক্ষমা করে না।

পাথরডি কলিয়ারি থেকে দুলালীকে ধরে আনার পর জোর ক'রে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত এক সুলোর সঙ্গে। বিয়ের আগে মেয়েদের চরিত্র স্খলন সাঁওতালী সমাজে ভয়ানক একটা গুরুতর অপরাধ, এ অপরাধের সামাজিক শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। তাই সমাজের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিকলাঙ্গ ছেলে একটা যোগাড় করে নিতে হয়েছে দুলালীর জন্য, অনেক খোঁজাখুঁজির পর টুয়াই মাঝি শেষ পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে এসেছে এক বাতিকগ্রস্ত বিয়ে-পাগলা সুলোকে ; বাধ্য করা হয়েছে দুলালীকে কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত পঙ্গু নাচার ওই সুলোর গলায় মালা দিতে। এই তার শাস্তি, জীবন্ত ওই বোঝার ভার আজীবন তাকে বয়ে যেতে হবে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, এখন থেকে সুলোকে নিয়েই ঘর করতে হবে তাকে সারাজীবন ধরে ; সুলো মাঝি তার সাঙা-করা স্বামী।

টুয়াই মাঝির এই অদ্ভুত প্রস্তাবে রাবণ মাঝি কোনমতেই রাজি হতে পারেনি, প্রথম দিকটায় সুলোর চেহারা দেখে সে আঁতকে উঠছিলো ভয়ে। কি কদর্য্য চেহারা ওই সুলো মাঝির, হাতের আঙুলগুলো তার কুষ্ঠ রোগে ক্ষয়ে গেছে একেবারেই, আঙুলের চিহ্ন মাত্র নাই। ডানপায়ের ডগায় পুরু ক'রে খানিকটা ন্যাকড়া জড়ানো, বাঁ পায়েও গোটাতিনেক আঙুল প্রায় নাই বললেই হয়। নাকটা সুলোর থ্যাবড়া হয়ে গেছে কালব্যাধির চাপে, ঠোঁট দুটো হয়ে উঠেছে অসম্ভব পুরু, বিধাতার ক্রুদ্ধ অভিশাপ সর্ব্বাঙ্গে যেন তার চিত্রিত হয়ে ফুটে উঠেছে দুষিত চামড়ার আবরণ ভেদ ক'রে রক্তমুখী রেখায় রেখায়। রাবণ মাঝি হাতজোড় ক'রে অনুরোধ করেছিলো সমাজ চাঁইদের কাছে সুলোর মত ছেলের হাতে যেন দুলালীকে

তুলে দেওয়া না হয়, বড়জোর একটা কানা কিম্বা খোঁড়া কিম্বা,—কিন্তু কোন আপত্তিই শেষ পর্য্যন্ত টেঁকলো না রাবণ মাঝির, হুলোর সঙ্গেই দুলালীর বিয়ে তাকে দিতে হলো। রাবণ মাঝির বুকখানা পাথর হয়ে গেছে, এও তাকে আজ সয়ে নিতে হলো, সয়ে হয়ত নিতে হবে ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু। সর্দ্দার রাবণ মাঝি নিজেও যে একজন সমাজের বিধানকর্ত্তা, সমাজের মঙ্গলের জন্য কঠোর না হয়ে তার উপায় নাই। সমাজের এ বিধান মেনে নিতে রাবণ মাঝির বুকটা যেন ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু উপায় নাই,—কোন উপায় নাই। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস জোর ক'রে তাকে বুকের মধ্যে চেপে রাখতে হয়েছে, চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে রাবণ মাঝির কর্ত্তব্যের প্রচণ্ড প্রদাহে। বৃদ্ধ টুয়াই মাঝির কাছে প্রতিশ্রুতি সে ভঙ্গ করেনি, বিক্ষুব্ধ সমাজপতিদের কঠোর বিধান মাথা পেতে গ্রহণ করেছে রাবণ মাঝি, সামাজিক বিধানের খোঁটায় নির্ম্মম ভাবে বলি দিয়েছে সে নিজের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে। একটা মাত্র মেয়ে, বানের জলে ভেসে গেল সেও। তা যাক, মনে মনে সান্ত্বনা একটা খুঁজে নিয়েছে রাবণ মাঝি,—দুলালী বলে মেয়ে তার একটা ছিলো, আজ কিন্তু সে বেঁচে নাই, রাবণ মাঝির কাছে মরে সে একদম ভূত হয়ে গেছে। তা যাক—রাবণ মাঝির কোন দুঃখ নাই, রাবণ মাঝি সুখ দুঃখের বাইরে।

হুলোকে দেখে দুলালীর সে কি আতঙ্ক, সে কি তার কান্না। এর চেয়ে যে তাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে হাত পা বেঁধে ঠেলে দেওয়া অনেক ভালো ছিলো। হুলোর সঙ্গে দুলালীর বিয়ে, এ ও কখনো সম্ভব! বিয়ের নামে সমাজের এ অত্যাচার, শাস্তির নামে সমাজের এ রীতিমত জুলুম। এ জুলুম আজ সইতে হলো দুলালীকে, আজ যে তার দাঁড়াবার আর এতটুকু জায়গা নাই কোথাও। রাবণ মাঝিও শেষ পর্য্যন্ত বইতে

পারলে না দুলালীর বোঝা, বাপের ভিটেয় এতটুকু ঠাঁই হলো না তার। দুলালী আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কোথায় তার নিরাপদ আশ্রয়। আশ্রয় যে দিয়েছিলো তাকে অন্তরের গভীরতম কোণে একান্তে চুপি চুপি কাছে ডেকে, মন তার ভরে দিয়েছিলো অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে, জীবনের সব কিছু পিছনে ফেলে একমাত্র দুলালীকে সম্বল ক'রে স্বেচ্ছায় যে একদিন হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো অন্ধকারের অথৈ দরিয়ায় সহস্র ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় ক'রে, তাকে যে আজ বহুদূরে ফেলে এসেছে দুলালী। সেই যে তার দুনিয়ার সব থেকে বড় আশ্রয় সে কথা কি ভুলেও একবার ভেবে দেখেছিলো দুলালী—যেদিন সে পাথরডিঙ্গির ফাঁকা ধাওড়ায় মোহনকে একা ফেলে রাবণ মাঝির সঙ্গে রাগ ক'রে চলে এসেছিলো! কি ভুলই না করেছে সেদিন দুলালী। কিন্তু ভুল যদি সে একটা করেও থাকে—মোহন তাকে একলাটি এমন ভাবে ছেড়ে দিলে কেন? জোর ক'রে যদি দুলালীকে সে ধরে রাখতো, কার সাধ্য ছিলো মোহনের বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে লাভ নাই কোন, দুলালী জানে মোহনকে সে হারায়নি, মোহনকে সে হারাবে না কোন দিনই। দুলালীর মন বলছে আবার তাকে ছুটে আসতে হবে দুলালীর কাছে। সামাজিক বিধানের এই নাগপাশ থেকে মুক্তি যে দুলালীকে পেতেই হবে। সমাজের এ অত্যাচার চোখবুজে কখনই সহ্য করবে না দুলালী। মুক্তির [illegible] সে ক'রে নিতে পারতো নিজের জীবন দিয়ে, কিন্তু স্বকুরনিকে সে কার হাতে ছেড়ে দিয়ে যাবে। শুধু মেয়েটার মুখ চেয়ে সব কিছু আজ সয়ে নিতে হলো দুলালীকে। মোহন যদি ফিরে আসে কোনদিন এ মেয়ের ভার তারই হাতে তুলে দেবে দুলালী। মোহনের জীবনে দুলালীর প্রয়োজন যদি শেষ হয়েও থাকে তাতেও দুলালীর আপসোস

নাই কোন, সুন্দরমনিকে মোহনের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত। তারপর সে ভেবে চিন্তে নিজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা একটা ক'রে নিতে পারবে, সামাজিক বিধানের বেড়া জালে ঘিরে কার সাধ্য দুলালীকে আটকে রাখে সে দিন। ফুলোর সঙ্গে সম্বন্ধ কি তার, কিছু মাত্র না; সমাজের মাতব্বররা জোর ক'রে যে যা বলে বলুক, দুলালী জানে ফুলো মাঝি তার কেউ নয়। ফুলোর সঙ্গে জোর ক'রে দুলালীর বিয়ে দেওয়া—এ শুধু দুলালীর বাইরেটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, দুলালীর কাছে কতটুকু তার মূল্য। ফুলোর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে না দুলালী, দুলালীর চোখে নিতান্তই সে দয়ার পাত্র, এর বেশি কিছু নয়। অবস্থার চাপে পড়ে ফুলোর বোঝা আজ ঘাড় পেতে নিতে হয়েছে দুলালীকে। রাবণ মাঝি পর্যান্ত দুলালীর সঙ্গে যে এতখানা শত্রুতা করবে একথা কোনদিন ভবতে পারেনি দুলালী। দুলালীর জীবনে আজ মহা এক দুর্যোগের কাল রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু সহস্র বিপদের ঝড়ঝঞ্ঝা ঠেলে যেমন ক'রে হোক দুলালীকে বেঁচে থাকতে হবে, ধৈর্য্য সে হারাবে না কোনমতেই। সাময়িক একটা ঝোঁকের বশে মোহনকে সে দূরে ফেলে চলে এসেছে, কিন্তু একান্ত উন্মুখ ঘরছাড়া মনখানি তার সব সময় যে পড়ে আছে তারই কাছে। দুলালী জানে সকল অভিমান মন থেকে ঝেড়ে ফেলে মোহনকে একদিন ছুটে আসতে হবে দুলালীর কাছে আসতেই হবে। রাবণ মাঝি বাপ হয়ে যে শত্রুতা করেছে আজ দুলালীর সঙ্গে, দুলালীর মনে চিরদিন তা শেল হয়ে জেগে থাকবে, এ ক্ষত যে মুছবার নয়। রাবণ মাঝি এও আজ পারলে! দুলালীও পারবে, এ যে তার জীবনের মহা এক অগ্নি পরীক্ষা। তাই হোক, ফুলো মাঝিকে নিয়েই ঘর সংসার পেতে বসবে দুলালী, ফুলোর বোঝা সে প্রাণপণে টেনে যাবে যতদিন পারে।

পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে চোখ মিলে দেখুক—সর্দ্দার রাবণ মাঝির মেয়ে সমাজের বাইরে গিয়ে ঘর বেঁধেছে কুষ্ঠ রোগী এক হুলোর সঙ্গে। এতে যদি সাঁওতাল সর্দ্দার রাবণ মাঝির উঁচু মাথা আরও খানিকটা উঁচু হয়ে উঠে উঠুক, দুলালী তাতে বাধা দিতে চায় না। দুলালী জানে মনে প্রাণে সে নিষ্পাপ, এই সান্ত্বনাটুকু সম্বল ক'রেই সব কিছু সে সয়ে নিতে পারবে। দেবতার কাছে মনে মনে এইটুকু শুধু প্রার্থনা করে দুলালী—মোহন যেন তাকে ভুল না বোঝে, বাইরের লোকে যে যা বলে বলুক, সব দুঃখু ভুলে যাবে দুলালী—মোহন যদি আবার তাকে তেমনি করে কাছে টেনে নেয়।

সকাল বেলা ভরপুর একপেট পান্তা ভাত খেয়ে ছাগল চরাতে বেরিয়ে যায় হুলো মাঝি। বন জঙ্গল ডাঙ্গা ডহর ঘুরে ঘুরে সারা দিন সে নিজের মনেই ছাগল চরিয়ে বেড়ায় বাঁশের একটা লাঠি বগলে। ফিরবার মুখে কাঁদরের ডোবায় ছাগলগুলোকে একবার জল দেখিয়ে কুঁড়েয় সে আবার ফিরে আসে সন্ধ্যা লাগবার আগেই। এ এক রকম ভালই আছে হুলো, দিন তার কেটে যাচ্ছে বেশ আনন্দেই। গাঁয়ের ভিটেয় এতকাল সে কি সুখেই বা ছিলো, না একটা ভাই বন্ধু, না একটা ছেলে পিলে পরিবার, না একটা কিছু। তালপাতার ভাঙ্গা চালায় পড়ে পড়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও মৌখিক একটা তত্ত্বতলাস করবার মানুষ ছিলো না কেউ। দেড় কুড়ি প্রায় বয়েস হলো হুলোর কারো হাতের দুটো রাঁধা ভাত একটি দিনের জন্যও জুটেনি হুলোর ভাগ্যে, বরাবর তাকে নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে হাত পুড়িয়ে খেতে হয়েছে। তাও হয়ত কোনদিন দুটো জুটতো, কোনদিন বা ঢক ঢক ক'রে একঘটি জল খেয়েই দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকতে হতো ফুটো চালায় ছেঁড়া একটা তালাই পেতে। লোকটা যে কখন মরছে বা বাঁচছে ভুলেও কখনো উঁকি মেরে একটু খোঁজ নেয়নি কেউ। এমন ভাবে একা একা বেঁচে থাকার মানে

হয় না কোন। মাঝখানে তাই বিয়ের জন্যে একবার চেষ্টা করেছেলো সুলো বছর পাঁচসাত আগে, ডানহাতের আঙ্গুলগুলো তার তখনো পর্য্যন্ত ঠিকই ছিলো বেবাক, বাঁ হাতটা সবে তখন একটু একটু ক্ষইতে আরম্ভ করেছে। কনে একটা দেখে শুনে যোগাড় ক'রে ফেলেছিলো সুলো, দেখতে শুনতে চেহারাটাও তার মন্দ ছিলো না, খালি দোষের মধ্যে চোখ দু'টি তার কানা,—কানা মানে একেবারেই অন্ধ। প্রথম দিকটায় সুলো কিন্তু খুব ঝুঁকেছিলো, কানা কানাই সই, হাত ধয়ে ধরে ঘর সংসারের কাজকর্ম কোন রকমে সে চালিয়ে নিতে পারবে, ফুটো চালায় পড়ে পড়ে সময় অসময় দুটো সুখ দুঃখের কথা কইবার তবু ত একটা সঙ্গী পাওয়া যাবে। ভেবে চিন্তে কিন্তু কানা মেয়ে বিয়ে করতে শেষ পর্য্যন্ত সাহস পায়নি সুলো, অন্ধের যে অশেষ জ্বালা,—রেঁধে বেড়ে সে ত খাওয়াতে পারবে না সুলো মাঝিকে, নিজের হাতে সুলোকেই শেষে খেটে খুটে তিনবেলা সেবা করতে হবে কানা বৌয়ের। একে সুলো খোঁড়া লেড়া মানুষ, অষ্ট পহর নিজেকে নিয়েই সামাল সামাল, তার উপর একটা জলজীয়ন্ত কানা মেয়ের বোঝা দিন রাত সে বয়ে বেড়াবে কত। এ হয় না, ভেবে চিন্তে মেয়েটাকে শেষ পর্য্যন্ত জবাব দিয়ে দেয় সুলো। এতে অবশ্য খুব বেশি ক্ষতি হয়নি কানীর : মাস দুইতিন পরে হঠাৎ একদিন নদী পেরোতে গিয়ে ময়ূরাক্ষীর হড়পা বানে বার কয়েক হাবুডুবু খেয়ে কানী দৈবাৎ মারা পড়ে যায়, লাসটা তার পরের দিন নীচের ঘাটে ভেসে উঠেছিলো।

সুলো মাঝি তার পরেও আরও কিছুদিন এখান ওখান ঘোরাঘুরি করেছিলো উপযুক্ত একটি কনের ধান্দায়, কিন্তু কোন জায়গাতেই বিশেষ তেমন সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি, ভগবানের মার—যে দেখে সেই পিছিয়ে যায়। স্বাস্থ্য কিন্তু মোটের উপর ভালই ছিলো সুলোর, আর

চেহারা খানাও তার এমন কিছু মন্দ ছিলো না; দোষের মধ্যে শুধু হাত পা গুলো একটু ক্ষয়ে গেছে। তাতে কিন্তু কাজকর্ম বিশেষ কিছু আটকায় না হুলোর, নিজের হাতেই সব কিছু সে করতে পারে আজো; গাছে উঠে কাঠ ভাঙতে, নদীর বানে সাঁতার কাটতে বা খাল বিল খানা ডোবায় খোলা ভাঙ্গা দিয়ে জল হিঁচে চুনো মাছ ধরতে হুলোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যার তার পক্ষে সহজ কথা নয়। ঢিল ছোঁড়াটাও বরাবর তার অভ্যাস আছে ভাল রকমই। বেশি দিনের কথা নয়—মাস পাঁচ ছয় আগে পাহাড় ধারে ছাগল চরাতে গিয়ে আস্ত একটা বুনো শেয়ালকে একেবারেই শেষ করে দিয়েছিলো হুলো ঝাঁউ পাথরের ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে, শেয়ালের মুখ থেকে সেদিন জলজ্যান্ত একটা ছাগলের বাচ্চাকে হুলো ছিনিয়ে নিয়ে আসে। পাহাড়তলির গো-চরে ঢিল দিয়ে গোধা সাপ আর অজগরের বাচ্চা মারা এক সময় বাতিক ছিলো হুলোর, সে অভ্যাস তার একেবারে উপে যায় নি আজো। ইচ্ছে করলে এই খোঁড়া হাতেই কাঁড়ধেনুক পর্যন্ত চালাতে পারে হুলো মাঝি, বিদ্যেটা তার পরখ করা আছে। হুলো মাঝির গুণ ছিলো অনেক, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাকে তারিফ করবার লোক ছিলো না কেউ। নিজের উপরেই সে মাঝে মাঝে অকারণে বিরক্ত হয়ে উঠতো, সব সময়েই যেন খাঁ খাঁ করতো মনের ভিতরটা, দুনিয়ার ভাবগতিক দেখে হুলো একেবারে মুসড়ে পড়েছিলো। ভালুক-পোতার টুয়াই মাঝি হঠাৎ সঙ্গে দুটো লোক নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন হুলো মাঝিদের গাঁয়ে গিয়ে হাজির। সন্ধান নিয়ে হুলোকে তারা বের করলে খুঁজে, রামপুরের রাবণ মাঝির মেয়ের সঙ্গে হুলো মাঝির বিয়ের বিলকুল ঠিকঠাক। হুলো কিন্তু সেদিন বিশ্বাস করতে পারেনি টুয়াই মাঝির কথা, হেসে প্রথমটা উড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের নাছোড়বান্দা ভাব দেখে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে

হলো ফুলো মাঝিকে, আসতে হলো তাকে টুয়াই মাঝির সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রামপুর পর্য্যন্ত। তারপর,—তারপর যা হলো ফুলো মাঝির পক্ষে নিতান্তই তা আশাতীত; দুলালীর মত সুন্দরী মেয়ে সে হলো কি না ফুলো মাঝির বৌ, এমন কথা যে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেনি ফুলো। দোষের মধ্যে মেয়েটা একটু দাগী, বিয়ের আগেই ঘর ছেড়ে সে পালিয়ে ছিলো, মেয়ে হয়েছে একটা। তা হোক, ফুলো মাঝি ওসব পরোয়া করে না, তার ভাতজল করবার যে একটা লোক জুটলো এই তার পক্ষে যথেষ্ট। দুলালী মেঝেন—ফুলো মাঝির বৌ, ভাবতেও যেন মনটা কেমন দুলে উঠে ফুলোর, শরীরটা তার আচমকা যেন কাঁটা দিয়ে উঠে। টুয়াই মাঝির বাহাদুরি আছে, ফুলোর জন্যে যেটুকু সে করেছে পর হয়ে পরের জন্যে এতটা কেউ করে না। ফুলো মাঝির হিল্লে একটা ক'রে দিয়েছে টুয়াই মাঝি, ফুলোর এখন বরাত।

ছোট একটা পাতার কুঁড়ে। তারি মধ্যে মাথা গুঁজে কোন রকমে দুলালীর দিন কেটে যায়। কুঁড়ের পাশে ছোট মত একটা চালাঘর সে নিজের হাতেই বেঁধে নিয়েছে গোটা কয়েক শালের খুঁটি আর কতকগুলো ডালপালা দিয়ে। কুঁড়েটা তার এত ছোট যে দু'জনের বেশি লোক ধরেনা। কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে আগুড় এঁটে সুকুরমনিকে বুকের কাছে জড়িয়ে নিয়ে রাত্তির বেলা কুঁড়ের মধ্যে শুয়ে থাকে দুলালী; ফুলো মাঝির শোবার ব্যবস্থা ওই চালা ঘরে—কুঁড়ে ঘরের পাশে। চালার একধারে ফুলো মাঝির ছাগল রাখবার খোঁয়াড়। নির্জ্জন কাঁদরের ধারে প্রকাণ্ড একটা শিমুল গাছের নীচে দুলালীর এই কুঁড়েখানা বাঁধা হয়েছে। কাঁদরের শুকনো বুক ভরে উঠেছে বর্ষার জলে, ঘোলা জলের একটানা স্রোত তর তর ক'রে বয়ে যাচ্ছে কুঁড়ে ঘরের পাশ দিয়ে। এপারে দুলালীর কুঁড়ে, ওপারে একটা শাল পিয়ালের বন, কুঁড়ের একেবারে

সামনা সামনি ; লোকে বলে ওটাকে পাতাড়ির জঙ্গল। কাঁদরের খানিক উজানে বনের লাগাও ছোট্ট একটা পাহাড়, পাহাড়ের নীচে মঘয়া ডোম আর মহুলীদের একটা বস্তি। বস্তির চারিদিকে বড় বড় ধান মাঠ, অজস্র ধানের চারায় কাঁদরের এপার ওপার মাঠগুলো সব ভরতি। কাঁদরের এ ধারটায় প্রকাণ্ড ময়দান জুড়ে বড় বড় ভুট্টার ক্ষেত, ক্ষেতের লাগাও এক একটা ঘাসের মাচান, কুঁড়ে ঘরে বসে রাত জেগে পাহারা দেয় জনার ক্ষেতের রক্ষকরা, মাচায় উঠে মাঝে মাঝে কেনেস্তারা টিন বাজায় শেয়াল তাড়াবার জন্য। ভাদ্রের ভরা বর্ষা, এ সময়টা নানারকম ফসলের মরসুম ; চারিদিকে শুধু মাঠ ভরতি সোনার ফসল, ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ।

কুঁড়ে ঘরের লাগাও পড়ো জমির উপর এক টুকরো আনাজের ক্ষেত নিজের হাতে তৈরি করে নিয়েছে দুলালী, শাক সবজী ফল মূল যতটুকু এর থেকে পাওয়া যায় ততটুকুই আসান ; সংসারের সকল চাপ যে এখন দুলালীর উপর, খেটে খুটে যেমন করে হোক নিজের দৈনন্দিন খরচাটা তাকে চালাতেই হবে। চাষবাসের মরসুম এটা, খেটে খেতে পারলেঁ জন মজুরির অভাব নাই। সকাল বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় দুলালী মেয়েটাকে কোলে ক'রে, টুকরো একফালি কাপড় জড়ানো পান্তাভাতের জামবাটি হাতে ঝুলিয়ে। সারাদিন সে গৃহস্থদের ধান ক্ষেতে চাষের কাজে বেওরা খাটে, সন্ধ্যাবেলা সে বাড়ী ফিরে আসে কাপড়ের ফালিটায় ক'রে সের খানেক চাল বেঁধে নিয়ে। মুনিস কামিনদের মজুরি বাবত পয়সা দেওয়ার রেওয়াজটা এধারে কম, সাধারণতঃ চাল ধান দিয়েই মজুর খাটানো হয় এ অঞ্চলে। দুলালী গিয়ে অন্যান্য কামিনদের সঙ্গে কোনদিন বা ধান মাঠে আফর মারে, কোনদিন বা কাদা ভুঁইয়ে

গুঁড়ি বেয়ে ধান পোতে, কোনদিন বা এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে বড়ান ধানের জোল জমিতে নিড়ান দেয়।

সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরে দোকান থেকে তেল মশলা সওদাপাতি কিছু সংগ্রহ ক'রে এনে কুঁড়ের সামনে কাঠের উনুনে ভাত চাপিয়ে দেয় দুলালী, মাটির একটা হাঁড়ি ক'রে। দিন-মজুরির উপার্জ্জন তার সামান্যই, সেই সঙ্গে বাড়ীর দুটো শাকপাতা এটা সেটা মিলিয়ে তিনটে প্রাণীর সংস্থান তাকে ওই থেকেই কোন রকমে ক'রে নিতে হয়। তাতেও দুলালীর দুঃখু নাই, দিন কোন রকমে কেটে যায় তার, কিন্তু গাঁ বস্তি ডি-ডিহেলী ঘরবাড়ী ছেড়ে নির্জ্জন এই কাঁদরের ধারে ফাঁকা কুঁড়েয় বাস করতে দুলালীর মন যেন এক এক সময় হাঁপিয়ে উঠে, সন্ধ্যার পর রীতিমত ভয় করে দুলালীর, শেয়ালের ডাক শুনে বুকটা তার ছম্ ছম্ ক'রে উঠে, মাঝে মাঝে হেঁড়োল আর বন-শূয়োরও নাকি দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় কাঁদরের ধারে, ভুট্টাক্ষেতের আশে পাশে। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া সেরে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে দুলালী কুঁড়েঘরে আগল এঁটে। কালো মেঘে আকাশ যখন ছেয়ে যায়, ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে দুপুর রাতে, গুড় গুড় শব্দে মেঘ ডাকতে থাকে, দুলালী তখন কুঁড়ের মধ্যে চুপচাপ নিঝুম মেরে পড়ে থাকে চোখ কান বুজে; ভয় পেলে সে সুকুরমনিকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। কুঁড়ের পাশে চালাঘরে অঘোরে নাক ডাকতে থাকে হুলো মাঝির। মাথার উপর শিমুলগাছের ডগা থেকে শকুনের বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটায়, কুঁড়ের বাইরে শোঁ শাঁ শব্দে বাতাস বইতে থাকে আঁধারবুড়ীর ঝাঁপি খোলা বিরাট একটা অজগরের নিঃশ্বাসের মত। কুঁড়ের মধ্যে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় কত স্বপ্ন দেখে দুলালী, মাঝে মাঝে সে নিজের মনেই চমকে উঠে দুঃস্বপ্ন দেখে।

দুলালীর সব চেয়ে দুঃসহ মনে হয় মুলোর সঙ্গ, তার ক্লেদাক্ত কুৎসিত দেহখানার দিকে চেয়ে দুলালীর সারামন বিষিয়ে উঠে ঘৃণায়, মন তার তিক্ততায় ভরে উঠে মুলো যখন খুশির আমেজে মুখখানা বিকৃত ক'রে হাসতে হাসতে দাঁড়ায় এসে তার সামনে। মুলোর জিব দিয়ে যেন জল সরতে থাকে দুলালীকে দেখে, ভাঁটার মত চোখ দুটো তার উৎকট লালসায় জল্ জল্ ক'রে জ্বলতে থাকে বুভুক্ষু বন্যপশুর মত। দুলালী ভয় পেয়ে সরে দাঁড়ায় মুলোর সামনে থেকে, মুলোকে সে জোর ক'রে খেদিয়ে রাখে, কোন সময়ই সে কোনদিক দিয়েই আমল দেয় না তাকে। দুলালী মনে মনে ভাবে কতদিনে নিষ্কৃতি পাবে সে দুর্ব্বহ জীবনের এই দুঃসহ বিড়ম্বনা থেকে। মুক্তি সে পাবে, বার থেকে মুক্তির ডাক তার কানে পৌঁছবে একদিন—এ ভরসা দুলালীর রক্তের কণায় কণায় সব সময় যে জেগে রয়েছে। কিন্তু তবু দুলালীর মন যেন বুঝতে চায় না, এক এক সময় হাঁপিয়ে উঠে দুলালী; কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে কাঁদরের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে কুরুলিয়া নদীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দুলালী—ছোট্ট এই কাঁদরটা যেখানে গিয়ে মিশে গেছে কুরুলিয়ার বুকে। কতদিন—কতদিন যে হয়ে গেল—হয়ত বা একযুগ, কুরুলিয়া নদীর ঘাটে জল ভরতে যায়নি দুলালী—আগে যেমন বেলা পড়লে প্রত্যহ সে কলসী কাঁখে ছুটে যেতো জল ভরবার নেশায়। ও ঘাট যে তার কতকালের চেনা, দুলালীর কলসীর ছাপ আজো হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে ঘাটের পাড়ে, কালো পাথরের বুকে। ওপারের ওই ঘুসরুকাটার পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় সেই কালোপাথরের চাতাল, ও যেন আজ দুলালীর কাছে জীবন্ত একটা স্বপ্ন। পাহাড়ের নীচে নদীর ঠিক কিনারায় মোহনের তীরবেঁধা সেই নিমগাছ,—গাছটা কি এর মধ্যে আরও খানিকটা বেড়ে উঠেছে?

ভাবতে ভাবতে দুলালীর বিহ্বল দৃষ্টি সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে আরও বহু দূরে। ধূসর রঙের আকাশটা যেখানে গিয়ে মাটি ছুঁয়েছে তারই যেন কাছাকাছি স্তূপীকৃত কালো ধোঁয়া হালকা হাওয়ার ভেলায় চড়ে আকাশ গাঙে যেন ভেসে চলেছে খণ্ড খণ্ড মেঘের আকারে। ওগুলো হয়ত অজয় পারের কয়লা খনির ধোঁয়া, চিমনির ধোঁয়া দেখলেই যে চিনতে পারে দুলালী। চরণপুরের খাদটা বুঝি আরও খানিক বাঁয়ে, শেমল্লার ঘাট থেকে বরাবর সড়প চলে গেছে সোজা একেবারে চরণপুরের খাদ পর্যন্ত। টমাস সাহেব কি আজো সেখানে চাকরি ক'রে? কে জানে সায়েবটা আজো বেঁচে আছে কি না, অত বেশি মদ খেলে ত মানুষ বেশিদিন বাঁচে না। মোহনের হাত থেকে খুব সে দিন বেঁচে গেছে সায়েব, আর খানিক হলে মোহন হয়ত ওকে একেবারেই শেষ ক'রে ফেলতো। কিন্তু পাথরডিহির খাদে ঠিক আগে-কার মতই মোহন কি আজো কাজ করছে? কে জানে—খেয়ালী মানুষ, এর মধ্যে সে অন্য কোনদিকে গিয়ে পড়লো কি না তাই বা কে বলতে পারে,—দুলালীর মন কিন্তু ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠছে। কে জানে—আরো কতদিন তাকে মোহনের পথ চেয়ে এই ভাবেই কাঁদরের ধারে কুঁড়ে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে, কতদিন—আরো কতদিন, দুলালীর দিন যে আর কাটে না।

ভাবতে ভাবতে দুলালীর মন ভরাক্রান্ত হয়ে উঠে। পাহাড়তলির মহুলীরা পূবের গাঁয়ে হাটবাজার সেরে গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরবার মুখে একসঙ্গে সব হৈ হৈ ক'রে কাঁদরের জলে গিয়ে নামে। দুলালীর চমক ভেঙ্গে যায়,—বেলা পড়ে গেছে, রান্না বান্নার যোগাড় করতে হবে।

সুকুরমনি কুঁড়ের সামনে বসে বসে নিজের মনেই খেলা করছে। দুলালী কুঁড়ের বাইরে কাঠের উনুনটা তাড়াতাড়ি ধরিয়ে ভাতের

হাঁড়িটা চাপিয়ে দিলে। একটা কানা উঁচু জামবাটি ক'রে সুকুরমনিকে কতকগুলো গুড়মুড়ি বেড়ে দিয়ে তরকারি কুটতে বসলো দুলালী। দুলালীদের নিজের ক্ষেতে কালি কচু উঠে গেছে এর মধ্যেই, ভাদ্রমাসের এ ক'টা দিন বাদ দিয়ে আশ্বিনের প্রথম দিকে ধলি-কচু উঠবে। পাকা চাষা রাবণ মাঝি। মুনিস মান্দের সঙ্গে নিয়ে মাঠের কাজে হাড়ভাঙ্গা সে পরিশ্রম করে আজো, দো-ভুঁইয়ে তার কোন ফসলটি বাদ যায় না। দুলালীর মা রাবণ মাঝিকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে এটা সেটা পাঠিয়ে দেয় দুলালীর কাছে। কতকগুলো কালিকচু, মস্ত একটা ছাঁচি কুমড়ো, সের দুই আড়াই আখের গুড়, আর কয়েক সের হালিভানা চাল দুলালীর মা সে দিন কিষ্টু মাঝির বৌয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। কিষ্টু মাঝির বৌ জনার ক্ষেতে কাজ করতে এসে চুপি চুপি ওগুলো পৌছে দিয়ে গেছে দুলালীর কাছে। দুলালী ওসব নিতে চায় না, যাদের সঙ্গে সব সম্পর্কই তার ছিন্ন হয়ে গেছে ইহ জীবনের মত, অবস্থার চাপে পড়ে তাদের কাছ থেকে হাত পেতে কোন সাহায্য নিতে প্রবৃত্তি হয় না দুলালীর। জিনিসগুলো সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করেছিলো দুলালী, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফেরত সে আর দিতে পারেনি; দুলালী জানে এতে তার মায়ের বুকেই শেল বিঁধবে। তরকারি কুটতে বসে ঘুরে ফিরে শুধু মায়ের কথাই মনে পড়ছে দুলালীর, মেয়ের সঙ্গে তার দেখা করবার হুকুম নাই, রাবণ মাঝির নিষেধ। এসব কথা মনে হলে বুক ফেটে কান্না আসে দুলালীর। আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে আরও কয়েকটা শুকনো কাঠ সে উহুনের মুখে ধরে দিলে, উহুন নিবে ছাই হয়ে গেছে। বহুকষ্টে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুনটা সে কোন রকমে আবার জেলে ফেললে।

জামবাটি ক'রে মুড়ি খেতে খেতে দুলালীর মেয়েটা হঠাৎ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। দুলালী চেয়ে দেখে সুলো মাঝির ছাগলগুলো একসঙ্গে সব হুটোপুটি করতে করতে সুকুরমনির বাটির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গুড়মুড়ি খেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। দুলালী তাড়াতাড়ি ছাগলগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চালাঘরের একপাশে খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে বার দিক থেকে আগুড় বন্ধ ক'রে দিলে। সুলো মাঝি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে কাঁদরের ধার দিয়ে, সারাদিন ছাগল চরিয়ে এতক্ষণে বাড়ী ফিরছে সুলো। দুলালীকে নিজের হাতে ছাগল খোঁয়াড়তে দেখে দূর থেকেই সুলো হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো, ছাগলের ঝামেলা সে পারত পক্ষে পোয়াতে দেয় না দুলালীকে।

এই ছাগল ক'টি সুলো মাঝির নিজস্ব সম্পত্তি। নিজের বলতে মূল্যবান অস্থাবর যা কিছু তার ছিলো,—অর্থাৎ খান দুইতিন থালা বাটি, দু'একখানা ছেঁড়া কাপড়, কাচ ভাঙ্গা পুরানো একটি ফুটো লণ্ঠন, ছেঁড়া একখানা খেজুর পাতার তালাই, বোয়ান কাঠির তৈরি একটা মাছ-ধরা ঘুঘু, ছোট্ট একটি বাঁশের লাঠি, আর সেই সঙ্গে ধাড় বাচ্চা মিলিয়ে মুড়-গুনতি গোটা পাঁচেক ছাগল ;—এগুলো সুলো বাড়ী থেকে আসবার দিন সঙ্গে নিয়েই এসেছে, ভিটের সঙ্গে সম্বন্ধ সে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে একেবারেই। সুলো মাঝির বরাত ভাল, দুলালীর মত পরিবার পেয়ে বর্তে গেছে সুলো। কিন্তু দুলালী যেন কেমন একটু অদ্ভুত ধরণের, সব সময়ই কেমন যেন একটা গম্ভীর ভাব, সুলোর সঙ্গে বেশ হেসে খেলে কথা কয় না দুলালী। এটা কিন্তু সুলো মাঝি ভাল বোঝে না। কে জানে—নতুন নতুন হয়ত এই রকমই হয়, একটু খানি সয়ে রয়ে কোন রকমে টেঁকে থাকতে পারলে দু'দিন বাদে আবার ঠিক হয়ে যাবে সবই। সুলো মাঝি কিন্তু হাল ছাড়ছে না

কোনমতেই, উঠতে বসতে তিনবেলা তাকে ঝাঁটাপেটা করলেও দুলালীর এই কুঁড়ে ছেড়ে একটি পা-ও সে নড়ছে না আর কোন দিকে। মাঝে মাঝে এক আধটু দাঁত খিঁচুনি, দরকার মত সামান্য দু' একটা গালি-গালাজ—একসঙ্গে ঘর সংসার করতে হলে ওগুলো প্রায় ঘটেই থাকে, ফুলো মাঝি তাকে পরোয়া করে না।

ভাতের হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে কচু-শাক তুলতে গেছে দুলালী কুঁড়ে ঘরের পিছন দিকটায়। সুকুরমনি গুড়মুড়িগুলো শেষ ক'রে খালি বাটিটা নিয়ে খেলা করছে নিজের মনেই কুঁড়ে ঘরের সামনে। ফুলো মাঝি বাঁশের লাঠিটা চালা ঘরে ঠেসিয়ে দিয়ে ট্যাঁক থেকে দুটো পেয়ারা বের করে সুকুরমনির সামনে ধরে বললে,—খাবি?

মেয়েটা হাসতে হাসতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল ফুলোর দিকে, পেয়ারা দুটো তাড়াতাড়ি সুকুরমনির হাতে গুঁজে দিলে ফুলো, সুকুরমনি খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাকা পিয়ারায় কামড় দিতে আরম্ভ করলে। দুলালীর এই মেয়েটাকে বেশ লাগে ফুলোর, মেয়েটা কি চমৎকার দেখতে, এটা যদি ফুলোর নিজের মেয়ে হতো! সুকুরমনির দিকে চেয়ে চেয়ে ফুলোর মনে কেমন যেন একটা আমেজ খেলে যায়। তা এ এক রকম নিজের মেয়েই বলতে হবে বৈকি, বড় হয়ে ফুলোকেই ত সে বাবা বলে ডাকবে। ফুলো মাঝি মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আদর ক'রে ডাক দেয়,—বিটি, এ বিটি!

সাড়া দিবার ফুরসৎ নাই সুকুরমনির, পাকা পিয়ারায় কামড় দিতে দিতে খিল্ খিল্ করে মেয়েটা হেসে উঠলো। ফুলো মাঝি এদিক ওদিক একটুখানি চেয়ে ঝপ্ ক'রে তুলে নিলে সুকুরমনিকে একেবারে তার বুকের উপর, খোঁড়া হাতেই মেয়েটাকে দু' হাত দিয়ে উপর দিকে

তুলে ধরে দোল খাইয়ে আদর করতে লাগলো ঝুলো, সুকুরমনি হিহি ক'রে হাসতে আরম্ভ করেছে। দুলালী এসে হঠাৎ সামনে দাঁড়াতেই ঝুলো যেন একটু তটস্থ হয়ে উঠলো। মেয়েটাকে নিয়ে এই ভাবে আদর করতে দেখে দুলালীর মন মেজাজ গরম হয়ে উঠলো, দুলালী একটু কড়া স্বরে বললে,—তোকে আমি বার বার নিষেধ করেছি না, মেয়েকে আমার কোনদিন তুই কোলে নিবি না!

ঝুলো একটু আমতা আমতা ক'রে বললে,—ক্ষেতিটা কি—বলি কোলে যদি নিলুমই একবার তাতে এমন ক্ষেতিটা কি।

দুলালী বললে,—ক্ষেতি আছে, যথেষ্ট ক্ষেতি আছে, খবরদার বলছি আজ থেকে তুই মেয়েকে আমার ছুঁস না।

এই বলে দুলালী সুকুরমনির হাত ধরে চড় চড় ক'রে টানতে টানতে ঝুলোর কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ধপ্ ক'রে মাটির উপর বসিয়ে দিলে। পিয়ারা দুটো সুকুরমনির হাত থেকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কাঁদরের জলে; সুকুরমনি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। ঝুলো মাঝি একটু চোখ তেড়ে বললে,—ইটা আবার কি রকমটা হলো, মেয়েটাকে মিছেমিছি কাঁদালি কেনে বল্ দেখি।

দুলালী একটু নাক সিটকে বললে,—ওরে ঘাটের মড়া, তোর হাতের ছোঁয়া জিনিস মেয়েকে আমার দিস না—দিস না—দিস না, এক কথা কত দিন বলবো!

কথায় কথায় ঝুলোর ব্যাধিগ্রস্ত দেহটাকে ইঙ্গিত ক'রে সুযোগ পেলেই ঝুলোর মনে খোঁচা দেয় দুলালী, মনটা ঝুলোর খিঁচড়ে উঠলো ভয়ানক। দুলালী যেন সব সময়ই ঝুলোর কাছ থেকে মেয়েটাকে সরিয়ে রাখতে চায়, মেয়েটাকে ঝুলো আদর করতে গেলেই দুলালী

যেন দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসে মারতে। এটা কিন্তু মুলোর বেশ ভাল লাগে না, মুলো একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললে,—মেয়েটা কি তোর একলার?

দুলালী একটু চোখ তেড়ে বললে,—আর কার শুনি?

একটুখানি ভারিক্কি চালে বলে উঠলো মুলো মাঝি,—কাঠবেটা আর কাঠবিটি—ইকথার তবে অর্থটা কি শুনি। নিজের বেটা নিজের বিটি—কাঠবেটা আর কাঠবিটি—এই ত দুটো কথা, তোর বিটিটা তা হলে ই পক্ষে কে হলো আমার, কাঠবিটি হলো নাই?

দুলালীর ভিতরটা গুরগুর করতে লাগলো রাগে, কচু শাকের তরকারিটা খোন্তা দিয়ে নাড়তে নাড়তে দাঁত খিঁচিয়ে বললে দুলালী,—বেরো থালভরা—বেরো আমার সামনে থেকে, ডুব দিয়ে এসে পিণ্ডি দুটো গিলবি ত এই বেলা গিলে লে, হাঁড়ি নিয়ে আমি বসে থাকবো না।

পিণ্ডি গেলা মুলো মাঝির অভ্যাস হয়ে গেছে, ভাত ত তাকে খেতেই হবে, কিন্তু—

উনুনের মধ্যে আগুন জমে গেছে বিস্তর, কাঠ কয়লাগুলো গিস্ গিস্ করছে; মুলো মাঝি একটু স্বর নামিয়ে বললে,—আগুনটা যেন নিবুস না, ঝাঁ ক'রে আমি এলুম বলে।

দুলালী রান্নাবান্না শেষ ক'রে মেয়েটাকে তেল মাখাতে বসলো। মুলো মাঝি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডাঙ্গার দিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো একটা ভুট্টাক্ষেতে। মট্ মট্ শব্দে কতকগুলো ভুট্টা ভেঙ্গে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুলো বেঁধে ফেললে কোঁচড়ে। উঁকি মেরে চারিদিক একবার লক্ষ্য ক'রে দেখে নিলে মুলো—আশে পাশে কেউ কোথাও আছে কি না, তারপর সে তাড়াতাড়ি ভুট্টাক্ষেত থেকে বেরিয়ে

হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলো এসে কুঁড়ে ঘরের সামনে। গোটা চারেক ভুট্টা কোঁচড় থেকে বেছে নিয়ে উপরকার পাতাগুলো ছাড়িয়ে ত্বলালীকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো ঘুলো,—দিস ত ই কটা আগুনে ফেলে।

ত্বলালী একটু রেগে বললে,—ফের তুই চুরি ক'রে পরের ক্ষেতে জনার ভাঙ্গতে গিয়েছিলি!

ঘুলো একটু ইতস্তত ক'রে বললে,—চুরি ক'রে কি রকম, ক্ষেতে আমি পাহারা দিই না!

ত্বলালী একটু ঝঙ্কার দিয়ে বললে,—যার ক্ষেতে পাহারা দিস তার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিস?

ঘুলো মাঝি বিকৃত মুখখানা আর একটুখানি বিকৃত ক'রে বললে,—কি যে তুই বলিস ত্বলালী, চাইতে গেলে দিতো কথনো এতগুলো? একটা কি ত্বটোর বেশি মাথা ঠুকলেও না।

ত্বলালী গর্জ্জে উঠে বললে,—তাই বলে তুই পরের ক্ষেতে চুরি ক'রে জনার খাবি, অভরপটা হ্যাংলা চোর কোথাকার!

ঘুলো মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—তা আমি খাব, মাঝে মাঝে ত্ব'একটা খাব, তাতে এমন দোষ হয়না কিছু।

ছাল ছাড়ানো ভুট্টাগুলো নিজের হাতেই উন্থনের মধ্যে ফেলে দিলে ঘুলো, বাকি গুলো একটা টুকরি ঢাকা দিয়ে রেখে . .ল চালাঘরের এক পাশে।

চড়বড় শব্দে ভুট্টাগুলো ফুটতে লাগলো উন্থনের মধ্যে, ঘুলো একটা চেলা কাঠ দিয়ে ভুট্টাগুলো উল্টে পাল্টে সেঁকে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। হাতে তার আঙ্গুলের চিহ্নমাত্র নাই, ত্ব'হাতের চেটো দিয়ে কাঠটাকে কোনরকমে চেপে ধরে ভুট্টাগুলো নাড়া দিতে লাগলো

ঝুলো, কাঠটা কিন্তু বারে বারেই ফস্‌কে যেতে থাকে ; ঝুলো একটু করুণ ভাবে ছুলালীর দিকে চেয়ে বললে,—দে না একটু ভুট্টাগুলো পুড়িয়ে।

ছুলালী একটা ঝঙ্কার দিয়ে বললে,—ফের যদি কোনদিন তুই না বলে পরের ক্ষেতে জনার ভাঙ্গতে যাস—সেদিন কিন্তু লোকজন ডেকে ধরিয়ে দিব আমি।

এই বলে ছুলালী ভুট্টাগুলো পুড়িয়ে লোহার একটা চিমটে দিয়ে ধরে ঝুলোর সামনে নামিয়ে দিলে একটা শালপাতার উপর। ভুট্টায় কামড় দিতে দিতে ঝুলো একটু রহস্য ক'রে বললে,—বেশ ত, ভুট্টাচুরির দায়ে দে না একদিন ধরিয়ে, দিন কতক না হয় জেহেল খেটেই আসবো। কোর্টে গিয়ে তুই সাক্ষী দিবি ত ?

এই বলে সে নিজের মনেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

ছুলালী একটু মুখ বেঁকিয়ে বললে,—হি হি ক'রে আবার হাসি দেখ খালভরার, মরণও ত হয় না।

এবার কিন্তু ঝুলো মাঝি সত্যি সত্যি চটে উঠলো ভীষণ, মরণ তুলে গাল—সে যে মরণের বাড়া ; ছুলালীর দিকে চেয়ে একটু ভারীগলায় বলে উঠলো ঝুলো,—আমি মলে খুব খুশী হস তুই, না ?

ছুলালী কোন জবাব দিলে না, ঝুলো মাঝি বলে যেতে লাগলো,— ভেবেছিস আমি মরে গেলে মনের মত আর একটা কাউকে জুটিয়ে নে ফের তাকে তুই সাঙা করবি ?

ছুলালী একটা ধমক দিয়ে বললে,—খবরদার।

চোখ তেড়ে বলে উঠলো ঝুলো মাঝি,—ও কথা তুই মনেও ভাবিস না, মরে ভুত হয়ে সে শালার আমি ঘাড় মটকাব—জরুর বলছি ঘাড় মটকাব, এমনি ক'রে ছু'হাত দিয়ে ধরে মড় মড় মড়াস—মড় মড় মড়াস—

ঝুলো মাঝি ঘাড় মটকাবার মত সামনে কাউকে না পেয়ে পোড়া ভুট্টাগুলোকেই হাঁটুর উপর চাপ দিয়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতে লাগলো,—মড় মড় মড়াস—মড় মড় মড়াস—

ঝুলো মাঝির কাণ্ড দেখে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠলো দুলালীর, হো হো ক'রে সে হেসে উঠলো। দুলালীর হাসি দেখে হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল ঝুলোর, ঠোঁট দুটো তার বিকৃত হয়ে উঠলো কান্নার চাপে। এ আবার কি নতুন উপদ্রব, ঝুলোর দিকে চেয়ে দুলালীর ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠলো আপনা থেকেই। হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজের মনেই আদিখ্যেতা ক'রে উঠলো ঝুলো,—মানুষের পরিবার যদি এমনধারা বেবাগা হয় তবে তার জীবনেই ধিক।

দুলালী একটু মুখ বেঁকিয়ে বললে,—পরিবার— তোর চোদ্দ পুরুষের পরিবার, থালভরা কুঠে কোথাকার। ফের যদি ও কথা মুখে আনিস কোনদিন—ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিব।

এবার কিন্তু ঝুলো মাঝি ফেটে পড়লো রাগে, দুলালীর সামনে ঢাই ঢাই ক'রে বার কয়েক মাথা খুঁড়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ ভাবে বলে উঠলো ঝুলো,—ঘাট হয়েছে, এই নাক মলছি আর এই কান মলছি, আজ থেকে যদি তোর সঙ্গে আর কথা কই ত আমার নামে কুকুর পুষে রাখিস।

এই বলে ঝুলো ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়লো। ভুট্টার টুকরো গুলো টান মেরে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কাঁদরের জলে, তারপর সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললো কাঁদরের ধারে ধারে উত্তর দিকের নুড়ি পথটা ধরে।

দুলালী পিছন থেকে একটা ডাক দিলে,—চললি কুথা?

ঝুলো মাঝি বলে উঠলো,—যে দিকে দু'চোখ যায়, যেখানে আমার খুশি।

বলতে বলতেই মুলো মাঝি হন্ হন্ ক'রে সরে পড়লো দুলালীর সামনে থেকে। দুলালী থ মেরে গেল মুলো মাঝির তেজ দেখে, মুলো মাঝিও রাগ ক'রে যায়। কিন্তু যাবে আর সে কোন্ চুলোয়, পেটের জ্বালা উঠলেই এক্ষুনি আবার ফিরে এসে পিতলের কানা উঁচু থালাটা পেতে চুপচাপ বসে পড়বে ফ্যানভাত খেতে বিশ হাত জিব বের ক'রে, এ দুলালীর বেশ জানা আছে।

দেখতে দেখতে বেলা ডুবে গেল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, লম্ফটা তাড়াতাড়ি জ্বেলে নিয়ে সুবুরমনিকে খাওয়াতে বসলো দুলালী। খেয়ে দেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুলালীর কোলে ঘুমিয়ে পড়লো মেয়েটা, কুঁড়ের মধ্যে সুবুরমনিকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে এসে লম্ফ নিবিয়ে চুপচাপ বসে পড়লো দুলালী। মুলোর কিন্তু আর দেখা নাই সেই থেকে।

দেখতে দেখতে বহুক্ষণ কেটে গেল, মুলো কিন্তু ফিরে এলো না; বসে বসে নিজের মনেই ভাবতে লাগলো দুলালী। বর্ষাকাল—অন্ধকার রাত, রাগের মাথায় সত্যি সত্যি কোনদিকে গিয়ে পড়লো নাকি! খোঁড়া মানুষ খানা ডোবায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলেও সারারাত আর হদিস পাওয়া যাবে না। ও সব পারে—ওকে বিশ্বাস নাই এতটুকু, কোন বিপদ আপদ ঘটলে ভুগতে হবে শেষে দুলালীকেই। নিশ্চিন্ত বসে থেকে লাভ নাই, উঠে একটু মুলো মাঝির খোঁজ করা দরকার; আছে হয়ত কাঁদরের ধারে কোথাও ঝোপে ঝাড়ে বসে, ও আপদ কি এত সহজে বিদেয় হয়।

দুলালী দোরে আগুড় টেনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো উত্তর দিকের মুড়ি পথটা ধরে, মুলো মাঝি যে দিক দিয়ে গেছে। রাত হয়েছে একটুখানি, চাঁদটা আজ ঢাকা পড়ে গেছে পাতলা মেঘের ফাঁকে, পথ ঘাট দেখা যাচ্ছে কোন রকমে আবছা আলো অন্ধকারের

মধ্যে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কাঁদরের ধার দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল দুলালী, চারিদিক সে লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলো ঝোপে ঝাড়ে কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে হুলো। হুলো কিন্তু দুলালীর চোখে পড়লো না, পথ ঘাট নিঝুম। দুলালী ধীরে ধীরে ডাক দিতে আরম্ভ করলে,—হুলো—ও হুলো!

কোন সাড়াই পাওয়া গেল না, আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা জামগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো দুলালী। জায়গাটা ভয়ানক অন্ধকার, দুলালীর বুকটা যেন ছম্ ছম্ করতে লাগলো, দুলালী আর একটু জোর গলায় ডাক দিলে,—হুলো—ও হুলো!

দুলালীর পিছন দিকে জামগাছের নীচের দিককার একটা ডাল থেকে ঝুপ্ ক'রে কে মাটির উপর লাফিয়ে পড়ে নাকি সুরে হঠাৎ বলে উঠলো,—ক্যাঁও।

আচমকা ভয় পেয়ে চমকে উঠলো দুলালী, চীৎকার ক'রে সে বলে উঠলো,—কে ?

হুলো মাঝি পিছন দিক থেকে হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

দুলালীর বুকটা ঢাই ঢাই করছে, হুলোর উপর সে খাপ্পা হয়ে উঠলো ভয়ানক, দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো দুলালী,—ভয় দেখাবার আর লোক পেলি না আঁটকুড়ো, মরণ কি তোকে ভুলে আছে! তুই মর—তুই মর—তুই মরে যা, হাড়ে আমার বাতাস লাগুক।

আবার সেই মরণ তুলে গাল। দুলালীর আর কোন কথাই শুনতে চায় না হুলো, এবার হয়ত সত্যি সত্যি মরবার ব্যবস্থাই করতে হবে হুলোকে। হুলো মাঝি মুখে কিছু বললে না আর, জামগাছের গুঁড়িটাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তড় তড় ক'রে উঠে চললো উপর দিকে। দুলালী একেবারে অবাক হয়ে গেল হুলো মাঝির গাছে

ওঠা দেখে! কিন্তু অসময়ে এই রাত্তির বেলা লাভ কি তার অনর্থক এ সব ঝঞ্ঝাট ক'রে, লোকটার নেহাত মাথা খারাপ নাকি! জামগাছের নীচে থেকে দুলালী আর একটা ডাক দিলে,—ঝুলো!

ঝুলো মাঝি সাড়া দিলে না। দুলালী একটু লক্ষ্য ক'রে উপর দিকে চেয়ে দেখে ঝুলো গিয়ে চড়ে বসেছে একেবারে জামগাছের ডগায়। বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো দুলালীর, হাত পা ফসকে হঠাৎ পড়ে গেলে লোকটাকে আর আস্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ আবার কি নতুন উপদ্রব সুরু করলে ঝুলো।

জামগাছের ডগা থেকে ঝুলো মাঝি বলে উঠলো,—মরি তা হলে, দিই এখান থেকে লম্বা একটা ঝাঁপ?

কি সর্ব্বনাশ, লোকটা শেষে আত্মহত্যা করবে নাকি! ঝুলো মাঝির কাণ্ড দেখে দুলালীর বুকটা যেন ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো ভয়ে।

মগডাল থেকে ঝুলো মাঝি দুলালীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে,—আমি ম'লে হাড়ে তোর বাতাস লাগে, না? দিই তাহলে এখান থেকে ঝাঁপ।

ভয়ে দুলালীর মুখ শুকিয়ে গেল, সত্যি সত্যি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে! উপর দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠলো দুলালী,—তোর পায়ে পড়ি ঝুলো, গাছ থেকে তুই নেমে আয়।

ঝুলো মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—বল্ তবে আর মরদ তুলে গাল দিবি না।

দুলালী বললে,—ঘাট হয়েছে, ভালোয় ভালোয় তুই নেমে আয় দেখি।

ঝুলো মাঝি হাত দুই তিন নেমে এসে আর একটা ডালে চেপে বসলো, বললে,—পরিবার বলে ডাকলে আর রাগ করবি না ত?

ঠিক ক'রে বল এই বেলা, নৈলে আজ গাছ থেকে পড়ে তোর ছামনে আত্মঘাতী হব।

দুলালী মৃদু একটা ধমক দিয়ে বললে,—নেমে আয়।

ন্থলো বললে,—উঁহু, মরণ তুলে আর গাল দিবি না কথা দে, নৈলে এই দেখ পড়লুম এবার ঝাঁপিয়ে।

দুলালী একটু বিব্রত হয়ে বললে,—ন্থলো!

ন্থলো মাঝি গাছের একটা ডালকে ঝটপট শব্দে নাড়া দিয়ে একটু দোল খেয়ে বললে,—কথা তা হলে দিলি?

দুলালী ভয় পেয়ে বলে উঠলো,—দিলুম।

—মরণ তুলে আর গাল দিবি না?

—না।

—পরিবার বলে ডাকলে আর রাগ করবি না?

দুলালী একটু মুখ বেঁকিয়ে বললে,—না—খালভরা না,—তুই নেমে আয় দেখি।

নীচের ডালে পা বাড়িয়ে আর একবার বলে উঠলো ন্থলো,—ঠিক ত?

দুলালী এবার বিরক্ত হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে,—থাক তবে তুই গাছের উপর বসে, চললুম আমি এখান থেকে।

ন্থলো মাঝি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—এই যে নামছি।

দুলালী হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললো কুঁড়ের দিকে। ন্থলো মাঝি গাছ থেকে নেমে জোর গলায় ডাক দিলে,—দুলালী—দুলালী!

দুলালী আর সাড়া দিলে না, ন্থলো মাঝি ডানপায়ের ন্যাকড়াটা শক্ত ক'রে জড়িয়ে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললো কুঁড়ের দিকে মুখ ক'রে।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে চুপচাপ কুঁড়ের মধ্যে শুয়ে পড়েছে দুলালী মেয়েটাকে বুকের কাছে জড়িয়ে। কুঁড়ের লাগাও কাঠাড় দিয়ে ঘেরা চালাঘরের মেঝের উপর ফাঁকার দিকটায় একটা তালাই পেতে শুয়ে আছে নুলো। রাত তখন অনেক, সারাদিন পরিশ্রমের পর নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দুলালী। হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ রেখে কে যেন চুপি চুপি ডাক দিচ্ছে,—দুলালী—ও দুলালী!

ঘুমের ঘোরেই আবছা যেন শুনতে পাচ্ছে দুলালী, কিন্তু জেগে উঠে সাড়া দিতে পারছে না, ঘুমে তার চোখ দুটো যেন সেঁটে ধরেছে। দুলালীর গায়ের উপর কে যেন হাত রাখলে, আবার সেই ফিস ফিস আওয়াজ,—দুলালী—ও দুলালী।

দুলালীর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, ভয় পেয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠলো, —কে?

শিয়রের দিকে হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেলে লম্ফটা ধরিয়ে নিলে দুলালী, চেয়ে দেখে তার বিছানার পাশে চুপচাপ এক ধারে ভূতের মত বসে আছে নুলো, কুঁড়েঘরের আগুড়টা খোলা। আপাদ মস্তক জলে উঠলো দুলালীর নুলো মাঝিকে দেখে, দুলালী হঠাৎ গর্জ্জে উঠলো রাগে,—ইখানে এসে চুপচাপ কেনে বসে আছিস হারামজাদা, কার হুকুমে আমার কুঁড়েয় এসে ঢুকেছিস তুই?

নুলো মাঝি একটা ঢোক গিলে বললে,—বাইরে ভয়ানক গরম করছে কি না—তাই—

দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো দুলালী,—তাই কুঁড়ের মধ্যে একটু হাওয়া খেতে এসেছিলি! বেরো ঝাঁটকুড়ো বেরো, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে।

দুলালীর ভাব গতিক দেখে কুঁড়ের মধ্যে আর বসে থাকতে সাহস হলো না দুলোর, ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দাঁড়ালো সে কুঁড়ে ঘরের বাইরে। দুলালী আর একটা ধমক দিয়ে বললে,—ফের যদি কখনো এমনধারা দেখি—

দুলো একটু রুক্ষস্বরে বললে,—মিছে মিছি এত চটছিস কেনে বল দেখি, কি এমন বে-অন্যায় কাজটা ক'রে ফেলেছি।

জোর গলায় বলে উঠলো দুলালী,—ফের যদি কখনো রাত বেরাত আমার কুঁড়েয় এসে ঢুকিস, সেদিন কিন্তু তোকে আর আমি আস্ত রাখবো না।

কুঁড়েঘরের আগুড়টা আবার ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে খিলটাকে একটা কাঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে দিলে দুলালী। দুলো মাঝি চালাঘরের সামনে একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে অন্ধকারেই বসে বসে চুটি টানতে লাগলো চোঁ চোঁ শব্দে। ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে দুলো যেন একটু মুসড়ে পড়েছে। কাঁদরের ওপার থেকে হঠাৎ কতকগুলো শেয়াল ডেকে উঠলো, রাত্রের বুঝি শেষ প্রহর এটা।

এগারো

টুংরা মাঝি বহু কষ্টে সেরে উঠেছে। সরকারী হাসপাতালে গিয়ে ডান চোখটা তাকে একেবারে তুলে ফেলতে হয়েছিলো, ঘা শুকোতে সময় লাগে প্রায় মাসখানেকের উপর। খাঁদী মেঝেন মাসাধিক কাল টুংরার শিয়রে বসে অক্লান্ত সেবা করেছে। টুয়াই মাঝিকে অসময়ে ধান চাল বিক্রি ক'রে নগদ কিছু টাকা পয়সাও খরচা করতে হয়েছে টুংরার চোখ সারাতে। তার উপর বাজে খরচাও তার কম হয়নি, ঘরে তৈরি সের দুই আড়াই গাওয়া ঘি—সরকারী ডাকতর বাবুর মান, আর হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারকে পান খেতে সের পাঁচেক কচু, গোটা তিনেক ডিংলে, আর ঘটি খানেক আখের গুড়,—ঘাড়ে ক'রে বাসায় তাদের পৌঁছে দিয়ে এসেছে টুয়াই মাঝি নিজে, চিকিৎসার সে ত্রুটি হতে দেয়নি কোন দিক থেকেই। ছেলেটার নেহাত বরাত ভাল, তাই একটা চোখের উপর দিয়েই এ যাত্রা সে কোন রকমে রেহাই পেয়ে গেল। কিন্তু যে রকম তার মতিগতি আর আক্কেল বুদ্ধির দৌড় তাতে কোন ভরসাই আর রাখা যায় না টুংরার উপর, টুয়াই মাঝি ওর আশা ভরসা ছেড়েই দিয়েছে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফিরবার মুখে সেই দিনই ভীম মাঝির কাছ থেকে খবর পেয়েছে টুংরা ভালুকপোতার কুলিমুড়ায় এসে, কোথাকার এক নুলো মাঝির সঙ্গে দুলালীর নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। নুলো মাঝির সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ, হাতপায়ের আঙ্গুল গুলো নাই, ফুলো ফ্যাপসা বিকৃত চামড়ায় ঢাকা কদর্য্য তার চেহারা খানা দেখলে নাকি বমি আসে।

কি সাংঘাতিক, তার সঙ্গে হলো কিনা দুলালীর বিয়ে। টুয়াই মাঝির এ ষড়যন্ত্র, টুংরাকে ফাঁকি দিয়ে—দূরে তাকে সরিয়ে রেখে ঝুলোর সঙ্গে দুলালীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে টুয়াই মাঝি; টুংরা যখন চোখে ঠুলি এঁটে পড়েছিলো হাসপাতালে। রাবণ মাঝির এ শয়তানি, একটা কুঠের হাতে মেয়েটাকে অনায়াসে তুলে দিতে পারলে, অথচ টুংরার কথা একবারও সে ভেবে দেখলে না। টুংরার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে ওরা সকলে মিলে; এও কি আজ টুংরাকে চোখ বুজে সয়ে যেতে হবে? দুলালীর জন্যে কি না করেছে টুংরা, নিজের হাতে নিজের একটা চোখকেই সে তীর দিয়ে উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু কানা ছেলের খোঁজ ত কই পড়লো না, সমাজের তখন দরকার হলো একটা কুঠে। এ সমস্ত কারসাজি টুয়াই মাঝির, দুলালীকে ঘরে আনলে তার বংশের মান যেতো, তাই টুংরার মনের কথা ভাল রকম জেনেও নিজে গিয়ে ঝুলো মাঝিকে ধরে এনেছে টুয়াই মাঝি, ঝুলোর হাতেই শেষ পর্য্যন্ত ওরা দুলালীকে গছিয়ে দিয়েছে। কি চমৎকার বিচার, টুয়াই মাঝির বাহাদুরি আছে। টুংরা কিন্তু আর কোন সম্বন্ধই রাখতে চায় না টুয়াই মাঝির সঙ্গে, টুংরাকে যদি ভিক্ষে মেগে খেতে হয় সেও আচ্ছা, টুয়াই মাঝির খবরদারি মেনে চলা টুংরার পক্ষে আর সম্ভব নয় কোন মতেই।

টুংরার মনটা আজ ক'দিন থেকে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কোথাকার এক হাত-পা-বোঁচা ঝুলো, সে কি না হঠাৎ দুলালীকে বিয়ে ক'রে কোত্থেকে আজ উড়ে এসে জুড়ে বসলো। কি কদর্য্য চেহারা লোকটার, টুংরা সেদিন চমকে উঠেছিলো ঝুলো মাঝিকে দেখে, দূর থেকে সে লোকটাকে চিনে এসেছে। কাঁদরের ধারে কুঁড়ে বেঁধে ঘর সংসার, বেশ জমিয়ে ফেলেছে ঝুলো, ফাঁকা কুঁড়েয় দুলালীকে নিয়ে দিন কাটছে বেশ আরামসে। কে এই ঝুলো মাঝি, কোন্ সাহসে দুলালীর

মত মেয়েকে সে বিয়ে করতে আসে। কি তার যোগ্যতা, কিছু মাত্র না। কিন্তু তবু—তবু সে আজ দুলালীর সাঙাকরা সোয়ামী, দুলালী আজ মুলো মাঝির পরিবার। কি স্পর্দ্ধা এই মুলোর, টুংরার পক্ষে এ যে একেবারে অসহ্য; টুংরা মাঝি এ সইতে পারবে না—কোন মতেই না। দুলালীকে পাবার আশা মন থেকে যদি একেবারে মুছে ফেলতে হয় টুংরাকে তাও হয়ত সে পারে, কিন্তু তার চোখের সামনে মুলোর মত একটা অবাঞ্ছিত লোক দুলালীকে নিয়ে নিশ্চিন্তে বেশ আরাম ক'রে মনের সুখে ঘরকন্না করবে,—টুংরা মাঝি বেঁচে থাকতে সেটি হচ্ছে না। মুলো মাঝি আজ টুংরার শত্রু, টুংরা তাকে ছেড়ে কথা কইবে না, দরকার হলে মুলোকে সে একেবারে শেষ করে ফেলবে। টুংরা মাঝির একটা চোখের দাম—সে যে অনেক, মুলোর মত তিনটে লোকের জান নিলেও উসুল হবে না। খুন? তা হলে কি মুলো মাঝিকে শেষ পর্যান্ত খুন করবে টুংরা? ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই টুংরা হঠাৎ চমকে উঠলো। কিন্তু না, ভাববার এতে কিছু নাই, মুলো মাঝিকে যদি খুন করতেও হয় তাতেই বা টুংরার আপত্তি কি। দুলালীকে বাঁচাতে হবে মুলো মাঝির খপ্পর থেকে, সেজন্য টুংরা সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত। টুংরা যদ্দিন বেঁচে আছে অন্ততঃ ততদিন অপর কারো ঠাঁই নাই দুলালীর জীবনে। মুলো মাঝিকে সরাতেই হবে, সালিসের বিচার—সমাজের বিধান—ও সব টুংরা মানে না, এবার সে নিজের পথ বেছে নেবে নিজে।

রাবণ মাঝি আবছা একটা খবর পেয়েছে মোহন নাকি ফিরেএসেছে কলিয়ারি থেকে। ক'দিন ধরে এই অঞ্চলেই নাকি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে মোহন, সাহস ক'রে সে বেরুতে পারেনি বাইরে; কোথায়

যে সে লুকিয়ে আছে—কোন্ খানে তার আড্ডা সে খবরটা কিন্তু সঠিক ভাবে বলতে পারছে না কেউ। রাবণ মাঝি গোপনে কিষ্টু মাঝিকে সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলো ঘুসরুকাটায়, কিন্তু ঘুসরুকাটার লোক মোহন মাঝির কোন খবরই বলতে পারেনি। গুজব হয়ত সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু তবু রাবণ মাঝি একটু সজাগ আছে। চুপি চুপি এসে আবার হয়ত সে দুলালীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে, অসম্ভব নয়। মোহনকে যদি সত্যি সত্যি কোন দিন আবার দেখতে পাওয়া যায় রামপুর মৌজার ত্রিসীমানার মধ্যে—সেদিন কিন্তু রাবণ মাঝি এমনি তাকে ছেড়ে দেবে না, দুর্ভোগ তার অনিবার্য্য। মোহন যদি ধরা পড়ে—শক্ত ক'রে তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে কুকুর লেলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে রাবণ মাঝি, তার পর তাকে জল বিছুটির চাবুক মারতে মারতে দূর ক'রে দেওয়া হবে রামপুরের সীমা ছাড়িয়ে। যে ক্ষতিটা সে করেছে রাবণ মাঝির সহজে তা ভুলবার নয়। গোপনে গোপনে মোহন মাঝির সন্ধান রাখবার ব্যবস্থা করেছে রাবণ মাঝি, লোকজনদের বলে দেওয়া আছে কাছাকাছি তাকে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন রাবণ মাঝিকে খবর দেওয়া হয়।

সে দিন কিন্তু খাঁটী খবরটাই পাওয়া গেল, মোহন মাঝি ফিরে এসেছে। কাঁদরের ওপারটায় পাতাড়ির জঙ্গলে ঝাঁকড়া মত একটা চাকলতা গাছের নীচে চুপচাপ বসেছিলো মোহন, শালডাঙ্গার মদ দোকান থেকে ফিরবার মুখে রামপুরের চরণ মাঝি দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে। পাশ কাটিয়ে অন্য পথ দিয়ে ঘুরে এসে চুপি চুপি রাবণ মাঝির কাছে সংবাদটা পৌঁছে দিলে চরণ; বেলা তখন পড়ে আসছে। খবরটা শুনে রাবণ মাঝি নিজের মনেই গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো,—হুম্, তারপর সে ধীরে ধীরে তাকালো আবার চরণ মাঝির দিকে, বললে,—সুখন মাঝিকে

খবর দে, আর কিষ্টুকে আমার নাম ক'রে বল্ স্বগন মাঝি আর হপনাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে মহুল বাগানে গিয়ে দাঁড়াতে; আমি আসছি।

চরণ মাঝি ধীরে ধীরে বিদেয় হয়ে গেল। রাবণ মাঝি উঠে পড়লো হাতের কাজ ফেলে, খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে হন্ হন্ করে সে এগিয়ে চললো পশ্চিম দিকে মুখ করে, গাঁ বাইরে মহুল বাগানে গিয়ে জমা হলো সব এক জায়গায়। রাবণ মাঝি গম্ভীর ভাবে বললে,—খবর সব শুনলি ত?

স্বগন মাঝি একটু স্বর চড়িয়ে বললে,—শুনলুম সদ্দার, আমরা ওকে এক্ষুণি গিয়ে ধরে ফেলবো, যেমন ক'রে হোক ওকে ধরতেই হবে।

রাবণ মাঝি ভ্রূদুটো একটু কুঞ্চিত ক'রে বললে,—ঠিক কথা, যেমন ক'রে হোক ধরতেই হবে; চল্ তা হলে আর দেরি নয়।

মহুল বন পিছনে রেখে ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়ে কাঁদরের ধারে গিয়ে উঠলো রাবণ মাঝি লোক গুলোকে সঙ্গে নিয়ে। উত্তর দিকে আরও খানিকটা উজানে দুলালীর কুঁড়ে খানা দূর থেকে রাবণ মাঝির চোখে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ ফিরিয়ে নিলে। সামনের ঘাট দিয়ে কাঁদর পার হয়ে পাতাড়ির বনে ঢুকে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললো সব চরণ মাঝির পিছু পিছু। প্রত্যেকের মুখে চোখে চাপা একটা উত্তেজনার ভাব। রাবণ মাঝির চোখ দুটো জল্ জল্ ক'রে জলছে। স্বগন মাঝি দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে আছে তার বেউড় বাঁশের লাঠি খানা, হপনা মাঝির রক্ত গরম হয়ে উঠেছে, কিষ্টু মাঝির কোন সাড়া শব্দ নাই; চরণ মাঝি ওদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে চললো। পিছন দিকে একটু খানি ঘুরে ঝোপের আড়াল দিয়ে চুপি চুপি সব হাজির হলো গিয়ে ঝাঁকড়া মত সেই চাকলতা গাছটার নীচে, চরণ মাঝি ওই জায়গাতেই

মোহন মাঝিকে দেখে এসেছিলো। মোহন মাঝি কিন্তু নাই সেখানে, আশে পাশে অনেক খোঁজ করা হলো, মোহন কারো চোখে পড়লো না।

"রাবণ মাঝি আর একবার বেশ ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলে চরণ মাঝিকে,—এই খানেই ঠিক দেখেছিলি ত, ঠিক এই চাকলতা গাছের নীচে?

চরণ মাঝি সায় দিয়ে বললে,—হঁ সদ্দার, এই খানেই সে বসেছিলো চাকলতা গাছে হেলান দিয়ে, নিজের চোখে দেখে গেছি আমি।

রাবণ মাঝি একটু চিন্তিত ভাবে বললে,—তা হলে সে গেল কোথায়, খুঁজে তাকে বের করা দরকার।

সুখন মাঝি লাঠিটা একটু মাটির উপর ঠুকে বললে,—নিশ্চয়ই সদ্দার, খুঁজে তাকে বের করাই দরকার।

সর্দ্দার রাবণ মাঝি সুখনের দিকে চেয়ে বললে,—তুই আর হপনা পাহাড়তলিটা ঘুরে আয় একটু, আমরা ততক্ষণ পাতাড়ির জঙ্গলটা খুঁজে দেখি।

হপনাকে সঙ্গে নিয়ে সুখন মাঝি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল পাহাড় তলির পথ ধরে, পাতাড়ির বনটা এরা পাতি পাতি ক'রে খুঁজতে আরম্ভ ক'রে দিলে—এমুড়া থেকে ওমুড়া পর্য্যন্ত।

হুলো মাঝি আজ ছাগল চরাতে যায়নি, সারা দিন সে কুঁড়ে আগলে চালাঘরে বসে আছে ঠায়। ক'দিন থেকে মনটা বেশ ভাল নাই হুলোর, শরীরটাও বেশ ভাল যাচ্ছে না, ডান পায়ের ঘা-টা দিনে দিন যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ছাগলগুলোর গলায় পাগা দিয়ে পাশাপাশি একসঙ্গে বেঁধে দিগদড়ি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে হুলো। কাঁদরের ধারে এখন মেলাই ঘাস, চরে একটু খেতে পারলেই হলো; আমপালাও

কতকগুলো ভেঙ্গে রেখেছে হুলো, সন্ধ্যার দিকে ছাগলগুলোর মুখে ধরে দিলেই চলবে। বড় পাঁঠীটা বাচ্চা দিয়েছে গোটা তিনেক, বাঁটগুলো ওর সব সময়ই টুল টুল করছে দুধে। দুলালীকে কতদিন কানে কামড়ে বলে দিয়েছে হুলো মাঝি পাঁঠীটাকে দুয়ে মেয়েটাকে রোজ একটু ক'রে দুধ খাওয়াতে, কিন্তু দুলালী কি হুলোর কথা কানে তুলবে। ওর মন মেজাজের হদিস পাওয়া ভার, হুলো মাঝির কোন কথাই সে গ্রাহ্য করে না। ও গাঁয়ের বাউরী মুনিসগুলোর সঙ্গে মাঠে ঘাটে কাজ করতে দুলালীকে পই পই ক'রে নিষেধ ক'রে দিয়েছে হুলো। বাউরীগুলো নাকি লোক ভাল নয়, গেরস্তর মাঠে কাজ করতে করতে ওরা নাকি কামিনদের দিকে হাঁ ক'রে সব চেয়ে থাকে, হুলো মাঝি ছাগল চরাতে গিয়ে নিজের কানে শুনে এসেছে বাগাল ছেলেদের কাছ থেকে। ঝড়ো বাউরী বলে তাকড়া জোয়ান বাউরীদের একটা বদমাইস ছোঁড়া সেদিন নাকি দুলালীকে চোখ ঘুরিয়ে ইসারা করেছিলো, মছলীপাড়ার বাগাল ছেলেরা নিজে দেখেছে। দুলালী কিন্তু স্বীকার করে না ওসব কথা, ঝড়ো বাউরীর নাম করতেই দুলালী সেদিন তেড়ে যেন মারতে এলো হুলো মাঝিকে। কে জানে—ঝড়ো বাউরী বলে ছোঁড়াটা যে কে আর কি যে তার সম্বন্ধ দুলালীর সঙ্গে—দুলালীই জানে। বাগাল ছেলেদের মধ্যে এক আধটু কানা ঘোঁসা কিছু শুনে এসেছে হুলো, দুলালীর নামের সঙ্গে ঝড়ো বাউরীর নাম জড়িয়ে কি যেন সব আলোচনা করে। ব্যাপারটা ভাল ক'রে জানতে হবে হুলো মাঝিকে, দুলালীর মধ্যে সত্যি সত্যি কোন রকম বেচাল যদি ধরা পড়ে কোন দিন—সেদিন কিন্তু প্রলয় কাণ্ড ক'রে বসবে হুলো, হুলো মাঝিকে জান দিতে হয় সেওভি আচ্ছা। ঝড়ো বাউরীর আওতা থেকে দুলালীকে সরাতেই হবে, যেমন ক'রে হোক।

পাহাড়তলি খোঁজ ক'রে ফিরে এলো সুখন মাঝি, মোহনের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। পাতাড়ির জঙ্গলেও সে নাই, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হয়েছে। রাবণ মাঝি একটু হতাশ হয়ে বললে,—তাহলে সে পালিয়েছে, দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই হয়ত সরে পড়েছে।

সুখন মাঝি বলে উঠলো,—ধরা তাকে পড়তেই হবে সর্দার, আমাদের চোখ এড়িয়ে কতক্ষণ সে লুকিয়ে বেড়াবে।

কিষ্টু মাঝি একটু আমতা আমতা ক'রে বললে,—কিন্তু সর্দার, আমার যেন কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছে, চরণ মাঝি লোকটাকে ঠিক দেখেছে ত?

চরণ মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—খুব ভাল ক'রে দেখেছি আমি, মোহন মাঝি এসে বসেছিলো ওই চাকলতা গাছের নীচে।

রাবণ মাঝি একটু হেসে বললে,—ভুল ও হয়ত হতে পারে, কিন্তু তবু আমাদের সজাগ থাকতে হবে, দুশমনকে আর দুশমনি করবার এতটুকু সুযোগ আমরা দিব না।

সুখন মাঝি আর হপন মাঝি একসঙ্গে বলে উঠলো,—কিছুতেই না।

ঈশান কোনে ভয়ানক মেঘ করেছে, হয়ত বা ঝড় উঠবে, বেলাও আর বেশি নাই। সকলে মিলে কাঁদরের পথ ধরে ফিরে চললো আবার বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে। রাবণ মাঝি ডান দিকের সোজা পথটা ছেড়ে দিয়ে বাঁ-হাতি সুড়ি পথটা ধরে বললে,—এই দিক দিয়ে একটু ঘুরে চল্ দেখি।

সকাল থেকে দুলালী গেছে বেওরা খাটতে, ফাঁকা কুঁড়েয় দুলো মাঝি আজ একা। দূর থেকে রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য করেছে দুলো, কাঁদরের ধার দিয়ে একসঙ্গে ওদের হৈ-চৈ ক'রে আসতে দেখে দুলো

যেন একটু ভড়কে গেল। রাবণ মাঝি ভয়ানক লোক, একটি দিনেই দুলো তাকে চিনে নিয়েছে। দুলালীর বিয়ের দিন সে কি তার ভয়ানক মূর্ত্তি, সে কি তার চোখে মুখে উগ্র আর জলন্ত ভাব; একটি বারের বেশি দ্বিতীয়বার রাবণ মাঝির মুখের দিকে তাকাতে আর সাহস হয়নি দুলোর; রাবণ মাঝিকে দেখলে ওর ভয় করে। দূর থেকে রাবণ মাঝিকে সদলবলে আসতে দেখে দুলো মাঝি কুঁড়ে ঘরের আগুড়টা তাড়াতাড়ি ঠেসিয়ে দিয়ে চটপট গিয়ে ঢুকে পড়লো একটা ঝোপের মধ্যে। ওরা খানিকটা এগিয়ে না গেলে ঝোপ থেকে আর বেরুচ্ছে না দুলো, দুলো মাঝিকে কেটে ফেললেও না।

কাঁদর উঠে রাবণ মাঝি বরাবর এগিয়ে চললো দুলালীর কুঁড়ের দিকে মুখ ক'রে। কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে থমকে একটু দাঁড়ালো রাবণ মাঝি, তখন মাঝির দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে সে বলে উঠলো,—ভিতরটা একটু উঁকি মেরে দেখ দেখি, খোল কুঁড়ের আগুড়টা।

অগুড়টা একপাশে ঠেলে দিয়ে একে একে সব ঢুকে পড়লো কুঁড়ের মধ্যে। ফাঁকা কুঁড়ে, কেউ কোথাও নাই, সামান্য কয়েকটা জিনিস পত্র এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে। রাবণ মাঝি বার থেকেই একটু উঁকি দিয়ে দেখে নিলে কুঁড়ের ভিতরটা, তারপর সে গম্ভীরভাবে বলে উঠলো,—ঠিক আছে, বেরিয়ে আয় সব, আগুড়টা আবার তেমনি ক'রে বন্ধ ক'রে দে।

রাবণ মাঝি ধীরে ধীরে বিদেয় হয়ে গেল। কাঁদরের ধারে ধারে এগিয়ে চললো সে বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে।

দুলো মাঝি ঝোপের ভিতর থেকে লক্ষ্য করছে ওদের। এতগুলো লোকজন সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ আজ রাবণ মাঝি এদিক দিয়ে এসে পড়লো কেন? কাকে যেন খুঁজছে ওরা, কিন্তু দুলালীর কুঁড়েটা হঠাৎ তদন্ত

করতে গেল কেন রাবণ মাঝি, ব্যাপারটা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারছে না ফুলো। তবে কি ওরা দুলালীর স্বভাব চরিত্রে কোন সন্দেহ করে? অসম্ভব নয়।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে কুঁড়ে ঘরের একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো ফুলো মাঝি। দূর থেকে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকগুলোর দিকে।

সকাল বেলা গামছায় ক'রে দুটো জলখাবার বেঁধে নিয়ে বেওরা খাটতে বেরিয়ে গেছে দুলালী, এতক্ষণে সে বাড়ী ফিরছে। দূর থেকে রাবণ মাঝিকে সে লক্ষ্য করেছে, কিন্তু দুলালীর কুঁড়েয় এসে হঠাৎ আজ ওরা এমন ভাবে হানা দিলে কেন? দুলালী কতখানা সুখে আছে, কি ভাবে তার দিন কাটছে, তাই হয়ত একটু উঁকি মেরে দেখে গেল রাবণ মাঝি। কিন্তু কি তার আবশ্যকতা, দুলালীর সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি রাবণ মাঝির! দুলালীর বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো। বাপ হয়ে মেয়ের সঙ্গে এতখানা শত্রুতা যে কেউ করতে পারে—দুলালীর তা জানা ছিলো না।

সুকুরমনিকে কোল থেকে নামিয়ে কুঁড়ের সামনে বসিয়ে দিলে দুলালী। মাথার ঝুড়িটা একপাশে নামিয়ে রেখে ফুলো মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো,—কিস্‌কে ওরা এসেছিলো এ[illegible] দিয়ে?

ফুলো মাঝি একটু মুখ বেঁকিয়ে বললে,—তুঁয়েই জানিস।

কুঁড়ে ঘরের আগুড়টা খুলতে খুলতে দুলালী জিজ্ঞাসা করলে,—আমার কুঁড়েয় এসে ওরা ঢুকেছিলো কেন?

ফুলো মাঝি জবাব দিলে,—কে জানে, কাকে যে ওরা খুঁজছে ওরাই জানে,—আমাকে কি বলেছে।

দুলালী একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—খুঁজছে,—কাকে খুঁজছে?

ফুলো মাঝি বলে উঠলো,—তা জানি না, তোর এখানে বাইরের লোক কেউ যাওয়া আসা করে কিনা তাই নিয়ে হয়ত কোন রকম ওদের সন্দেহ হয়েছে।

দুলালী ফুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে খানিক চেয়ে থেকে বললে,—তার মানে?

ফুলো মাঝি একটু তিরিক্ষিভাবে বলে উঠলো,—কদ্দিন থেকে তোকে বারণ করছি যে ওগাঁয়ের বাউরীগুলোর সঙ্গে অত মেলামেশা করিস না, তা আমার কথা কি কানে তুলবি—ঠেলাটা এখন বোঝ।

দুলালীর মাথাটা হঠাৎ বোঁ ক'রে ঘুরে গেল। তবে কি ওরা দুলালীকে দুশ্চরিত্রা বলে সন্দেহ করে? কি সাংঘাতিক! হয়ত ওরা ভেবেছে এই করেই বুঝি দিন চলে দুলালীর, কি ভয়ানক কথা। দুলালীর শিরায় শিরায় যেন আগুনের ফিনকি ছুটে গেল, অপমানের বোঝা ক্রমশই যে ভারী হয়ে উঠছে, এও কি আজ দুলালীকে সহ্য করতে হবে?

কুঁড়ে থেকে ধড়মড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো দুলালী। লোকগুলো এখনো বেশি দূর যেতে পারে নি, ভুট্টাক্ষেতের পারে দাঁড়িয়ে কি যেন সব আলোচনা করছে। কে জানে—হয়ত বা আবার কোন্ নতুন ফন্দি আঁটছে ওরা! দুলালীকে আবার নতুন ক'রে শাস্তি দিতে হবে—তারই হয়ত পরামর্শ চলছে, দুলালী যে আজ ওদের চোখে ভ্রষ্টা। দুলালীকে ওরা সন্দেহ করে, কি আশ্চর্য্য!

রাবণ মাঝি আলপথ দিয়ে এগিয়ে চললো মহুল বাগানের দিকে। পিছনে তার হুখন মাঝি, হপনা, চরণ, কিষ্টু, একসঙ্গে ওরা বাড়ী ফিরছে। দুলালী হঠাৎ কাঁদরের ধারে ধারে ছুটতে আরম্ভ করলে, রাবণ মাঝির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার, এ সব অত্যাচার চোখ বুজে আর সহ্য করবে না দুলালী, কোনমতেই সহ্য করবে না।

ভুট্টাক্ষেতের শেষ প্রান্তে মহুলবাগানের লাগাও ঝাঁওপাথরের ডাঙ্গাটায় গিয়ে উঠলো দুলালী ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে। কিষ্টু মাঝি পিছন ফিরে চেয়ে দুলালীকে দেখে অবাক হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি সে জিজ্ঞাসা করলে,—কি হয়েছে দুলালী, অমন ক'রে ছুটছিস যে?

কিষ্টু মাঝির কথার কোন জবাব দিলে না দুলালী, হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো সে রাবণ মাঝির সামনে, রাবণ মাঝির পথ আগলে। হকচকিয়ে উঠলো হঠাৎ সকলেই, রাবণ মাঝি থম্‌কে একটু দাঁড়ালো। দুলালী তাদের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো,—আমি জানতে চাই কি জন্যে আমার কুঁড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলি তোরা, কোন্ অধিকারে?

রাবণ মাঝি একটু স্তম্ভিত হলো। যা করে সে ভেবে চিন্তেই করে, যা করেছে সে ভাল বুঝেই করেছে; তার জন্যে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি দুলালীর কাছে; আশ্চর্য্য! রাবণ মাঝি কোন জবাব দিলে না হঠাৎ। দুলালী আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো,—কি তোরা মনে করিস আমাকে, এমনি ক'রে দিনের পর দিন পদে পদে আমার অপমান ক'রে যাবি তোরা, আর চোখ বুজে তাই সহ্য করবো আমি! এ আর আমি সইবো না।

রাবণ মাঝি একটু চোখ পাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো,—হুঁসিয়ার—এখনো বলছি খুব হুঁসিয়ার।

কিষ্টু মাঝি গিয়ে ধীরে ধীরে রাবণ মাঝির হাত ধরে দুলালীর সামনে থেকে সরিয়ে দিলে। রাবণ মাঝির আর প্রবৃত্তি হলো না দুলালীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করতে, ধীরে ধীরে সে হাঁটতে আরম্ভ করলে। দুলালী সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে জোর গলায় বলে উঠলো,—ফের যদি কোনদিন আমার কুঁড়েয় গিয়ে হানা দিস

তোরা—সেদিন কিন্তু আমি পঞ্চ-গেরামী সালিশ ডাকবো, দেখবো আমি রাবণ মাঝির বিচার তারা করে কি না।

রাবণ মাঝি থমকে একটু দাঁড়ালো, পিছন ফিরে গর্জ্জে খানিব তাকালো সে,—কিষ্টু মাঝি আবার ডাক দিলে,—সদ্দার!

রাবণ মাঝি নিজের মনেই একবার বলে উঠলো,—হুম্। তারপর সে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করলে আবার। কিষ্টু মাঝির দিকে একটুখানি চেয়ে গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—ঠিক আছে চল, রাবণ মাঝি ঠিকই আছে।

দুলালীর দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। ওখানে আর দাঁড়ালো না দুলালী, ক্ষিপ্র বেগে পা চালিয়ে দিলে, ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে ফিরে চললো সে আবার কুঁড়ের দিকে। সূর্য্য তখন ডুবে গেছে, ঈশান কোণের কালো মেঘটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশ জুড়ে। শন্ শন্ শব্দে ঝড় উঠলো হঠাৎ, দুলালী গিয়ে কুঁড়েঘরে পৌঁছবার আগেই চারিদিক ঘোর ক'রে মুষল ধারে বৃষ্টি নেমে এলো।

হুলো মাঝির মনটা ভয়ানক উসখুস করতে লাগলো। জগন মাঝি আজ মদ সাজিয়ে রেখেছে, জনার ক্ষেতের রাখালদের সে আজ মদ খাওয়াবে, সন্ধ্যার পর কুঁড়েয় গিয়ে এক জায়গায় সব জমবার কথা। জগন মাঝি লোক ভালো, ভক্তি ছেদ্দা একটু করে হুলোকে। মাঝে মাঝে হুলো গিয়ে জগন মাঝির জনার ক্ষেতে পাহারা দেয়, রাত জেগে শেয়াল তাড়ায় মাচানের উপর বসে বসে। জনারের মরসুম প্রায় শেষ হয়ে এলো, গাছগুলো এবার কাটা পড়ে যাবে, তাই ফসল উঠবার আগে জগন মাঝির কুঁড়েতে আজ মদ মাংসের একটু আয়োজন করা হয়েছে।

পাশাপাশি জনার ক্ষেতের জন চার পাঁচ রক্ষকদার জগন মাঝির আজ নিমন্ত্রিত, হুলো মাঝিকেও সন্ধ্যার সময় যেতে বলেছে জগন।

বৃষ্টিটা খুব জোর নেমেছে। মেঘ ডাকছে গুড় গুড় শব্দে, ঝড়ের দোলায় হুলোর চালাঘর খানা কেঁপে কেঁপে উঠছে, প্রকাণ্ড শিমুল গাছটা ডালপালা সমেত যেন হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। মেঘের ভাবগতিক বেশ ভাল বুঝছে না হুলো, ঝড় বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। জগন মাঝি হয়ত মদ সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় ক'রে হুলো মাঝি যায় কেমন ক'রে। পচুই মদের নেশা হুলোর ভাগ্যে কদাচিৎ জোটে, মদ খেতে পয়সা কোথায়। কিন্তু অভ্যাস তার বহুদিনের, মাঝে মাঝে এর ওর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নেশা এক আধটু ক'রে হুলো। জগন মাঝির জনার ক্ষেতে শেয়াল তাড়িয়ে মাঝে মাঝে নেশা ভাঙটা চলছে আজকাল মন্দ না, কিন্তু সন্ধ্যা থেকে যে রকম দুর্যোগ আরম্ভ হয়েছে—মদের মজলিসটা হয়ত বা আজ ভেস্তেই গেল শেষ পর্যন্ত। মনটা ভয়ানক খিঁচড়ে উঠলো হুলোর, ঝড় বৃষ্টি কি আজ আর থামবে না!

কুঁড়ের বাইরে উনুনের মধ্যে জল জমে গেছে, শুকনো কাঠগুলোও বৃষ্টির জলে ভিজে গেল বেবাক; রান্নাবান্নার জোগাড় আজ আর হয়ে উঠবে না। বৃষ্টিটা ধ'রে আসতেই লম্ফটা জেলে ফেললে দুলালী। সকাল বেলার কতকগুলো ভিজে ভাত পড়ে আছে হাঁড়িতে তাই দিয়েই সে কোন রকমে চালিয়ে নেবে আজকের মত। একটা বাটি ক'রে কতকগুলো ভাত বেড়ে সুকুরমনিকে খাওয়াতে বসলো দুলালী। দেখতে দেখতে বৃষ্টিটা কমে এলো একেবারেই, ছিটেফোঁটা যা পড়ছে তা সামান্য। মেঘটা কিন্তু ঘোর ক'রে আছে এখনো, শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইছে সমানে।

ফুলো মাঝিকে এবার বেরুতে হবে, দেরি ক'রে আর লাভ নাই কোন। একটা মাটির ভাঁড় হাতে ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো ফুলো, অন্ধকারে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হলো গিয়ে সে জগন মাঝির কুঁড়েতে। জনার ক্ষেতের রাখালরা ভাঁড় নিয়ে সব বসে গেছে ফুলো গিয়ে পৌঁছবার আগেই। জগন মাঝি পচুই মদের ব্যবস্থা করেছে পুরো একটি হাঁড়া, তার সঙ্গে ঝালদেওয়া মাংসের চাট আর চানড়া পোড়ার চচ্চড়ি! আয়োজনের বহর দেখে ফুলো মাঝির মনটা যেন নেচে উঠলো, খুশির আমেজে ভরে উঠলো তার ড্যাব ড্যাবে চোখ দুটো। জগন মাঝি ফুলোকে দেখে বলে উঠলো,—ওই খানেই চুপ চাপ বসে পড় একধারে।

মাটির ভাঁড়টা সামনে পেতে কুঁড়ের একপাশে বসে পড়লো ফুলো। মদ মাংস আর হৈ-হুল্লোড় চলতে লাগলো পুরোদমে। জগন মাঝি হাঁড়া থেকে মদ ঢালতে ঢালতে জটা মাঝির দিকে চেয়ে বললে,—ফুলো মাঝির গায়েন দুটো শুনবি নাকি? সিরিং ফুলো ভালই করে।

জটা মাঝি খুশি হয়ে বলে উঠলো,—তাই নাকি?

জগন মাঝি ফুলোর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে,—লাগা দেখি একটা লাগড়ে সিরিং।

ফুলো মাঝি চোঁ চোঁ ক'রে খানিকটা মদ গিলে ভাঁড়টা নীচে নামিয়ে রেখে হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো নি[illegible] মনেই। লাগ্ড়ে সিরিং—তা লাগ্ড়ে সিরিং বেশ ভালই জানে ফুলো, লাগড়ে সিরিং, দাঁশাই সিরিং, দং সিরিং, সহরাই সিরিং * বিলকুল তার জানা আছে।

---

* বিভিন্ন শ্রেণীর সাঁওতালী গান।

ঝুলো মাঝি দাঁত দিয়ে খানিকটা চামড়াপোড়া ছিঁড়ে নিয়ে কচ্ কচ্ শব্দে চিবুতে লাগলো, চাটটা যেন দাঁতে ওর বসে গেছে। আরও খানিকটা মদ টেঁসে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে ধরলে ঝুলো একটা লাগ্ড়ে সিরিং।

ঝুলো মাঝির গান খুব জমে উঠেছে, জটা মাঝি ঘাড় নেড়ে নেড়ে মাদল বাজাতে লাগলো ঝুলো মাঝির গানের সঙ্গে। এমন সময় কতকগুলো শেয়াল ডেকে উঠলো ভুট্টাক্ষেতের ওপাশ থেকে। শেয়ালের ডাক শুনেই গানবাজনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। জন দুই তিন তাড়াতাড়ি কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেনেস্তারা বাজাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ঝুলো মাঝি একটা মাচানের উপর চড়ে জোর গলায় আওয়াজ করতে লাগলো,—হে—লে—লে—লে—লে—হেইয়ো—

নিঝুম মেরে কুঁড়ের মধ্যে পড়ে আছে দুলালী। মেয়েটা তার ঘুমিয়ে পড়েছে বহুক্ষণ আগেই। দুলালীর চোখে ঘুম নাই, আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে মন তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে আজ ভয়ানক দুর্যোগ, ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার; দুলালীর মনের কোণেও দুর্যোগ আজ ঘনিয়ে উঠেছে, ঝড় বইছে তার সারা অন্তর জুড়ে। এমন ক'রে কত দিন আর চলে, দুলালী যে আর বইতে পারছে না দুর্বহ এ জীবনের ভার, মনের জোর তার ক্রমশই যেন কমে আসছে। বিশেষ ক'রে ঝুলোর সঙ্গ যে আর কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারছে না দুলালী, ঝুলোর সঙ্গে তার সত্যিকারের কতটুকু সম্বন্ধ বাইরের লোক ত তা বুঝবে না। দুলালীকে কি যে তারা ভাবে সে সব কথা ভাবতে গেলেও দুলালীর মনটা যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠে আপনা থেকেই, নিজেকে তার অত্যন্ত ছোট বলে মনে হয় নিজের কাছেই। শত লাঞ্ছনা শত অপমান

সহ্য ক'রে এই ভাবে দুঃসহ এই জীবন ভার বয়ে বেড়াবার সত্যই কোন অর্থ আছে কি? দুলালী এবার মুক্তি চায়, যেমন ক'রে হোক মুক্তি চায়। কিন্তু যার পথ চেয়ে এত লাঞ্ছনা সহ্য করেও আশার আশায় বুক বেঁধে দিনের পর দিন গুনছে দুলালী, সে ত কই ভুলেও একবার ফিরে তাকালো না। সে হয়ত আর আসবে না, দুলালী হয়ত একেবারেই মন থেকে মুছে গেছে তার। তা যাক, আপসোস নাই দুলালীর; সে যদি অনায়াসে দুলালীকে ভুলে থাকতে পারে—দুলালীও জোর ক'রে ভুলে থাকবে তাকে। কিন্তু এভাবে আর নয়, এখান থেকে পালাতে হবে দুলালীকে—যেমন ক'রে হোক।

শুয়ে শুয়ে কত কথাই ভাবতে লাগলো দুলালী, ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো তার জড়িয়ে এলো ঘুমে।

ফুলো মাঝি মদের নেশায় চোর হয়ে উঠেছে, টলতে টলতে বাড়ী ফিরছে ফুলো কাঁদরের ধারে ধারে। মদের নেশার সঙ্গে সঙ্গে গানের নেশাও আজ যেন তাকে পেয়ে বসেছে। এমনিতে ফুলো মাঝি গায় না, কিন্তু পচুই মদ যদি একটু খানি পেটে পড়েছে তবে আর ফুলোর মুখে হাত দেয় কে; বেতালা সুর ভাজতে ভাজতে ফুলো এক উৎকট রসের সৃষ্টি ক'রে তোলে, ফুলো মাঝির এটা বারবরকার অভ্যাস।

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কাঁদরের ধারে বার দুই [illegible] আছাড় খেলে ফুলো, মদের ভাঁড়টা সে চুরমার ক'রে ফেললে। ফুলোর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই কোনদিকে, নেশার আমেজে মন যেন তার উড়ছে। কথাগুলো ক্রমশই জড়িয়ে আসছে ফুলোর, মাথাটা তার বন্ বন্ করে ঘুরছে, সোজা হয়ে সে দাঁড়াতে পারছে না, ঘন ঘন পা টলছে; তবু কিন্তু গান ছাড়েনি ফুলো, কাঁদরের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটানা সে গেয়ে চলেছেঃ—

সাঁওতালী মহুলী পাকা ডেমুর খাওয়ালি,
ভাসুরকে ভাত দিতে ঝুমুক দেখালি—
ও তুই ঝুমুক দেখালি।
দিলি কুলে কালি—ও তোর মুখে কালি,
হলি কলঙ্কিনী সবার চোখের বালি,
হায় হায় চোখের বালি—

টলতে টলতে দুলালীর কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে আগুড়টায় একবার ধাক্কা দিলে নুলো, জোরগলায় সে ডাক দিলে একটা,—ঘুমুলি নাকি, দুলালী—বলি ও দুলালী!

দুলালীর সাড়া শব্দ কিছু মাত্র পাওয়া গেল না। নুলো মাঝি চালা-ঘরের সামনেটায় চিৎপাত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো গিয়ে ছেঁড়া একখানা তালাইয়ের উপর। মদের নেশায় চারিদিক যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে, নুলো মাঝি শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত যেন ঘুরপাক খেতে লাগলো নাগরদোলায় চড়ে। বিড় বিড় ক'রে বকতে বকতে কিছুক্ষণের মধ্যেই নুলো একেবারে নিঝুম মেরে গেল, নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়লো নুলো।

* * * * * *

ঝকঝকে একখানা টাঙ্গি হাতে ক'রে এই অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে পড়লো টুংরা। হলদিগড়ের পাহাড়ে ঝিঙেফুলি বাঘ মেরে এই টাঙ্গি সে বকশিশ পেয়েছে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। এই টাঙ্গি দিয়েই নুলো মাঝিকে সে খুন করবে আজ, কার সাধ্য টুংরা মাঝির হাত থেকে নুলোকে আজ বাঁচায়। টুংরার চোখের সামনে দুলালীকে নিয়ে পরম সুখে ঘরকন্না করবে নুলো, আর টুংরা সাঁওতাল চোখ বুজে তাই

নির্ব্বিবাদে সহ্য করে যাবে, এ হয় না—টুংরা এ হতে দেবে না, টুংরা মাঝির জান কবুল। টুংরার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে ঝুলোর মত একটা কুঠের হাতে দুলালীকে যারা অনায়াসে তুলে দিয়েছে, টুংরা মাঝি দেখবে কেমন করে তারা টুংরার খপ্পর থেকে ঝুলোকে আজ বাঁচায়। টুংরা আজ মরিয়া, দুলালীকে অপরের সংসর্গ থেকে বাঁচাবার জন্য জান সে আজ নিতেও পারে, দরকার হলে নিজের জান সে দিতেও পারে। দুলালীর জন্যে কি না করেছে টুংরা, লোকে আজ টুংরাকে বিদ্রূপ ক'রে কানা বলে, এতদিন সে পাগল ছিলো, আজ বলে সব কানা। কানা ত সে ছিলো না, ইচ্ছে ক'রে কানা হয়েছে টুংরা, চোখ একটা সে নিজের হাতে উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু কোন কাজেই লাগলো না তার এতবড় আয়োজন, দুলালীকে পাওয়া গেল না, ঝুলো মাঝি এসে হঠাৎ তাদের মাঝখানে তুলে দিলে এক দুর্ভেদ্য বাবলা কাঁটার বেড়া। টুংরা এ বেড়া ভেঙ্গে ফেলবে, এ কাঁটা তাকে সরাতেই হবে, আজ—এই রাত্রেই। ঝুলোকে আজ টুংরা মাঝি একেবারেই শেষ ক'রে দেবে, টুংরা মাঝির বিচার। সাঁওতালী সমাজ যে শত্রুতা করেছে আজ টুংরার সঙ্গে, ঝুলো মাঝিকে খুন ক'রে খানিকটা তার শোধ তুলে নেবে টুংরা। তারপর যা হয় হোক, টুংরা মাঝি পরোয়া করে না।

ভালুকপোতা পিছনে ফেলে ধান মাঠের আলে আলে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে এগিয়ে চললো টুংরা। পথঘাট তার সমস্তই চেনা। ডাঙ্গা ডহর বন জঙ্গল পার হয়ে যেতে হবে তাকে অনেকখানা পথ—অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইছে জোর, ঘুণি ঘুণি বৃষ্টি পড়ছে, কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে আছে। পথ ঘাট সব অন্ধকারে ঢাকা, বিদ্যুতের আলো মাঝে মাঝে পথ দেখাচ্ছে টুংরাকে। জবরদস্ত টাঙ্গি একখানা ঘাড়ে ফেলে ভূতের মত এগিয়ে চললো টুংরা। সামনের

জঙ্গলটা পার হয়ে আর খানিকটা এগিয়ে যেতে পারলেই কাঁদরের ধারে গিয়ে পড়বে সে, তারপর সিধে একেবারে দক্ষিণ মুখে উঠবে গিয়ে দুলালীর কুঁড়েতে। রাত প্রায় প্রহর দুই'য়ের কাছাকাছি, নুলো হয়ত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে কুঁড়ে ঘরে চাটাই পেতে। এ ঘুম তার ভাঙ্গবে না আর, নুলোকে আজ একেবারেই ঘুম পাড়িয়ে দেবে টুংরা। সেই সঙ্গে দুলালীর মেয়েটাকেও শেষ ক'রে দিতে পারলে মন্দ হয় না। মোহন মাঝির মেয়ে, তাকেই বা কেমন ক'রে ছেড়ে দেবে টুংরা; মোহন যে ওর বাপ, মোহন মাঝির ঔরসে যে ও মেয়ের জন্ম। দূর থেকে সেদিন দুলালীর কোলে মেয়েটাকে লক্ষ্য ক'রে এসেছে টুংরা। মোহনের কাছে হয়ত ওর কিছু দাম থাকতে পারে, কিন্তু টুংরার সে দু'টি চোখের বিষ। ওটাকেও টুংরা এই সঙ্গে শেষ ক'রে ফেলবে নাকি? গলা টিপে কাঁদরের জলে ভাসিয়ে দিলেই—বাস্, চুকে যাবে লেঠা। টাঙ্গির ভার সইবে না ও কচি মেয়ের ঘাড়ে, ও যে একেবারে কচি; তার চেয়ে বানের জলে জলসাই, সেই ভাল—সেই চেষ্টাই করবে টুংরা। দুলালীর মনে যদি আঘাত লাগে এতে—টুংরা মাঝি নাচার, মোহনের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রে জেনে শুনে যে ভুল একদিন করেছে দুলালী সে ভুলের তাকে মাশুল দিতে হবে, এও টুংরার বিচার, মেয়েটার ব্যবস্থা করতেই হবে টুংরাকে। কিন্তু তার আগে নুলো মাঝির পালা, টুংরা মাঝির আজ প্রধান শিকার নুলো।

তালঝারির আমবাগান পার হয়ে অর্জ্জুনকুঁড়ির শ্মশানটা বাঁয়ে রেখে কাটি জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়লো টুংরা! আর খানিকটা এগিয়ে যেতে পারলেই কাঁদরের ধারে গিয়ে পড়বে সে।

মোহন মাঝি কয়লা খাদ থেকে ফিরে এসেছে। ক'দিন থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সে বনে জঙ্গলে। প্রকাশ্যে তার বেরোবার উপায় নাই,

দেশের সঙ্গে যে মহাশত্রুতা ক'রে গেছে মোহন, তাই দেশের লোক তার ভিটে মাটি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে আজ, সমাজের বিচার। মোহন কিন্তু মনে মনে জানে অপরাধ সে কিছু মাত্র করে নি। দুলালীকে ভালবাসে মোহন, বাইরের সব কিছুকে তুচ্ছ ক'রে, সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে তার অন্তরের সত্যকে। এতে যদি সমাজের চোখে তাকে অপরাধী হতে হয়—সে সমাজে কোন প্রয়োজন নাই মোহনের, দেশের মায়া সে কাটিয়ে উঠেছে। চুপি চুপি একবার দুলালীর সঙ্গে দেখা করতে হবে মোহনকে যেমন ক'রে হোক। দুলালীকে ওরা আটকে রেখেছে ছোট্ট একটা কুঁড়ের মধ্যে। মোহন জানে দুঃসহ এ শাস্তির বোঝা কোন মতেই বইতে পারবে না দুলালী, দুলালীর পক্ষে এ অসহ্য। ভয়ানক ভুল করেছে মোহন দুলালীকে ছেড়ে দিয়ে, সে ভুলের ঋণ দুলালীকে যে এই ভাবে শোধ করতে হবে সে কথা মোহন ভাবতে পারেনি। প্রকাশ্যে তার বেরোবার উপায় নাই, চারিদিকে শত্রু, এ অবস্থায় মুখোমুখি দেখা হলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ তার অনিবার্য্য। অযথা একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি করতে চায় না মোহন, দুলালীর সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে তাকে সঙ্গে নিয়ে চুপি চুপি সে এখান থেকে সরে পড়তে চায়। দুলালীর কুঁড়েটা দিনের বেলা দূর থেকে দেখে এসেছে মোহন, এ পর্য্যন্ত সে সুযোগ পায়নি দুলালীকে ধরবার। উপযুক্ত অবসর, নিস্তব্ধ নিশুতি রাত, ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে পথ ঘাট সব ঢেকে দিয়েছে, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই; দুলালীর সঙ্গে দেখা করবার এই উপযুক্ত অবসর।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে কাঁদরের ধারে ধারে দুলালীর কুঁড়ের দিকে এগিয়ে চললো মোহন উত্তর দিকে মুখ ক'রে। বিদ্যুতের আলোয় মাঝে মাঝে পথ দেখা যাচ্ছে।

দুলালীর কুঁড়ের সামনে এসে থমকে খানিক দাঁড়ালো। টুংরা শিমুল গাছের নীচে। কেউ কোথাও জেগে নাই, অন্ধকারে চারিদিক ডুবে গেছে, অস্পষ্ট বিদ্যুতের আলোয় মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সারবন্দী ভুট্টার ক্ষেত, শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বয়ে যাচ্ছে ভুট্টা ক্ষেতের উপর দিয়ে। কাঁদরের ওধারটায় দুর্ভেদ্য পাতাড়ির বন অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে নিঃশব্দে যেন খাড়া হয়ে আছে কালো রঙের কফিন ঢাকা বিরাট একটা প্রেতপুরীর মত। কাঁদরের ধার থেকে কোলা ব্যাঙের একটানা ক্যাঁও ক্যাঁও শব্দ ভেসে আসছে হাওয়ার সঙ্গে অন্ধকারের বুক চিরে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই টুংরার, টাঙ্গি হাতে নিঃশব্দে সে দাঁড়িয়ে আছে এসে দুলালীর কুঁড়ের কাছে, জিঘাংসার প্রতিমূর্ত্তি রক্ত-লোলুপ জীবন্ত এক নিশাচরের মত। যে ঝড় বইছে আজ টুংরা মাঝির মনের মধ্যে, বাইরের এ দুর্যোগ তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। রাত এখন কতখানা কে জানে, পাতাড়ির জঙ্গলে শেয়াল ডাকছে, দুপুর রাত হয়ত গড়িয়ে গেছে। দেরি ক'রে আর লাভ নাই কোন, দুলো মাঝিকে শেষ করতে হবে, এই তার উপযুক্ত অবসর।

পা টিপে টিপে দুলালীর কুঁড়ের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো টুংরা। ভিতর থেকে কুঁড়ের আগল বন্ধ, দোরের কাছে কান খাড়া ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো টুংরা, ভিতর থেকে সাড়া শব্দ কিছুমাত্র পাওয়া গেল না, নিঃশ্বাসের শব্দটুকু পর্য্যন্ত না। আগুড়খানা খুলে ফেলতে হবে ভিতর দিকে হাত বাড়িয়ে, ভয় পেলে চলবে না টুংরার; অন্ধকারের মধ্যে থেকেই দুলো মাঝিকে কোন রকমে খুঁজে নিতে হবে, তারপর এক লহমায় কাজ শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি আবার সরে পড়তে হবে টুংরাকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

মনের জোর যতই থাক টুংরার তবু ওর গা-টা যেন ছম্ ছম্ করতে লাগলো। আশে পাশে কেউ কোথাও জেগে নাই ত! চারিদিক একটু ঘুরে ফিরে ভাল ক'রে দেখে নেওয়া দরকার। টুংরা পা টিপে টিপে দুলালীর কুঁড়ে ঘরের পিছন দিকটা চক্কর মেরে ঘুরে এলো একটু খানি, চারিদিক নিঝুম। চালাঘরের এক কোনে নুলো মাঝির ছাগল গুলো টুংরার সাড়া পেয়ে হঠাৎ হুটোপুটি ক'রে উঠলো। হঠাৎ একটু চমকে উঠলো টুংরা, তাড়াতাড়ি সে সরে পড়লো ওখান থেকে, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক আবার নিঝুম। ভয় পেলে চলবে না টুংরার, ভয় পাবার কিছু নাই এতে; এতখানা যখন সে এগিয়ে এসেছে তখন এর একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে কিছুতেই আজ ফিরবে না টুংরা, পথের কাঁটা তাকে সরাতেই হবে।

ঘুরে ফিরে চালাঘরের সামনে এসে থম্‌কে একটু দাঁড়ালো টুংরা, কে যেন চালার একপাশে শুয়ে রয়েছে উত্তর দিকে মাথা ক'রে; কাঠাড়ের পাশ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটাকে, অন্ধকারে পড়ে আছে সে এক ধারে ভূতের মত। কে ও লোকটা—ও কি নুলো? নুলো মাঝি এখানে? আর একটা বিদ্যুতের ঝিলিক দিতেই সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে চিনে ফেললে টুংরা, নুলো মাঝিই বটে; চালাঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া একটা চাটাই-এর উপর হাত পা ছড়িয়ে মড়ার মত পড়ে আছে নুলো। টুংরার মনটা যেন ভরে উঠলো এক পৈশাচিক আনন্দে, সর্ব্বাঙ্গ তার গুর গুর ক'রে কাঁপছে, উৎকট উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার ধমনীর রক্ত। হাতের টাঙ্গিখানা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে নুলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো টুংরা, নুলোকে সে মুক্তি দেবে আজ, ওর অভিশপ্ত জীবনের এইখানেই শেষ। আর একটু আলো—বিদ্যুতের আর একটা ঝিলিক, ব্যস্—একদম ফয়সা, লক্ষ্য প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছে টুংরা। টাঙ্গি

খানা দৃঢ় মুষ্টিতে উঁচিয়ে ধরে রুদ্ধশ্বাসে টুংরা যেন মুহূর্ত্ত গুণতে লাগলো। কালো মেঘের বুক ফুঁড়ে ঝিকমিক ক'রে উঠলো হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুত, নুলো মাঝির গলাটাকে লক্ষ্য ক'রে মারলে টুংরা এক কোপ। ঘুমের ঘোরেই অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো নুলো মাঝি, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কোপ, এক—দুই—তিন—উপর্য্যুপরি তিনটে কোপ; নুলো মাঝি সাবাড় হয়ে গেল, একেবারে শেষ।

নুলোকে কি অন্যায় ভাবে খুন করলে টুংরা? একি হত্যা? না—না—এ বিচার, টুংরা মাঝির বিচার। এই সঙ্গে দুলালীর মেয়েটাকেও হাতের কাছে পাওয়া গেলে মন্দ হতো না, ওটাকেও কোন রকমে সাবাড় ক'রে দিতে পারলে,—কিন্তু সে বুঝি আর হয় না, কুঁড়ের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বলে কেন?

নুলো মাঝির গোঙানির শব্দ পেয়ে কুঁড়ের মধ্যে জেগে উঠেছে দুলালী, ছাগল গুলোর হুটোপুটির শব্দ শুনে ঘুম তার আগেই ভেঙ্গে গেছে। নুলো হঠাৎ এমন ভাবে চাপা গলায় চীৎকার ক'রে উঠলো কেন! এত রাত্রে দুলালীর কুঁড়েয় এসে চোর-চণ্ডাল কেউ হানা দিলে নাকি? দুলালীর যেন কেমন একটা সন্দেহ হলো, দেশ্‌লাইয়ের কাঠি জেলে লম্ফটা তাই তাড়াতাড়ি সে ধরিয়ে নিলে, বার দিকটা একটু ঘুরে আসা দরকার।

কুঁড়ের মধ্যে আলো জ্বলে উঠতেই টুংরা মাঝি তাড়াতাড়ি সরে পড়লো, ধরা পড়লে চলবে না টুংরার, যেমন ক'রে হোক তাকে পালাতে হবে, বাঁচতে হবে টুংরা মাঝিকে।

লম্ফটা জেলে নিয়ে কুঁড়েঘরের আগুড় খুলে দুলালী এসে বাইরে দাঁড়ালো, কি ভয়ানক দুর্য্যোগ, আঁচল দিয়ে লম্ফটা কোন রকমে আড়াল ক'রে চালাঘরের দিকে এগিয়ে চললো দুলালী, গা-টা তার ছম্‌ছম

করছে। চালাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দুলালীর চোখ পড়লো হুলোর দিকে, দুলালী হঠাৎ আঁতকে উঠলো ভয়ে,—হুলো মাঝির গলাটা একেবারে দু'ফাঁক, রক্তের ঢেউ খেলছে মেঝের উপর, ধড় থেকে মাথাটা তার ছিটকে পড়েছে খানিক দূরে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য, দুলালীর দেহের রক্ত যেন হিম হয়ে আসছে, চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো দুলালী। কে এমন ভাবে খুন করলে হুলোকে? দুলালী কি করবে এখন? খুনেটা যদি হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ায়, দুলালীকেও সে খুন করবে নাকি? ভয়ে দুলালীর অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো, বুকের ভিতরটা দুর দুর ক'রে কাঁপছে। ঝড়ের বেগে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে দুলালী কাঁদরের ধারে ধারে, ভুট্টা ক্ষেতের রাখাদের কাছ থেকে যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায়। দমকা হাওয়ার ঝাপটা লেগে লম্ফটা গেল নিবে, অন্ধকারেই ছুটতে লাগলো দুলালী জগন মাঝির ভুট্টা ক্ষেত লক্ষ্য ক'রে, জোর গলায় সে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো,—জগন কাকা—জগন কাকা,—চোর—চোর!

মোহন মাঝি ওদিক থেকে এসে পৌঁছে গেছে দুলালীর কুঁড়ের প্রায় কাছাকাছি। কাঁদরের ধারে ধারে এগিয়ে আসছে মোহন উত্তর দিকে মুখ ক'রে, দুলালীর সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে। মেয়ে মানুষের চীৎকার শুনে মোহন একটু থমকে দাঁড়ালো, কে যেন [illegible] সামনে দিয়ে ছুটে আসছে, অন্ধকারে চেনা যায় না।

দুলালী আবার চীৎকার ক'রে উঠলো,—জগন কাকা—জগন কাকা,—চোর—চোর—খুনে—

মোহন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, ও যে দুলালী; গলার আওয়াজ শুনেই দুলালীকে চিনে ফেলেছে মোহন। কিন্তু দুলালী

এমন ভাবে চীৎকার করছে কেন, কোথায় চোর—কোথায় খুনে! মোহন মাঝি হঠাৎ যেন একটু ভ্যাকাচ্যাকা মেরে গেল।

অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে দুলালী প্রায় এসে পড়েছে মোহনের একেবারে সামনে। বাঁ-হাতি মোড় ফিরে ভুট্টা ক্ষেতের পাশে পাশে ছুটতে লাগলো দুলালী, ভয়ার্ত্তকণ্ঠে কেবলই সে ডাক দিতে লাগলো, —জগন কাকা—জগন কাকা!

দুলালীর পিছু পিছু হন্ হন্ ক'রে খানিকটা এগিয়ে গেল মোহন ভুট্টা ক্ষেতের সুঁড়ি পথ ধরে। দুলালী তখনও চীৎকার করছে।

পিছন দিক থেকে হঠাৎ ডাক দিলে মোহন,—দুলালী—দুলালী!

দুলালী ভয় পেয়ে আরও জোরে চীৎকার ক'রে উঠলো,—জগন কাকা—চোর—চোর—খুনে—

ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে দুলালীকে লক্ষ্য ক'রে প্রাণপণ শক্তিতে আবার চীৎকার ক'রে উঠলো মোহন,—দুলালী—দুলালী—ভয় নাই আমি, চোর ডাকাত খুনে আমি নই, দুলালী—দুলালী—!

দুলালী তখন পৌছে গেছে জগন মাঝির কুঁড়ের প্রায় কাছকাছি, প্রাণপণ শক্তিতে ডাক দিচ্ছে সে তখনো,—জগন কাকা—জগন কাকা!

জগন মাঝি কুঁড়ের ভিতর থেকে হাঁক দিলে একটা,—কে?

তাড়াতাড়ি লণ্ঠনের আলোটা জেলে ফেললে জগন মাঝি, দুলালী গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার কুঁড়ের সামনে। জগন মাঝি শশব্যস্তে বলে উঠলো,—কে রে, দুলালী নাকি, কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

দুলালীর মুখ দিয়ে কথা সরছে না, হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙ্গা গলায় আর একবার সে বলে উঠলো,—খুন—খুন!

জগন মাঝি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—খুন—কোথায় ?

কাঁদরের ধার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে দুলালী, সর্ব্বাঙ্গ তার অবশ হয়ে আসছে, জগন মাঝির কুঁড়ের সামনে হাত পা ছড়িয়ে দুলালী একেবারে লুটিয়ে পড়লো, ধীরে ধীরে চৈতন্য যেন ওর লোপ পেয়ে আসছে।

জগন মাঝি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলে না, অনুমানে সে এঁচে নিলে মারাত্মক রকমের একটা কিছু ঘটেছে। কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি ভুট্টা ক্ষেতের রাখাদের নাম ধরে জোরগলায় হাঁক দিতে লাগলো জগন মাঝি। দুলালীর সাড়া পেয়ে আগেই তারা জেগে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে একে একে সব জমা হতে লাগলো এসে জগন মাঝির কুঁড়ের সামনে। ওদেরি একজনকে লক্ষ্য ক'রে জগন মাঝি বলে উঠলো,—গাঁয়ে গিয়ে খবর দে—কাঁদরের ধারে খুন হয়েছে।

সকলেই হঠাৎ চমকে উঠলো একসঙ্গে, ছুটলো একজন রামপুরের সাঁওতালদের খবর দিতে। মহুল বাগানের ওদিকটায় আলো দেখা যাচ্ছে, গাঁ দিক থেকে কতকগুলো লোক হৈ-হৈ ক'রে ছুটে আসছে এই দিকেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই জগন মাঝির কুঁড়ের সামনে লোক জমে গেল বিস্তর। দুলালী এর মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। জগন মাঝি পাঁজা-কোলা ক'রে দুলালীকে শুইয়ে দিলে একটা খাটিয়ার উপর, কিছুক্ষণ তার মুখে চোখে জল দিয়ে হাওয়া করতেই দুলালী আবার চোখ মিলে তাকালো।

ভুট্টাক্ষেতের একপাশে দাঁড়িয়ে মোহন মাঝি দূর থেকে নিঃশব্দে চেয়ে আছে জগন মাঝির কুঁড়ের দিকে। দূর থেকে সে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে সবই, ব্যাপারটা কিন্তু কোন মতেই ঠাউরে উঠতে পারলে না

মোহন। চারিদিকে শুধু লোকজনের হাঁক ডাক, আরও কতকগুলো লোক লণ্ঠনের আলো আর তীর ধনুক লাঠি সোঁটা হাতে নিয়ে গাঁ দিক থেকে ছুটে আসছে। এ ভাবে কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়, কোন রকমে যদি ওরা মোহন মাঝির সন্ধান পায় —মোহনকে ওরা আস্ত রাখবে না।

কাঁদরের সুড়ি পথ ধরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মোহন আবার তাড়াতাড়ি সরে পড়লো। এ অবস্থায় দুলালীর সঙ্গে দেখা করা আর সম্ভব নয়, সময়ান্তরে সে চেষ্টা আবার করবে মোহন, দুলালীর সঙ্গে যেমন ক'রে হোক দেখা তাকে করতেই হবে। আথবাড়ীর মাথায় বে-ঘাটে কাঁদর পার হয়ে পাতাড়ির জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়লো মোহন। ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ এর মধ্যে কিছুটা কমে এসেছে।

রামপুরের প্রায় কুড়ি দেড়েক সাঁওতাল এসে জমা হয়েছে ভুট্টাক্ষেতের ধারে। দুলালীর কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল সকলেই। ন্থলো মাঝিকে হঠাৎ কে আজ খুন করতে আসবে ঘুরঘুট্টি এই অন্ধকার রাত্রে! চোর ডাকাতেরই বা সম্ভাবনা কোথায় দুলালীর ওই ভাঙ্গা কুঁড়েয়। অথচ ন্থলোর মত একটা জলজীয়ন্ত লোক হঠাৎ কিনা বেমালুম একেবারে খুন হয়ে গেল, আশ্চর্য্য! দুলালী ওদের ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছে, কুঁড়েয় তাকে ফিরে যেতে হবে।

সমাগত সকলেই অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জগন মাঝি তাড়া দিয়ে বললে,—চল্ তবে, আর দেরি কেনে, ব্যাপারটা দেখেই আসা যাক।

দুলালীকে সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে সব এগিয়ে চললো কাঁদরের দিকে। ভয়ের কোন কারণ নাই, তীর ধনুক লাঠি সোঁটা সবই তাদের সঙ্গে আছে, গোটা চারেক লণ্ঠনের আলো পর্য্যন্ত। দুলালীর কুঁড়ের কাছে

গিয়ে এক জায়গায় জমা হলো সব, সকলের মনেই কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। দুলালী চালাঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে দুলো মাঝির শোবার জায়গাটা দেখিয়ে দিলে। জন দুই তিন এগিয়ে গেল আলো নিয়ে, বাকি সকলেই তাদের পিছু পিছু চালাঘরের সামনে গিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। চালাঘরের সামনেই পড়ে আছে দুলো মাঝি গলা-কাটা অবস্থায়, কি ভয়ানক সে দৃশ্য! একই সঙ্গে অনেকগুলো লোক ভয় পেয়ে হঠাৎ চাপা গলায় অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে উঠলো, —ই-স্-স্— !

ভয়ে তাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লোকগুলো সব ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে দুলো মাঝির দিকে, এমন সময় কুঁড়ের মধ্যে দুলালী হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো, —আমার মেয়ে—আমার মেয়ে কোথায়, সুকুরমনি—সুকু—সুকু !

দুলালীর চীৎকার শুনে জন কয়েক গিয়ে হৈ হৈ ক'রে ঢুকে পড়লো কুঁড়ের মধ্যে, জগন মাঝি গিয়ে তাড়াতাড়ি দুলালীর সামনে দাঁড়ালো। দুলালী চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠে বললে,—জগন কাকা, সুকুরমনিকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; কুঁড়ের মধ্যে একলাটি সে ঘুমিয়েছিলো, ফিরে এসে আর যে তাকে দেখতে পাচ্ছি না জগনকাকা !

কি সর্ব্বনাশ, এযে আবার এক নতুন উপসর্গ, মেয়েটা হঠাৎ গেল কোথায় !

কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লো দুলালী, বুক চাপড়ে সে চীংকার ক'রে উঠলো,—সুকু—সুকু !

লণ্ঠনের আলো নিয়ে চারিদিক তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হলো, সুকুরমনির কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা ভয়ানক ঘোলাটে হয়ে উঠলো,—দুলো মাঝি খুন হয়ে পড়ে আছে চালা ঘরের

সামনে, কুঁড়ের মধ্যে দুলালীর ঘুমন্ত মেয়েটাকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, দুলালীর পিছু পিছু তাকে অন্ধকারে তাড়া ক'রে গিয়েছিলো কে একটা লোক, জগন মাঝির কুঁড়ের ধার পর্য্যন্ত। সম্ভবত সেই খুনেটাই, ধরতে পারলে দুলালীকেও হয়ত সে আজ শেষ ক'রেই ফেলতো। ব্যাপারটা আগাগোড়াই ঠিক যেন একটা ভৌতিক কাণ্ডের মত। কে এই খুনে? কি মতলবে সে দুলালীর কুঁড়েয় হঠাৎ এমন ভাবে হানা দিলে এসে? মনে মনে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে অতি মাত্রায়, ব্যাপারটা দেখে শুনে সব অবাক মেরে গেল, কারো মুখে রা-শব্দটি নাই। দুলালী শুধু বুক চাপড়ে চীৎকার করছে,—সুকু—আমার সুকু!

বার দুই তিন ডাক দেওয়া হয়েছে রাবণ মাঝিকে। কিছুক্ষণ পরে সর্দার রাবণ মাঝিও এসে পড়লো রামপুরের আরও কয়েকজন সাঁওতালকে সঙ্গে নিয়ে। দুলালীর মাও তার সঙ্গে এসেছে, কোন-রকমেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। মেয়েটাকে দেখতে না পেয়ে দুলালী ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, দুলালীর মা গিয়ে তার সামনে দাঁড়াতেই দুলালী একেবারে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকের মধ্যে, ফুঁপিয়ে সে আর একবার কেঁদে উঠলো,—সুকু—আমার সুকুরমনি!

দুলালীর মা দুলালীকে দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কুঁড়ের একপাশে বসে পড়লো, দেখাদেখি সেও হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লো কান্নায়, ওদের মা মেয়ের কান্নার রোল রাবণ মাঝির কানে গিয়ে বিঁধতে লাগলো যেন তীরের মত। রাবণ মাঝি ঈষৎ তর্জ্জন ক'রে বলে উঠলো,—আঃ—একটু আস্তে।

রাবণ মাঝিকে দেখে সকলেই যেন একটু ভরসা পেলে। জগন

মাঝি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠলো,—সদ্দার—সদ্দার!

সুখন মাঝি দু'হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি রাবণ মাঝির সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো,—সদ্দার!

রাবণ মাঝি একটু হাত তুলে ইসারায় তাদের আশ্বস্ত ক'রে বললে,—থাম্।

ব্যাপারটা ভাল রকম বুঝে উঠতেই আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল রাবণ মাঝির। আর একবার চারিদিক তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হলো, খুনে-ডাকাতের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, দুলালীর মেয়েটারও কোন হদিস নাই। রাবণ মাঝি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। এই খুনের ব্যাপার নিয়ে হয়ত ভয়ানক রকমের একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে, পাঁচজনে আবার কানাকানি করবে সাঁওতাল সর্দার রাবণ মাঝির পরিত্যক্তা মেয়েটার প্রসঙ্গ নিয়ে। তার উপর পুলিসের হাঙ্গামা—খুনখারাপির জবাবদিহি—এসব ত আছেই। কোন্ দিক আজ সামলাবে রাবণ মাঝি! বিপদ যখন আসে তখন চার দিক থেকে ঠিক এমনি ভাবেই আসে। কুঁড়ের বাইরে একটা ফাঁকা জায়গায় গম্ভীর ভাবে বসে পড়লো রাবণ মাঝি। রাত আর বেশি নাই, পূব আকাশে 'ভুলকো' তারা জল্ জল্ করছে। সুখন মাঝি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ালো, চাপাগলায় বলে উঠলো সুখন,—দুলো মাঝির লাসটাকে এইবেলা কোথাও সরিয়ে ফেললে হয় না সদ্দার?

রাবণ মাঝি জবাব দিলে,—সে আর হয় না, ওসব ক'রে লাভ নাই কোন।

জগন মাঝিও ওই ধরনেরি কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো, রাবণ মাঝির জবাব শুনে সে থমকে গেল হঠাৎ।

সকাল বেলা থানা থেকে পুলিস এসে হাজির হলো সদল বলে। হুলো মাঝির খুনের তদন্ত, জন দুই তিন কনেষ্টবল আর জন পাঁচ সাত চৌকিদার সঙ্গে নিয়ে তদন্ত করতে এসেছেন থানার বড় দারোগা নিজে। হুলো মাঝির খুনের ব্যাপারটা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে, বিশেষ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে কাছাকাছি সাঁওতাল পাড়া গুলোর মধ্যে, ভুলালীর কুঁড়ের সামনে লোক জমে গেছে বিস্তর। হুলো মাঝির বিকৃত মৃতদেহখানা কুঁড়ের পাশে একধারে পড়ে আছে চালাঘরের সামনে, সর্ব্বাঙ্গে তার পিঁপড়ে ধরে গেছে, ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিটকে একধারে পড়ে আছে খানিক দূরে, মুখখানার চেহারা অত্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠেছে।

ভুলালীর জবানবন্দি ও পাড়ার লোকের সাক্ষ্য-সাবুদ সংগ্রহ করতে বেলা হয়ে গেল অনেক খানা। হুলো মাঝির খুন সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এক এক ক'রে সরকারী খাতায় নোট করে নিলেন দারোগা বাবু। হুলো মাঝি বা ভুলালীর সঙ্গে কারো কোন আদোয়াতি ছিলো কি না সে সম্বন্ধেও খোঁজ খবর নেওয়া হলো যথেষ্ট, কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা ছিলো বলে কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। দারোগা বাবু গোড়া থেকেই যা সন্দেহ করেছিলেন সেই সন্দেহই তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠলো শেষ পর্য্যন্ত। হুলো মাঝিকে খুন ক'রে বাইরের লোকের লাভ কি? খুন হয়েছে সে তার নিজের পরিবারের হাতে, ভুলালী যেখেন নিজে তাকে খুন করেছে, দারোগা বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস। যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে হুলো মাঝির সঙ্গে ভুলালীর আন্তরিক হৃদ্যতা বা মনের মিল কোন দিনই ছিলো না, ভুলালীর পক্ষে সেটা কখনো সম্ভব বা স্বাভাবিকও নয়। হুলোর মত একটা অবাঞ্ছিত ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংসর্গ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য

দুলালী যে তাকে নিজের হাতে খুন করেনি এ কথা কেউ জোর ক'রে বলতে পারে কি? দুলালী যতই বলুক যে মুলো মাঝির খুনের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে সে কথা কিন্তু বিশ্বাস করা চলে না কোনমতেই। মুলো মাঝির এই খুনের সঙ্গে দুলালীর যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! আসল ব্যাপার দারোগা বাবু বহুক্ষণ আগেই অনুমানে এঁচে নিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার যদি কোন মূল্য থেকে থাকে তা হলে তাঁকে একথা আজ মানতেই হবে মুলো মাঝির হত্যাকারী তার পরিবার ছাড়া অপর কেউ আর হতে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রে দুলালী মেয়েন সম্পূর্ণ তার নিজের চেষ্টায় কিম্বা অপর কারো সহযোগিতায় মুলো মাঝিকে যে খুন করেছে সে সম্বন্ধে দারোগা বাবু নিঃসন্দেহ। দুলালী কিন্তু স্বীকার করতে চায় না একটি কথাও, ক্রিমিন্যাল মেণ্টালিটির এও একটা লক্ষণ। থানায় নিয়ে গিয়ে কড়া রকমের দুটো ধমক ধামক দিলেই আসামীর মুখ দিয়ে হুড় হুড় ক'রে আসল কথা বেরিয়ে পড়বে— দারোগা বাবুর জানা আছে, পুলিসের লোক এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। দারোগা বাবুকে বাধ্য হয়ে শেষ পর্য্যন্ত করতে হবে তাই, 'ক্লু' তাঁকে বের করতেই হবে।

মুলো মাঝির মৃত দেহ একটা গরুর গাড়ী ক'রে ময়না তদন্তের জন্য চালান দেওয়া হলো মহকুমায়। জন চারেক চৌকিদার পাশ পাহারা দিয়ে বল্লম হাতে হেঁটে চললো গরুর গাড়ীর পিছু পিছু, সঙ্গে তাদের কনেষ্টবল রামদীন পাঁড়ে। লাস চালানের ব্যবস্থা ক'রে দুলালীকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করা হলো মুলো মাঝির খুনের দায়ে। চারি দিকে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল, সকলের মনেই একই প্রশ্ন,—দুলালী কি সত্যি সত্যি মুলো মাঝিকে খুন করেছে?

দুলালী মেয়েন খুনী, সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও এ কথা যেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ।

রাবণ মাঝির মনের মধ্যে ঝড় বইছে,—মেয়ে তার খুনী আসামী? খুন কি সে সত্যিই করেছে? খুন হয়ত সে করেনি, এতবড় একটা দুঃসাহসিক কাজ দুলালীর মত মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। রাবণ মাঝির মন বলছে কখনই এ সম্ভব নয়, দুলালী এ কাজ করতে পারেনা—কিছুতেই না। কিন্তু পুলিসের লোক যে বিশ্বাস করতে চায় না ওর কোন কথাই, দুলালীকে ওরা ধরে নিয়ে যাবেই, আটকাতে পারবেনা রাবণ মাঝি। হতে পারে সে সাঁওতাল পাড়ার সর্দ্দার, পঞ্চগেরামীর মাথা, কিন্তু এই সব পুলিস পিয়াদার ব্যাপারে যে রাবণ মাঝির কোন হাত নাই। দুলালী আজ পুলিসের হাতে বন্দী, রাবণ মাঝি কি করতে পারে তার জন্য? কিছু না, কিছুমাত্র না।

হুলো মাঝির খুনের ব্যাপারে একটা লোককে সন্দেহ হয় রাবণ মাঝির, সে মোহন। মোহন মাঝি কলিয়ারি থেকে ফিরে এসেছে, চরণ মাঝি তার চক্ষুষ প্রমাণ। দুলালীকে আজো ভুলতে পারেনি মোহন, আজও হয়ত সে দুলালীকে ফিরে পেতে চায়; হুলো তাদের মিলনের পথে একমাত্র বাধা, তাই চুপি চুপি এসে হুলো মাঝিকে একেবারে শেষ ক'রে ফেলা মোহনের পক্ষে অসম্ভব নয়। এ কাজ মোহন মাঝির, সন্তর্পণে হুলো মাঝিকে খুন ক'রে চুপ চাপ সে সরে পড়েছে, রাবণ মাঝির দৃঢ় বিশ্বাস। দারোগা বাবুকে একান্তে ডেকে রাবণ মাঝি জানালে তার মনের কথা। হুলো মাঝিকে খুন ক'রে গেছে মোহন, এ সম্বন্ধে রাবণ মাঝি নিঃসন্দেহ। মোহন মাঝির নামে হুলিয়া বের ক'রে শিগ্‌গীর তাকে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করা দরকার, প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে পুলিসের লোককে সাহায্য করতে রাজি আছে রাবণ,

এ কথাও সে জানিয়ে দিলে দারোগা বাবুকে। দারোগা বাবু চুপ চাপ শুনে গেলেন রাবণ মাঝির বক্তব্য, ধীরে ধীরে তাঁর মুখ দিয়ে ফুটে উঠলো ঈষৎ একটা অবজ্ঞার হাসি, রাবণ মাঝির কোন কথাই তিনি গ্রাহ্য করলেন না, দারোগা বাবুর ভাবগতিক দেখে রাবণ মাঝি হতাশ হয়ে পড়লো।

জন তিনেক কনেষ্টবল আর কয়েকজন চৌকিদার মিলে দুলালীকে চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। খুনের তদন্ত শেষ ক'রে দারোগা বাবু হুকুম দিলেন,—আসামী চালাও।

দুলালী আর একবার কাতরকণ্ঠে বলে উঠলো,—খুন আমি করি নাই বাবু, সত্যি বলছি, খুন আমি করি নাই।

দুলালীর কোন কথাই শুনলে না পুলিসের লোক, দুলালীকে ওরা ধরে নিয়ে চললো থানায়; সেখান থেকে সদরে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। চারিদিকে আর একটিবার অতি করুণ ভাবে তাকালো দুলালী, চোখ দুটো তার ভরে উঠলো জলে। পুলিসের চোখে সে আজ অপরাধী, গুরুতর অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এতগুলো লোক—দুলালীর জানা চেনা এতগুলো সাঁওতাল—পাড়া ভেঙ্গে যারা দলে দলে এসে জমা হয়েছে দুলালীর কুঁড়ের সামনে,—এরাও কি সব পুলিসের কথা বিশ্বাস ক'রে? কেমন ক'রে বোঝাবে দুলালী যে সত্যই সে অপরাধী নয়। আজ তাকে পুলিসের হাতে এতখানা লাঞ্ছিত—এতখানা অপমানিত হতে হলো এতগুলো লোকের সামনে, কিন্তু কই—একটা কথাও ত কইলে না কেউ এ পর্য্যন্ত দুলালীর দিক হয়ে। এরা শুধু শাস্তি দিতেই জানে, এরা শুধু দুশমনি করতেই শিখেছে; দুলালীর অবস্থার জন্ত নেহাত দায়ী আজ এরা—দায়ী আজ সাঁওতালী সমাজ। কিন্তু কে করবে এদের বিচার? দুলালীকে

সর্ব্বহারা ক'রে—জীবনের সকল সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রে এতবড় একটা বিপদের মাঝখানে আজ যারা তাকে ঠেলে দিয়েছে, সেই সমাজ-চাঁইদের বিচার করুন ভগবান। কিন্তু এ আঘাত—এ দুঃখ্ কি সইতে পারবে দুলালী! দুলালী আজ খুনী আসামী, এ কথা যে স্বপ্নেও সে কোনদিন ভাবতে পারে নি।

পুলিসের লোকগুলোর সঙ্গে খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে দুলালী আবার থমকে একটু দাঁড়ালো, পা যেন তার এগোতে চায় না। কোথায় সে চলছে? সুকুরমনি আবার যদি ফিরে আসে তার ভাঙ্গা কুঁড়েয়! সে কি আর আসবে না? হয়ত সে আসবে, আবার হয়ত ফিরে এসে কুঁড়েঘরের আশে পাশে দুলালীকে সে খুঁজে বেড়াবে। ক্ষিদে পেলে যত্ন ক'রে খাওয়াবে কে তাকে, ঘুম পেলে কে তাকে কোলে ক'রে ঘুম পাড়াবে। দুলালীর ওই ভাঙ্গা কুঁড়ে কেমন ক'রে ছেড়ে যাবে দুলালী! কার যেন কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না? সুকুরমনি ফিরে এলো নাকি? তার কচি হাত দু'খানা বাড়িয়ে সে যে বার বার দুলালীকে পিছু ডাকছে।

থমকে একটু দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে কুঁড়ের দিকে আর একবার ফিরে তাকালো দুলালী। দুলালীর মা কুঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল দিয়ে কান্না জুড়েছে। দুলালীও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠলো সে,—সুকু—সুকু—আমার সুকুরমনি!

দুলালীর মা দুলালীর দিকে চেয়ে আর একবার কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে। রাবণ মাঝি কানে হাত চাপা দিয়ে কিষ্টু মাঝির দিকে চেয়ে বললে,—ওকে নিয়ে যা—ওকে তোরা ঘরে নিয়ে যা।

পুলিসের একজন কনেষ্টবল দুলালীকে তাড়া দিয়ে বললে,—চল্—চল্—আর ন্যাকামো করতে হবে না!

যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে চললো দুলালী পুলিসের তাড়ায়।

রাবণ মাঝি পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল। তারই চোখের উপর দিয়ে মেয়েকে তার অপমান করতে করতে ধরে নিয়ে গেল পুলিসের লোক, কোন প্রতিকার করতে পারলে না রাবণ মাঝি। দুলালীকে ওরা জামিনে পর্য্যন্ত খালাস দিতে রাজি হলো না, দুলালী যে আজ খুনী মামলার আসামী। কি ভয়ানক কথা! রাবণ মাঝির বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিতে লাগলো; হতভাগী মেয়েটাকে বাঁচাবার কি কোন উপায় নাই?

সুখন মাঝি ধীরে ধীরে রাবণ মাঝির সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখচোখ তার লাল হয়ে উঠেছে, রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো সুখন,—দুলালীকে ওরা ধরে নিয়ে গেল সর্দ্দার!

রাবণ মাঝির সারা অন্তর মথিত ক'রে বাতাসের বুকে ঝরে পড়লো একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস। হতাশভাবে বলে উঠলো রাবণ,—উপায় নাই, কোন উপায় নাই।

সমবেত জনতা চঞ্চল হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায়। সর্দ্দার রাবণ মাঝির হুকুম পেলে এখনো তারা পুলিসের হাত থেকে জোর ক'রে দুলালীকে ছিনিয়ে আনতে পারে। রাবণ মাঝি তাদের এ প্রস্তাবে সায় দিতে পারলে না, বিক্ষুব্ধ জনতা বহুকষ্টে উত্তেজনা দমন ক'রে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরলো। মাতালের মত টলতে টলতে মহুল বাগানের সুড়ি পথ ধরে এগিয়ে চললো রাবণ মাঝি, পা যেন তার বাড়ীর দিকে এগোতে চায় না। মেয়েটাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল, কোন ব্যবস্থা করতে পারলে না রাবণ মাঝি। কোন্ মুখে সে বাড়ী গিয়ে ঢুকবে! মেয়েটা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বানের জলে ভেসে গেল। রাবণ মাঝি তার উপর সুবিচার করেছে কি? সমাজের মুখ চেয়ে কি মর্ম্মান্তিক আঘাতই না

হেনেছে সে দুলালীর বুকে। জীবন দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে রাবণ মাঝিকে, সে দিন হয়ত কাছিয়ে আসছে। কিন্তু তার আগে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে মেয়েটাকে, যেমন ক'রে হোক তাকে বাঁচতেই হবে। রাবণ মাঝির যথা সর্ব্বস্ব দু'হাত দিয়ে সে ছড়িয়ে দিয়ে আসবে ধূলো মাটির মত, তবু যদি—তবু যদি মেয়েটাকে কোন রকমে বাঁচাতে পারা যায়। সে চেষ্টা যে করতেই হবে রাবণ মাঝিকে।

বাড়ীর দিকে মুখ করে হাঁটতে হাঁটতে মহুল বাগানের মাঝামাঝি গিয়ে থমকে দাঁড়ালো রাবণ। বাঁ-হাতি মুখ ফিরিয়ে আর একটিবার সে উত্তরদিক পানে তাকালো, দুলালী তখন দৃষ্টির বাইরে, পুলিসের লোকগুলোকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। রাবণ মাঝি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সুখন মাঝির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে একবার তাকালো, সুখনের দিকে চেয়ে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো রাবণ, —দুলালীকে নিয়ে ওরা চলে গেল সুখন?

সুখন মাঝি জবাব দিলে,—বহুক্ষণ চলে গেছে সদ্দার, এতক্ষণ ওরা কাটিজঙ্গল পার হয়ে গেল।

রাবণ মাঝির চোখের সামনে দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। হঠাৎ তার দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা জল। সুখন মাঝিরও চোখ দুটো ভরে উঠেছে জলে, রাবণ মাঝির ডান হাতটা চেপে ধরে ভাঙ্গাগলায় সে বলে উঠলো,—ঘরে চল্ সদ্দার।

আরও কয়েক পা হেঁটে যেতেই হাঁপিয়ে উঠলো যেন রাবণ মাঝি, ধপ্ ক'রে একটা গাছের নীচে সে বসে পড়লো। সুখন মাঝি ব্যস্তভাবে বলে উঠলো,—সদ্দার!

রাবণ মাঝির কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে; উদাস ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে উঠলো,—একটু বসি, এই গাছতলায় একটু বসি।

রাবণ মাঝির চোখে জল! অতি করুণ ভাবে সর্দার রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠলো সুখন,—সর্দার, তুই কাঁদছিস?

রাবণ মাঝি দু'হাত দিয়ে বুক খানাকে চেপে ধ'রে বললে,—কই না—সর্দার রাবণ মাঝি ত কাঁদে না, রাবণ মাঝির বুকখানা যে পাথর দিয়ে গড়া।

কি যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগলো রাবণ মাঝি। একটা পর্ব্বতের চূড়া খান খান হয়ে বুঝি ভেঙ্গে পড়তে চায়। রাবণ মাঝির চোখ দুটো ছেপে হয়ত বা তার অজ্ঞাতেই শ্রাবণের ধারার মত নেমে এলো অশ্রুর পাথার।

কাপড়ের খুঁট দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে ফেললে রাবণ মাঝি।

বাম্বো

দায়রা জজের আদালত। চাঞ্চল্যকর এক খুনের মামলার আসামী একটি সাঁওতালের মেয়ে। আদালতে ভিড় আজ একটু অস্বাভাবিক রকমের, শহর এবং শহরতলির বহু লোক এসে জমা হয়েছে মামলার বিচার শুনবার জন্য। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই সাঁওতাল, শহরের প্রায় লাগালাগি পাহাড়তলির সাঁওতাল-পল্লীর অধিবাসী এরা। দূর থেকেও অনেকেই আজ বিচার শুনতে এসেছে, দুলালীর আজ মামলার দিন। জজসাহেবের আদালত থৈ থৈ করছে লোকের ভিড়ে, বিচার-কক্ষ নিস্তব্ধ, চারিদিকে চাপা একটা গম্ভীর ভাব। আসামীর কাঠগড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দুলালী মেঝেন, অভিযোগ তার বিরুদ্ধে গুরুতর, তার দ্বিতীয় পক্ষের সাঙাকরা স্বামী মুংলো মাঝিকে সে খুন করেছে।

সরকার পক্ষ থেকে আসামীর বিরুদ্ধে নৃশংস নরহত্যার যে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে তা সপ্রমাণ করবার জন্য বারো জন সরকারী সাক্ষী আদালতে উপস্থিত আছে। আসামীর অপরাধ প্রমাণ করবার ভার সরকারের, সে ব্যবস্থা যথারীতি করা হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে। একে একে সাক্ষীদের ডাক হতে লাগলো। সুদক্ষ সরকারী উকিল মামলার দরকারী ফাইল ও মোটা মোটা আইনের পুঁথি পত্র নিয়ে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে আছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী দুলালী মেঝেন আন্তরিক বীতশ্রদ্ধা ও উৎকট বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে অহেতুক আক্রোশ বশতঃ তার ন্যায় সঙ্গত ও আইন সম্মত বিবাহিত স্বামী সুলো মাঝিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে। আইনের চোখে এ অপরাধের গুরুত্ব যে কতখানি, সরকারী উকিল বাবু মামলা সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক বিবৃতি প্রসঙ্গে মাননীয় জুরি মহোদয়গণের নিকট তথা বিজ্ঞ বিচারপতি শ্রদ্ধেয় জজসাহেব মহোদয় সমীপে গোড়াতেই তা বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন। সাক্ষীদের এজাহারে ক্রমশই প্রকাশ পেতে লাগলো সুলো মাঝির সঙ্গে দুলালীর বনিবনা ছিলো না মোটেই, সুলোকে সে কোনদিনই ভাল চোখে দেখে নি; সুলো ছিলো দুলালীর জীবনে যেন মূর্ত্তিমান এক বিড়ম্বনা, সুখের পথে কণ্টক। ন্যায় ধর্ম্মত সুলো মাঝি যদিও ছিলো দুলালীর স্বামী, তথাপি সে স্বামীত্বের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলো, পারিবারিক জীবনে দুলালী তাকে সুখ দেয় নি একটি দিনের জন্য। সরকারী উকিলের পরিচালনায় সাক্ষীদের জবানবন্দি থেকে মামলা সংক্রান্ত যে সকল তথ্য একে একে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগলো দুলালীর পক্ষে তার কোনটাই অনুকূল নয়। উকিল বাবু ঘটনার পারিপার্শ্বিক থেকে এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন—সুলো মাঝির হত্যাকারী দুলালী ছাড়া অপর কেউ আর

হতে পারে না। স্থানীয় সাক্ষীদের এজাহারে স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে গেছে ঝুলো মাঝিকে দুলালী বরাবর ঘৃণা করতো, ঝুলোকে সে কতদিন বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছে গলাধাক্কা দিয়ে। ঝুলো মাঝিকে তাড়াবার জন্য, ঝুলোর হাত থেকে একেবারে অব্যাহতি পাবার জন্য ঢের আগে থেকেই চেষ্টা ক'রে আসছিলো দুলালী মেঝেন; অপর কোন সহজ পন্থায় তা সম্ভব হয় নি, তাই পথের কাঁটা সে উপড়ে ফেলেছে ঝুলো মাঝিকে একেবারে শেষ ক'রে দিয়ে। ব্যাপারটা আকস্মিক নয়— পরিকল্পিত; সাময়িক উত্তেজনার অভিব্যক্তি নয়, ডেলিবারেট মার্ডার। আসামীর দ্বারা আদৌ এ কাজ সম্ভব কি না সে বিষয়ে বিচারকদের মনে গোড়াতেই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, সরকারী উকিল বাবু তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ সাক্ষীদের জবানবন্দি থেকে ঘটনার পরিস্থিতি ও আসামীর মনোভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই তা যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। সর্দ্দার রাবণ মাঝি ও সমাজের অন্যান্য শুভানুধ্যায়িগণ আসামীকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলো স্বচ্ছন্দ ও সুসংযত পারিবারিক জীবন যাপনের। কলিয়ারি থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার পর দুলালীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তাই ঝুলো মাঝির সঙ্গে। আসামী দুলালী মেঝেন মনে মনে কিন্তু এ ব্যবস্থাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারেনি, অপরাধ-প্রবণ তার উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি তাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে। ঘটনার পারিপার্শ্বিক ও সাক্ষীদের জবানবন্দি আসামীকে একবাক্যে দোষী বলেই সাব্যস্ত করে, সরকারী উকিল বাবুর অকাট্য যুক্তিজাল এই সিদ্ধান্তকেই অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে মামলার সুরু থেকেই।

দুলালী নির্ব্বাক। আসামীর কাঠগড়া থেকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে চেয়ে আছে বিচারকের দিকে। দর্শকদের চোখে রহস্য যেন ক্রমশই ঘনিয়ে উঠতে লাগলো। আসামীর পক্ষে মামলার তদ্বির করছে

রাবণ মাঝি নিজে। জবরদস্ত উকিল দিয়েছে সে মোটা টাকা খরচ ক'রে। সরকারী উকিলের সঙ্গে সমান তালে তিনি সওয়াল জবাব ক'রে যাচ্ছেন আসামীর পক্ষ নিয়ে। কিন্তু আসামী যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এ কথা প্রমাণ করবার জন্য নির্ভর যোগ্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করতে পারেনি রাবণ মাঝি, শুধু উকিলের তর্কযুক্তি ও আইনের মারপ্যাচ শেষ পর্য্যন্ত আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত ক'রে বে-কসুর খালাস দিতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে রাবণ মাঝি কোন মতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে না।

সরকারী সাক্ষীদের এজাহার শেষ হতেই বিচক্ষণ বিচারক আসামীর দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার কিছু বলবার আছে ?

দুলালী কি জবাব দেবে ? কি তার বলবার আছে তাও ত সে জানে না। যে কথা সে বলতে চায় তা কি এরা বিশ্বাস করবে ? তার মত কোন লক্ষণই যে দেখতে পাচ্ছে না দুলালী। দুলালীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার জন্য কি বিরাট ব্যবস্থাই না করা হয়েছে, এ সব যে দুলালীর ধারণার বাইরে। নুলো মাঝিকে খুন করেছে বলে দুলালীকে এরা সন্দেহ করে, কি আশ্চর্য্য ! কিন্তু খুন ত সে করেনি, দুলালীর হয়ে কে আজ এদের বুঝিয়ে দেবে যে নুলো মাঝির হত্যাকারী অপর কেউ, দুলালী মেঝেন নয়। এরা সব একসঙ্গে জোট পাকিয়ে দুলালীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, দুলালীকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিতে পারলে এরা যেন বাঁচে। কিন্তু ধর্ম্ম—মাথার উপর ধর্ম্ম কি নাই, ভগবান—মারাং বুরু—সে কি আজো আছে ? মুক্তির এতটুকু আলো দুলালী যে খুঁজে পাচ্ছে না গভীর এই অন্ধকারের মধ্যে। বিচারকদের কেমন ক'রে সে বোঝাবে তার মনের কথা, সে কথা কি ওরা বুঝবে ?

দুলালী নিরুত্তর। আসামীর বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে সংক্ষেপে তা আর এক দফা উল্লেখ করে বিজ্ঞ বিচারপতি পুনরায় দুলালীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?

দুলালীর চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো, মুখ দিয়ে তার কথা সরছে না, জজ সাহেবের দিকে চেয়ে ভাঙ্গাগলায় কোন রকমে সে বলে উঠলো,—খুন আমি করি নাই হুজুর, আমি কিছু জানি না; ধর্ম্ম বলছি, আমি কিছু জানি না।

রাবণ মাঝির বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। মামলার সাতদিন আগে থেকে গাঁ ছেড়ে সে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে শহরে, মেয়েটাকে যদি কোন রকমে সে বাঁচাতে পারে। রাবণ মাঝির মন বলছে দুলালী একাজ করে নি, একাজ সে করতে পারে না। দুলো মাঝিকে খুন করেছে মোহন—নিশ্চয়ই মোহন, এ বিষয়ে রাবণ মাঝির মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। দুলালীর মোহ কোন মতেই কাটাতে পারেনি সে শয়তান, দুলো মাঝিকে তাই রাতারাতি খুন ক'রে চুপচাপ সে সরে পড়েছে। পুলিসের লোকের কাছে মোহন মাঝির নাম পর্য্যন্ত বাতলে দিয়েছিলো রাবণ মাঝি, কিন্তু কৈ—সে শয়তান ত ধরা পড়লো না, খুনের দায়ে এরা ধরে নিয়ে এলো দুলালীকে। দুলালীর জীবনে কি কুগ্রহই না জুটেছিলো ওই মোহন মাঝি, কি দুশমনিই না করেছে সে রাবণ মাঝির সঙ্গে। একটি বার যদি তার দেখা পেতো রাবণ—পারতো যদি সে মোহন মাঝিকে ধরে এনে কোন রকমে একবার আদালতে হাজির ক'রে দিতে—রাবণ মাঝির মনটা অনেক হালকা হয়ে যেতো, দুলালী হয়ত বেঁচে যেতো খুনের দায় থেকে। কিন্তু সে আর হয় না, সে শয়তান পালিয়েছে—শাস্তির ভয়ে সে পালিয়েছে।

রাবণ মাঝির কপালের রেখাগুলো ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, জল্ জল্ ক'রে জলে উঠলো তার চোখ দুটো; একবার—কোন রকমে একবার যদি সে নাগাল পেতো মোহন মাঝির! কিন্তু মেয়েটা যে কাঁদে, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঝাঁদেপড়া পাখীর মত হতাশভাবে সে চেয়ে আছে হাকিমের দিকে,—খুন আমি করি নাই হুজুর—খুন আমি করি নাই।

ওরা কি শুনছে? দুলালীর কথা কি ওরা মন দিয়ে শুনছে?

রাবণ মাঝির বুকের শিরাগুলোয় কে যেন মোচড় দিয়ে টানতে লাগলো। খুন আমি করি নাই হুজুর—কি করুণ, কি মর্মান্তিক। রাবণ মাঝির জরাজীর্ণ বুকখানা ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে না, এও এক আশ্চর্য্য!

পাথরের মূর্ত্তির মত শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কাঠগড়ার দিকে চেয়ে আছে রাবণ মাঝি, করবার তার কিছু নাই, টস্ টস্ ক'রে কয়েক ফোঁটা জল নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো রাবণ মাঝির চোখ দুটো ছেপে।

সুখন মাঝি পাশ থেকে মৃদু একটা নাড়া দিয়ে বলে উঠলো, —সর্দ্দার!

কিষ্টু মাঝি একটু সাহস দিয়ে বললে,—কোন চিন্তা নাই সর্দ্দার, তুই এত ভাবনা করিস না।

রাবণ মাঝি আবার সজাগ হয়ে উঠলো। বিচারের শেষ পর্য্যন্ত না দেখে সে হতাশ হবে না, হতাশ হলে যে চলবে না তার; ধৈর্য্য তাকে রাখতেই হবে।

রাবণ মাঝির কয়েকজন প্রতিবেশী তার সঙ্গে এসেছে। সর্দ্দার রাবণ মাঝিকে কোন রকমেই এরা মুসড়ে পড়তে দেয়নি, বরাবর তাকে ভরসা দিয়ে যাচ্ছে—মেয়েটা হয়ত খালাস পেয়ে যাবে। ভালুকপোতার

টুয়াই মাঝি পর্য্যন্ত লোকজন সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসেছে আজ রাবণ মাঝির সঙ্গে। সমাজের মুখ চেয়ে সর্দ্দার রাবণ মাঝির মেয়ের সম্বন্ধে যত কঠোর ব্যবস্থাই এরা ক'রে থাক না কেন, এতবড় একটা খুনের মামলায় মেয়েটার সাজা হয়ে যাক, এটা কিন্তু কারো অভিপ্রেত নয়। ঘটনার পাকচক্রে যে সঙ্গীন অবস্থার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে আজ দুলালীকে, তার মূলে প্রত্যক্ষ যে কারণই থাক—সাঁওতালী সমাজের কঠোর ব্যবস্থা যে কিছুটা অন্ততঃ এর জন্য দায়ী একথা আজ কোন মতেই অস্বীকার করতে পারছে না টুয়াই মাঝি। বিচার তারা ঠিকই করেছিলো, কিন্তু তবু শাস্তিটা আর একটু হালকা ক'রে নিলেও সমাজের হয়ত বিশেষ কোন্ ক্ষতি হতো না। কোন রকম দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিতে সেদিন কিন্তু রাজি হয়নি টুয়াই মাঝি, দুলো মাঝির সঙ্গে তাই দুলালীর বিয়ে দিতে রাবণ মাঝি বাধ্য হয়েছিলো। ফল কিন্তু এর কোন দিক থেকেই ভাল হলো না, কেমন ক'রে যে কোন্ দিক দিয়ে হঠাৎ কি সব কাণ্ড ঘটে গেল,—হতভাগী মেয়েটাকে শেষ পর্য্যন্ত পড়তে হলো খুনের দায়ে। টুংরাটা বিবাগী হয়ে গেল,—ওরি জন্যে বিবাগী হয়ে গেল, দুলোর সঙ্গে দুলালীর বিয়ে দেওয়ার পর হঠাৎ একদিন মনের খেদে দেশান্তরী হয়ে গেল টুংরা। কোথায় যে সে গেল—কোন পাত্তাই আর পাওয়া গেল না। রাবণ মাঝির মেয়েটাকে ভালবাসতো টুংরা, টুয়াই মাঝি কিন্তু সে ভালবাসার এতটুকু মূল্য দেয়নি। এইখানে কি টুয়াই মাঝি একটু ভুল করেছে? জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বৃদ্ধ টুয়াই মাঝি কি হঠাৎ ভুল ক'রে বসলো? না —না—সে সম্ভব নয়, যা করা হয়েছে, বিলকুল সব ঠিকই হয়েছে। এর জন্য টুয়াই মাঝির যত ক্ষতিই হোক টুয়াইকে তা সয়ে নিতে হবে, কোন উপায় নাই। কিন্তু হতভাগী মেয়েটার মুখের দিকে যে চাইতে

পারছে না টুয়াই মাঝি, আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াতে হলো মেয়েটাকে! হে ভগবান, একেই টুংরা ভালবেসেছিলো! কিন্তু ওটাকে বাঁচাবার কোন শক্তিই নাই যে আজ টুয়াই মাঝির হাতে। এর জন্য যদি টুয়াই মাঝিকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হয়? পারবে কি— পারবে কি টুয়াই মাঝি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দুলালীর হয়ে সাফাই সাক্ষী দিতে? না—না—তা হয়ত সে পারবে না, জীবনে যে কোনদিন মিথ্যে কথা বলে নি টুয়াই; সে হয় না। কিন্তু টুয়াই মাঝি কোন মতেই ভেবে পাচ্ছে না খুনী মামলার একটা আসামীর জন্যে হঠাৎ তার আজ এ দুর্ব্বলতা কেন! মেয়েটা কি যাদু জানে? ওর চোখে মুখে যাদু, ওর সর্ব্বাঙ্গে যাদু, টুংরাকে ও যাদু করেছিলো; আজ হয়ত টুয়াই মাঝিকেও—বৃদ্ধ টুয়াই মাঝিকে পর্য্যন্ত যাদু ক'রে ফেলেছে ওই যাদুকরীটা।

রাবণ মাঝির পাশে দাঁড়িয়ে দুলালীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে টুয়াই। মেয়েটা যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে ভয়ে। বলবার মত কোন ভাষাই সে খুঁজে পাচ্ছে না, আদালতকে বোঝাবার তার কিছু নাই; অতি করুণভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধু দুটি কথাই সে বলে যেতে লাগলো,—আমি কিছু জানি না হুজুর, ধর্ম্ম বলছি, আমি কিছু জানি না।

চঞ্চল হয়ে উঠলো আবার রাবণ মাঝি, টুয়াই মাঝির ডান হাতটা চেপে ধরে চাপাগলায় সে বলে উঠলো,—উস্তাজ!

টুয়াই মাঝি সাড়া দিলে,—সদ্দার!

ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—আমি জানি উস্তাজ, দুলোকে কে খুন করেছে, আমি জানি।

টুয়াই মাঝি চাপাগলায় বললে,—একটু আস্তে।

সুখন আর কিছু মাঝি মিলে ধীরে ধীরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো রাবণ মাঝিকে। রাবণ মাঝি একটু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো,—আমি তাকে জানি যে, সে শয়তানকে আমি চিনি—খুব ভাল ক'রে চিনি।

সরকারী উকিলের বক্তৃতা আরম্ভ হয়েছে। চাপা একটা গুঞ্জন উঠলো আদালতের এক প্রান্তে, কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টার তাকালেন একবার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, জজ সাহেবের আরদালী রাবণ মাঝির সামনে গিয়ে বলে উঠলো,—এই মাঝি,—গোলমাল কিসের, চুপচাপ বস ওইখানে।

রাবণ মাঝির সঙ্গীরা তাকে তাড়াতাড়ি সামলে নিলে, চুপচাপ সে একপাশে বসে পড়লো। মনের মধ্যে ঝড় বইছে রাবণ মাঝির, গুরগুর ক'রে কাঁপছে তার সর্ব্বাঙ্গ। এরা ত কই ভুলেও একবার মোহন মাঝির নাম করলে না! বিচার এরা করবে কেমন ক'রে, আসল যে আসামী তাকে যে এরা ধরতেই পারে নি। সে পালিয়েছে, পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে দেশ ছেড়ে সে পালিয়েছে।

মোহনের সম্বন্ধে রাবণ মাঝির যে ধারণাই হোক, মোহন মাঝি কিন্তু পালায়নিশ বহুকষ্টে আত্মগোপন ক'রে সাঁওতাল পরগণার এই অঞ্চলেই পাগলের মত সে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাস ছয়েকের উপর। খুনের মামলায় দুলালী আজ আসামী, পুলিস তাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এসেছে, মামলার সুরু থেকে এ পর্য্যন্ত সব কিছুই যে খবর রেখেছে মোহন। সাহস ক'রে সে বাইরে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি, চারিদিকে তার শত্রু, মোহনকে তাই বাধ্য হয়ে একটু আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়েছে। পালাতে সে পারেনি কোনমতেই, দুলালীকে এ অবস্থায় একা ফেলে সে যাবে কোথায়! যদি যেতে হয়—দুলালীকে সে সঙ্গে নিয়েই যাবে। কিন্তু সে সুযোগ কি পাবে মোহন? মামলায় যদি দুলালীর

সোজা হয়ে যায়—সে আঘাত যে তীরের মত লাগবে এসে মোহন মাঝির বুকে, মোহন হয়ত সইতে পারবে না। সুকুরমনি গেছে, মোহনের সেই সুকু—বড় সাধের, বড় আদরের সুকু, দুলালীর কুঁড়ে থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল মেয়েটা। মোহন মাঝির পক্ষে এ যে একটা কত বড় আঘাত—জানেন তার অন্তর্যামী। এরপর যদি দুলালীকেও হারাতে হয়—পাগল হয়ে যাবে মোহন মাঝি, শেষ পর্য্যন্ত সে পাগল হয়ে যাবে। একটা মাত্র পথ এখনো খোলা আছে মোহন মাঝির সামনে, চেষ্টা করলে দুলালীকে হয়ত সে বাঁচাতে পারে। গভীর হতাশার গহীন অন্ধকার ঠেলে ক্ষীণ একটা আলোর আভাস মাঝে মাঝে আলেয়ার মত জ্বলে উঠে মোহনকে যেন পথ দেখাচ্ছে, চেষ্টা করলে এখনো হয়ত দুলালীকে সে বাঁচাতে পারে।

জজ সাহেবের আদালতে লোকের ভিড়ে চুপচাপ এসে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মোহন। দূর থেকে সে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে সবই। আসামীর কাঠগড়ায় দুলালী, চোরের মত সর্ব্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে; দূর থেকে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে মোহন। দশজনের সামনে নিজেকে যেন প্রকাশ করতে কোন মতেই সে ভরসা পাচ্ছে না। মোহন মাঝির মন বলছে,—এগিয়ে যা ভীরু—এগিয়ে যা, কাঠগড়া থেকে দুলালীকে সরিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে দাঁড়া এই আদালতের সামনে; দুলালীর সকল দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে পারিস যদি প্রকাশ্য এই আদালতে মুক্তকণ্ঠে প্রচার ক'রে দে,—ঘুলো মাঝিকে খুন করেছি আমি। দুলালী বাঁচুক, বেঁচে যাক সে খুনের দায় থেকে।

মোহন মাঝি তাই করবে, বাঁচাতেই হবে দুলালীকে, এ ছাড়া আর পথ নাই। জান যদি দিতে হয় মোহন মাঝিকে তাও মোহন দেবে, আপসোস নাই। মোহনের বুকটা তবু দুর দুর ক'রে কাঁপছে কেন,

ভয়? কিসের জেল, ফাঁসি, দীপান্তর? কিন্তু মরতে ত সে প্রস্তুত, তবে আর ভয় কিসের? এ ভয় মোহনকে জয় করতে হবে, যেমন ক'রে হোক জয় করতে হবে।

সাক্ষীদের এজাহার শেষ হয়ে গেছে, বক্তৃতা চলছে সরকারী উকিলের। মামলার কাজ ক্রমশঃ এগিয়ে চললো সমাপ্তির দিকে। দুলালীর এই খুনের মামলা এ অঞ্চলে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে, বিশেষ ক'রে সাঁওতালদের মধ্যে। আদালতে আজ ভিড় একটু বেশি। তীরন্দাজ টুংরা মাঝি পর্য্যন্ত খবর পেয়ে গেছে দেহাতের সাঁওতালদের মুখে, পুলিস গিয়ে নাকি দুলালীকে ধরে নিয়ে এসেছে দুলো মাঝির খুনের দায়ে, সহরের আদালতে মামলা চলছে দুলালীর বিরুদ্ধে। এ যে ভয়ানক গোলমেলে কথা, ঠিক যেন একটা হেঁয়ালির মত। টুংরাকে তাই বহুদূর থেকে ছুটে আসতে হলো, ব্যাপারটা ভাল ক'রে জানতে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, খুনের দায়ে ওরা দুলালীকে ধরে নিয়ে এলো কেন, মামলা ওদের চলবে কেমন ক'রে!

সহরের রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চলেছে টুংরা। পায়ে তার এক হাঁটু লাল ধুলো। টুংরাকে দেখে হঠাৎ যেন চেনা যায় না। মুখে তার এক মুখ দাড়ি জমেছে, উস্কো খুস্কো একমাথা রুক্ষ চুল, আঙুলের ডগা ছেপে নখগুলো তার বেড়ে উঠেছে ভালুকের নখের মত। চোখ একটা কানা হয়ে গেছে টুংরার, সে অনেক দিনই গেছে। কাঁড় ধেনুক কাঁধে ফেলে, প্রকাণ্ড একটা ঝোলায় ক'রে কতকগুলো জিনিস পত্র পিঠে ঝুলিয়ে তার একমাত্র প্রিয়সঙ্গী ঝাবড়ুর গলার শিকলটা ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চললো টুংরা। ভয়ানক তার দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আদালতে পৌছে বটগাছের শিকড়ে ভালুকটাকে বেঁধে দিয়ে খুঁজে খুঁজে জজসাহেবের আদালতে গিয়ে হাজির হলো টুংরা। সরকারী

উকিলের বক্তৃতা চলছে পুরোদমে, পুলিস পাহারার মাঝখানে কাঠগড়ার উপর শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে দুলালী। বারান্দার এক পাশে চুপচাপ ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো টুংরা, কান খাড়া ক'রে সে উকিল বাবুর বক্তৃতা শুনতে লাগলো। কিন্তু দুলালীকে এরা অনর্থক কষ্ট ক'রে ধরে নিয়ে এলো কেন, টুংরার কাছে এ যেন একটা হেঁয়ালি। দূর থেকে সে চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সরকারী উকিল মামলার সুরু থেকে আরম্ভ করে ঘটনার আদ্যোপান্ত আর একদফা বিশদভাবে আলোচনা ক'রে গেলেন জুরি বাবুদের সামনে। সরকারী সাক্ষীদের এজাহার, ডাক্তারের রিপোর্ট, ভার প্রাপ্ত দারোগার তদন্তের ফলাফল ও তাঁর জবানবন্দি এবং যে অবস্থায় ও যে পরিবেশের মধ্যে থেকে খুন হয়েছে মুলো মাঝি, সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা ক'রে আসামীর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে হবে বিচারকদের। আসামীর অপরাধ যদি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে থাকে, আইনের চোখে শাস্তি তার অপরিহার্য্য। এ ক্ষেত্রে শুধু বিচার ক'রে দেখতে হবে সরকার পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আদালতের সামনে উপস্থিত করেছেন—নিঃসন্দেহে তা প্রমাণ হয়েছে কিনা। প্রমাণ যদি হয়ে থাকে—জুরিমহোদয়গণ পেনাল কোডের নির্দ্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী আসামীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করবেন। প্রমাণ যদি হয়নি বলে তাঁরা মনে করেন, আসামী তা হলে আইনের চোখে নির্দ্দোষ। আসামীর সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করবার কালীন মাত্র দু'টি শব্দ তাঁরা ব্যবহার করবেন,—দোষী, কি নির্দ্দোষ ; গিল্টি, অর নট গিল্টি।

জজসাহেবের পাশে জুরিমহোদয়গণ রীতিমত সজাগ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে ধীরে ধীরে যেন ফুটে উঠতে

লাগলো সক্রিয় মস্তিষ্কের সুতীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি প্রসূত দৃপ্ত একটা পরিণতির আভাস,—দোষী, কি নির্দ্দোষ ; গিল্টি, অর নট গিল্টি ?

সরকারী উকিল বাবু পুনরায় বলে যেতে লাগলেন,—জেন্ট্‌ল মেন অব্ দি জুরি, আর একটা কথা আমি বিশেষ ভাবে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আসামীকে আপনারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলে ধরে নিয়েই আপনাদের বিচার বুদ্ধিকে সব সময়ই পরিচালিত করবেন শুধু মামলা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর সূত্র ধরে। আসামী দুলালী মেঝেনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও খুঁটি নাটি তথ্যগুলি একে একে আপনাদের সামনে ধরা হয়েছে, একমাত্র তারই উপর নির্ভর ক'রে এ মামলার বিচার করতে হবে। কোন কারণে যদি আপনাদের মনে কিছু মাত্র সন্দেহ জাগে তা হলে ধরে নিতে হবে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হয়নি, এবং সে ক্ষেত্রে আপনারা আসামীকে নির্দ্দোষ বলে খালাস দিতে পারেন। কিন্তু দয়া ক'রে সব সময়ই এ কথাটা স্মরণ রাখবেন যে ভিত্তিহীন সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে আসামীর দোষগুণ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। আপনাদের যে সন্দেহ তা হবে সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত ও যথোচিত কারণ সঙ্গত, সরকারী আইনের সংজ্ঞায় যাকে বলে রিজনেব্‌ল ডাউট। আমি আশা করি আপনাদের ভার্‌ডিক্ট্ সম্বন্ধে আপনারা একমত হবার চেষ্টা করবেন। আপনারা শুধু সংক্ষেপে মতামত ব্যক্ত ক'রে জানাবেন,—আসামী দোষী, কি নির্দ্দোষ।

মামলার সঙ্গীন মুহূর্ত্ত কাছিয়ে আসছে। নিস্তব্ধ বিচার কক্ষের আবহাওয়া যেন অতিমাত্রায় ভারী হয়ে উঠেছে সমবেত শ্রোতৃবর্গের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসের চাপে। কারো মুখে সাড়া শব্দ নাই, সকলের মনেই ব্যাপক ভাবে যেন জেগে উঠেছে ওই একটি মাত্র প্রশ্ন,—আসামী দোষী, কি নির্দ্দোষ ?

সর্দ্দার রাবণ মাঝি রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে আদালতের দিকে। কান াড়া ক'রে সে শুনে যেতে লাগলো সরকারী উকিলের শেষ দিকের থাগুলো,—আসামী দোষী, কি নির্দ্দোষ। এরা যদি একসঙ্গে াসামীকে দোষী বলে রায় দিয়ে দেয়, তা হলে যে দুলালীকে বাঁচাবার ার কোন উপায় থাকবে না। এরা যে সব দল পাকিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে াজ দুলালীর বিরুদ্ধে, এদের কারো ইচ্ছা নয় যে মেয়েটা বাঁচুক। রাবণ াঝি টুয়াই মাঝিকে হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলো,—উস্তাজ!

রাবণ মাঝির মুখের দিকে শুধু করুণভাবে তাকালো একবার য়াই মাঝি।

মনে মনে বেশ বুঝতে পেরেছে দুলালী কি সাংঘাতিক অবস্থার ামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। দুলালীর চোখের উপর যেন বলির াড়্গা নাচছে। হাকিমের দিকে চেয়ে ভাঙ্গাগলায় সে হঠাৎ একবার ীৎকার ক'রে উঠলো,—হুজুর!

জজসাহেব তাকালেন একবার দুলালীর দিকে, বললেন,—কিছু লতে চাও?

দুলালী কাতর কণ্ঠে আর একবার বলে উঠলো,—খুন আমি রি নাই হুজুর।

মূল্যহীন অহেতুক কাকুতি, যুক্তিহীন ব্যর্থ আবেদন, জজসাহেব ীরে ধীরে মুখ ফেরালেন।

মোহন মাঝির মনের মধ্যে যেন ঝড় বইছে। দুলালীকে বাঁচাতে লে সময় যে আর নাই। এই বেলা গিয়ে মোহন মাঝি ধরা দিয়ে দবে নাকি? মোহনের হাতপাগুলো কিন্তু থর থর ক'রে কাঁপছে, এগিয়ে যেতে যে ভয় করছে মোহনের; ধরা দিতে সে পারছে না কান মতেই।

গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠলো মোহন মাঝি। তবে কি সে পালাবে, হাকিমের রায় বেরোবার আগেই চুপি চুপি সে পালাবে? না—না—সে ত সম্ভব নয়, তার চেয়ে যে ধরা দেওয়া অনেক ভাল, মোহন মাঝি ধরাই দেবে।

নিজের মনেই কি ভাবতে ভাবতে আদালতের সামনের দিকে ধীরে ধীরে কয়েক পা এগিয়ে গেল মোহন, এদিক ওদিক একটুখানি তাকালো, তারপর সে হঠাৎ কি মনে ক'রে থমকে একটু দাঁড়ালো আবার বারান্দার এক পাশে। গায়ের চাদরখানা ঝেড়েঝুড়ে মাথার দিকে একটুখানি টেনে দিয়ে মুখটা আর একটু ঢেকে নিলে মোহন। করুণভাবে তাকালো সে আর একবার দুলালীর দিকে।

ওপাশ থেকে রাবণ মাঝি লক্ষ্য করেছে—এপাশের বারান্দায় কে একটা লোক সর্ব্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে সন্ত্রস্তভাবে চলা ফেরা করছে, দেখতে ঠিক মোহন মাঝির মত। মুখের কাপড়খানা তার একটুখানি সরে যেতেই লোকটাকে হঠাৎ চিনে ফেললে রাবণ। সর্দ্দার রাবণ মাঝির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চাপাগলায় সে ডাক দিলে একটা,—সুখন!

সুখন মাঝি সাড়া দিবার আগেই রাবণ মাঝি তার হাত ধরে টানতে টানতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—ইদিকে একটু উঠে আয় দেখি।

সুখন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হলো রাবণ মাঝি ওপাশের বারান্দায়। চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটার ডান হাতটা হঠাৎ চেপে ধরে মুখের কাপড়টা তার সরিয়ে দিলে রাবণ মাঝি। সুখন মাঝি চেয়ে দেখে মোহন, সঙ্গে সঙ্গে সে চেপে ধরলে তার বাঁ হাতখানা। রাবণ মাঝি দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো,—শয়তান, আর তুমি পালাবে কোথায়!

মোহন মাঝি কেমন যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, হঠাৎ তার মুখ দিয়ে একটি কথাও সরলো না। সুখন মাঝির দিকে চেয়ে গর্জ্জিত কণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—ধরে নিয়ে চল্ একে হাকিমের কাছে।

রাবণ মাঝি আর সুখন মাঝি মিলে হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে ধরে নিয়ে চললো মোহন মাঝিকে আদালতের সামনে। যন্ত্রচালিতের মত টলতে টলতে এগিয়ে চললো মোহন, বাধা দেবার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই তার, কি যেন এক অজানা আশঙ্কায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো মোহন মাঝি। সুখন মাঝি তাকে ঠেলতে ঠেলতে সামনের দিকে দিলে একটা ধাক্কা।

সমাগত দর্শকদের মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। সরকারী উকিলের বক্তৃতা চলছে, অনর্গল তিনি বলে যাচ্ছেন,—অপরাধ যদি প্রমাণ হয়ে থাকে, আসামীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। ভুলে যাবেন না আপনারা—কতখানি জিঘাংসার বশবর্ত্তী হয়ে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে মুলো মাঝিকে। কল্পনা করুন অপনারা সেই ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য, মনে করুন আপনাদের চোখের সামনে কুপিয়ে কুপিয়ে লোকটাকে হত্যা করা হচ্ছে। মাননীয় জুরি মহোদয়গণ—

বাইরের দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল। উকিল বাবু বলে যেতে লাগলেন,—মাননীয় জুরি মহোদয়গণ, সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্টই দেওয়া হয়েছে, আপনারা এখন বিবেচনা করুন, প্রকাশ্য এই ধর্ম্মাধিকরণে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত ক'রে বলুন আপনারা,—আসামী দোষী, কি নির্দ্দোষ ?

মোহন মাঝিকে টেনে হিঁচড়ে আদালতের প্রায় সামনেটায় এনে ফেলেছে ওরা। ভিড়ের মধ্যে একটা হৈ-চৈ বেধে গেল তুমুল। রাবণ মাঝি দূর থেকে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো,—হুজুর !

কোর্ট ইনস্‌পেক্টার ভিতর থেকে বলে উঠলেন,—অর্ডার—অর্ডার।

মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুর সামনের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন,—হোয়াট্‌স্‌ দি ম্যাটার—কি হলো আবার ?

একজন কনেষ্টবল তাড়াতাড়ি রাবণ মাঝির সামনে গিয়ে একটা ধমক দিয়ে বললে,—কিয়া হ্যায় ?

রাবণ মাঝি চীৎকার ক'রে বলে উঠলো,—হুজুর, খুনী আসামী ধরা পড়েছে।

চকিতে একটা সোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে। মোহন মাঝিকে টানতে টানতে রাবণ মাঝি দাঁড়ালো এসে দরজার সামনে। জজসাহেব একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—হু ইজ্‌ থ্যাট্‌ হ্যাড়াম হড় ?

সরকারী উকিল বলে উঠলেম,—পাগল।

কোর্টবাবু একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন,—নিকালো—নিকালো হিঁয়াসে।

রাবণ মাঝি হাকিমের দিকে চেয়ে আর একবার চীৎকার ক'রে উঠলো,—হুজুর !

জজসাহেব বলে উঠলেন,—এলাও হিম্‌—এলাও হিম্‌ টু কাম ইন প্লিজ্‌,—আসতে দিন।

মোহন মাঝিকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে আদালতের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলে রাবণ মাঝি। হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো মোহন।

আদালত শুদ্ধ লোক বিস্মিতভাবে চেয়ে আছে মোহনের দিকে। টুংরা মাঝি দূর থেকে লক্ষ্য করছে, দেখে শুনে অবাক মেরে গেছে টুংরা; মোহন মাঝিকে ওরা টেনে হিঁচড়ে ধরে নিয়ে এলো কেন হঠাৎ! কাঠগড়ায় দাড়িয়ে দুলালী একবার চমকে উঠলো মোহন মাঝিকে দেখে।

হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—হুজুর, এই লোকটাই খুন করেছে দুলো মাঝিকে, আমি জানি—নিঘ্যাত এ খুন করেছে, এই তোদের ফেরার আসামী।

জজসাহেব ও জুরিবাবুগণ অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। সরকারী উকিল বাবু একটু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন,—এ তুই কি বলছিস মাঝি, কে এ লোকটা?

সর্দ্দার রাবণ মাঝির চোখ দুটো যেন দপ্ ক'রে জলে উঠলো একবার, ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—শয়তান—এ একটা শয়তান।

আসামী পক্ষের উকিল জজসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন,—ইওর অনার, ব্যাপারটা মিষ্টিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে।

বিজ্ঞ বিচারপতি একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—লোকটার নাম?

সর্দ্দার রাবণ মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—মোহন মাঝি, সাকিন ঘুসরুকাটা; নামটা ওর লেখে লে হুজুর, এরি নাম মোহন টুডু।

মোহন মাঝি, নামটা যেন সকলেরি চেনা, সাক্ষীদের জবানবন্দির মধ্যে মোহন মাঝির নাম কয়েক বারই শোনা গেছে। এরি সঙ্গে দুলালী মেঝেন গৃহত্যাগ ক'রেছিলো, কিন্তু বর্ত্তমান মামলার সঙ্গে মোহন মাঝির সম্পর্ক কি? রাবণ মাঝি লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে ধরে এনে এর মধ্যে জড়াতে চায় কেন! সকলের কাছেই ব্যাপারটা যেন একটা হেঁয়ালির মত হয়ে উঠলো। বিজ্ঞ বিচারপতি তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন একবার মোহন মাঝির দিকে। রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—তোরা একে কবুল করা হুজুর, যেমন ক'রে হোক কবুল করা।

গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন জজসাহেব,—আসামী দুলালী মেঝেনের বিরুদ্ধে আদালতে যে মামলা চলছে সে সম্বন্ধে তুই কিছু জানিস মাঝি?

মোহন মাঝি মনে মনে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বললে,—জানি হুজুর, ফুলো মাঝিকে আমি চিনতুন, দা দিয়ে কুপিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে।

সকলেই বিস্মিতভাবে তাকালো একবার মোহন মাঝির দিকে। জজসাহেব পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন,—কে—কে তাকে খুন করেছে তুই বলতে পারিস ?

দুলালীর করুণ মুখখানা আর একবার ভেসে উঠলো মোহন মাঝির মনের পর্দায়। আসামীর কাঠগোড়ায় সে দাঁড়িয়ে, মোহনের ঠিক পিছনে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জজসাহেবকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো মোহন,—আমি—আমি তাকে খুন করেছি, আসামীর কোন অপরাধ নাই হুজুর, ফুলো মাঝিকে খুন করেছি আমি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সচকিত হয়ে উঠলো সকলেই। ভিড়ের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো টুংরা। মোহন মাঝি বলে কি, কি তার মতলব, সে কি দুলালীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে ? কিন্তু কেন—কোন্ অধিকারে ; দুলালীর সে কে ?

সরকারী উকিল বাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—ইওর অনার, লোকটা অন্যায়ভাবে আসামীকে ডিফেণ্ড করবার চেষ্টা করছে।

আসামী পক্ষের উকিল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,—ইওর অনার, মোহন মাঝির পূর্ণ বিবৃতি অনুগ্রহ ক'রে লিপিবদ্ধ করা হোক।

সরকারী উকিলের দিকে চেয়ে পুনরায় বলে উঠলেন তিনি,—আর সেই সঙ্গে আমি এ কথাও নিবেদন করছি,—আমার অভিজ্ঞ বন্ধু সরকারী উকিল মহাশয়-যেন দয়া ক'রে এ বিষয়ে কোন বাধার সৃষ্টি না করেন।

মোহন মাঝি সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠলো,—আমাকে তোরা কয়েদ কর হুজুর—তোরা আমাকে শাস্তি দে, ফুলো মাঝিকে আমি খুন করেছি, নিজের হাতে আমি তাকে খুন করেছি।

দুলালী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। হঠাৎ সে একবার আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো,—হুজুর!

জজসাহেব আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মোহন মাঝিকে,—ফুলো মাঝিকে যে তুই খুন করেছিস—তার প্রমান? তার সঙ্গে সম্বন্ধ কি তোর?

মোহন মাঝি জবাব দিলে,—হুজুর, সে ছিলো আমার পরম শত্রু। আমার পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুলো মাঝি তাকে সাঙা করেছিলো। রাগ আমি সামলাতে পারি নাই হুজুর, খাদ তরফ থেকে ফিরে এসে ফুলোকে একদিন রাত্তির বেলা চুপি চুপি আমি শেষ ক'রে দিয়েছি।

ব্যাপারটা অসম্ভব নয়, সকলের মনেই গভীর একটা সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠলো। টুংরা মাঝি কিন্তু অবাক মেরে গেছে মোহন মাঝির শয়তানি দেখে। দুলালীকে বাঁচাবার সে কে? সে অধিকার যদি কারো থাকে—সে টুংরার, মোহন মাঝির নয়।

জজসাহেব বাহাদুর মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন যথেষ্ট, ব্যাপারটা অসম্ভব নাও হতে পারে, মোহন মাঝিকে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, —ফুলো মাঝিকে কোন্ অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে তুই বলতে পারিস?

মোহন মাঝি বলে উঠলো,—দা দিয়ে আমি তাকে খুন করেছি হুজুর।

অসহ্য হয়ে উঠলো টুংরা মাঝির, দূর থেকে সে চীৎকার ক'রে উঠলো,—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা!

প্রকাণ্ড একটা বোচকা পিঠে ঝুলিয়ে আদালতের সামনে দিকে এগিয়ে চললো টুংরা। কনেষ্টবল গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াতেই টুংরা তাকে পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে জজ সাহেবের সামনে। আদালতকে শুনিয়ে ক্ষিপ্রকণ্ঠে আবার বলে উঠলো টুংরা,—মিথ্যে কথা—বিলকুল ওর মিথ্যে কথা হুজুর, দা দিয়ে ফুলো মাঝিকে খুন করা হয় নাই, খুন করা হয়েছে তাকে টাঙ্গি দিয়ে।

আকস্মিক একটা চাঞ্চল্যের ধাক্কায় আলোড়িত হয়ে উঠলো যেন সমগ্র বিচার-কক্ষ। এক মুখ দাড়ি, এক মাথা রুক্ষ চুল, কাঁধে একটা কাঁড় ধনুক, পিঠে বোচকা—কে এই অদ্ভুত ধরণের কানা লোকটা? সকলেই একদৃষ্টে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে টুংরার দিকে। টুয়াই মাঝি দূর থেকে টুংরাকে দেখেই হঠাৎ চমকে উঠলো।

জজ সাহেব টুংরাকে দেখে বলে উঠলেন,—কে তুই?

টুংরা জবাব দিলে,—কে আবার—আমি টুংরা, ভালুকপোতার টুংরা মাঝি।

—কি চাস এখানে?

জজ সাহেব প্রশ্ন করলেন।

টুংরা মাঝি বলে উঠলো,—চাই না আমি কিছুই, আমি শুধু বলতে চাই যে এই লোকটা মিথ্যেবাদী। টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে সুলো মাঝিকে খুন করলুম আমি, আর ও বলে কিনা দা দিয়ে; বিলকুল ওর মিথ্যে কথা হুজুর।

সকলেরি বিস্ময়ের মাত্রা যেন শেষ সীমা ছাপিয়ে উঠেছে। পরস্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে দিয়ে এত বড় একটা দায়িত্বের মধ্যে নিজেকে এরা এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলতে চায় কেন,—আশ্চর্য্য!

বিজ্ঞ বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন টুংরা মাঝিকে,—সুলোকে যে তুই খুন করেছিস—এর কোন প্রমাণ আছে?

ঘাড় থেকে ঝোলাটা নামিয়ে তার ভিতর থেকে একখানা টাঙ্গি বের ক'রে হাকিমের সামনে ধরলে টুংরা, বললে,—বাঘ মেরে আমি এই টাঙ্গি তোদের কাছ থেকে বকশিশ পেয়েছিলুম, চিনে দেখ ঠিক সেই টাঙ্গি কিনা; এই দিয়েই আমি সুলো মাঝিকে খুন করেছি। সুলো মাঝির রক্তের দাগ আজো লেগে আছে টাঙ্গিতে, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।

জজসাহেব কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টারের দিকে চেয়ে বললেন,—টাঙ্গিখানা কেমিক্যাল এক্‌জামিনেশনের জন্য রাখা হোক।

টুংরার হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গি খানা কেড়ে নেওয়া হলো।

টুয়াই মাঝি হতবাক, সে হাসবে, না কাঁদবে? ছেলেটার কিন্তু সাহস আছে,—সত্য কথা বলবার সাহস আছে। টুংরার দিকে বিহ্বলভাবে চেয়ে অস্ফুট স্বরে হঠাৎ নিজের মনেই একবার বলে উঠলো টুয়াই মাঝি,—সাবাস বেটা,—সাবাস!

ফোরম্যান অব্‌ দি জুরি জজসাহেবের দিকে চেয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—লোকটাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি হুজুর?

জজসাহেব ঘাড় নেড়ে বললেন,—স্বচ্ছন্দে।

ফোরম্যান প্রশ্ন করলেন টুংরা মাঝিকে,—মুলো মাঝির সঙ্গে আগে থেকে তোর কি কোন বিবাদ ছিলো মাঝি?

টুংরা জবাব দিলে,—আগে আমি ওকে চিনতুমই না, দুলালীকে বিয়ে করতে গিয়েই লোকটা আমার হাতে মারা পড়ে গেল। দুলালীকে আমি ভালবাসতুম হুজুর, মুলোকে তাই বরদাস্ত করতে পারিনি আমি কোন মতেই। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এক ঝড়েলীর রাত, কাঁদরের ধারে ধারে টাঙ্গি হাতে উঠলুম গিয়ে দুলালীর কুঁড়ের সামনে; নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে তখন মুলো মাঝি চালাঘরে পড়ে, চুপি চুপি ঐ টাঙ্গি দিয়ে দিলুম বেটার গলাটাকে একেবারে দু-ফাঁক ক'রে।

রাবণ মাঝি অবাক মেরে গেছে। মুলো মাঝিকে খুন করেছে টুংরা, না মোহন মাঝি? পাগলাটা হঠাৎ বলে কি!

জজসাহেব টুংরার জবানবন্দি নোট ক'রে যাচ্ছেন। টুংরা মাঝি বলে যেতে লাগলো;—দুলালীর মেয়েটাকেও সেদিন খুন ক'রে ফেলতুম হুজুর, কিন্তু পারলুম না, ওটা যে ভয়ানক কচি,—কোন মতেই পারলুম না।

জজসাহেব টেবিলের উপর কলমটা নামিয়ে রেখে তু... জিজ্ঞাসা করলেন,—সে মেয়ে কোথায়, তুই বলতে পারিস?

টুংরা নিঃসঙ্কোচে বলে উঠলো,—কেনে পারবো না হুজুর, আ... ওকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছি সেই রাত্রেই, সেই থেকে ও বরাবর অ... সঙ্গেই আছে। বাইরে আমি ওকে বসিয়ে রেখে এসেছি, নিয়ে আসবো?

জজসাহেব তাকালেন একবার কোর্ট-বাবুর দিকে। উপযুক্ত পুলিস-পাহারায় টুংরা মাঝিকে বাইরে যেতে দেওয়া হলো। আদালতের বটগাছের ছায়ায় দুলালীর মেয়েটা তখন ঝাবড়ুর সঙ্গে খেলা করছে। সামনে টুংরা গিয়ে ভালুকটার পাশে পিঠের বোচকাটা নামিয়ে রেখে সুকুরমনিকে ঘাড়ে ক'রে তক্ষুনি গিয়ে হাজির হলো আবার জজসাহেবের সামনে।

দুলালী কি স্বপ্ন দেখছে? কাঠগড়ার কাঠাড় ধরে দুলালী হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো,—সুকু—সুকু—আমার সুকু!

থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে দুলালীর অবশ অঙ্গ এলিয়ে পড়লো হঠাৎ কাঠগড়ার উপর। রাবণ মাঝি গিয়ে তাড়াতাড়ি দুলালীকে ধরে ফেললে। মোহন মাঝি টুংরার কাছ থেকে মেয়েটাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দুলালীর বুকে গুঁজে দিলে। সুকুরমনিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ডুকরে একবার কেঁদে উঠলো দুলালী। মোহন মাঝি ঘাড় নীচু ক'রে কাঠগড়ার পাশে দাঁড়ালো, চোখ দু... তার ভরে উঠলো জলে। রাবণ মাঝি রুদ্ধশ্বাসে বুকখানাকে চেপে ধরে একটুখানি সরে দাঁড়ালো। পিছন ফিরে হঠাৎ তাকালো একবার টুংরা মাঝি কাঠগড়ার দিকে; দুলালী খুব বেঁচে গেছে আজ—ভয়ানক বেঁচে গেছে; ভালই হয়েছে।

সর্দ্দার রাবণ মাঝি কি জেগে আছে, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে! বুকটা যেন তার অনেকখানা হালকা হয়ে গেল, মেয়ে তার হলো

খুন করে নি,—টুংরা মাঝি প্রমাণ। বিচারকদের সামনে এগিয়ে গিয়ে রাবণ মাঝি হাত জোড় ক'রে ভারীগলায় বলে

তোদের রায়টা একবার শুনিয়ে দে হুজুর, মন খুলে একবার তোরা বুঝছিস,—আসামী দুলালী মেঝেন দোষী, কি নির্দ্দোষ?

জজসাহেব প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন একবার জুরি বাবুদের দিকে। জুরি মহোদয়গণ একসঙ্গে বলে উঠলেন,—নির্দ্দোষ—নির্দ্দোষ।

ঢং ঢং করে আদালতের ঘড়িতে চারটে বাজলো। জজসাহেব হাদুর কাঠগড়ার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন,—আসামী দুলালী মেঝেন কসুর খালাস।

উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবাহে রাবণ মাঝির চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠলো, ষ্টি তাঁর ঝাপসা হয়ে আসছে।

জজসাহেব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, যাবার আগে সামনের দিকে য়ে তিনি বলে উঠলেন,—টুংরা মাঝিকে গ্রেপ্তার করা হলো।

কোর্ট বাবুর ইঙ্গিতে আদালতের সেপাই এসে টুংরার হাতে হাত ড়া লাগিয়ে দিলে। কোমরে তার দড়ি বেঁধে আর একজন তাকে ক্ত করে টেনে ধরলে পিছন দিক থেকে।

আদালতের কাজ শেষ। বিচার-কক্ষ খালি হয়ে গেল দু'এক মিনিটের ধ্যই। দুলালীকে সঙ্গে নিয়ে মোহন গিয়ে বাইরে দাঁড়ালো।

টুংরাকে হাতকড়া দিয়ে হাজত-থানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিসের াক। বৃদ্ধ টুয়াই মাঝির চোখ দুটো যেন ফেটে যাচ্ছে, হঠাৎ যেন র বত্রিশ নাড়িতে পাক দিয়ে উঠলো। টুংরাকে ওরা জেলে দেবে, ন কেন ফাঁসি—ফাঁসি কাঠে হয়ত লটকে দেবে টুংরাকে; তারপর শেষ—তীরন্দাজ টুংরা মাঝি একেবারেই শেষ। টুয়াই মাঝি ভাবতে পারছে না, টুংরাকে যে ফেরাবার আর কোন উপায়

নাই। করুণ ভাবে টুংরার দিকে চেয়ে বৃদ্ধ টুয়াই মাঝি আজও হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো,—টুংরা—টুংরা !

রাবণ মাঝি তাড়াতাড়ি গিয়ে টুয়াই মাঝির সামনে দাঁড়ালে উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলো টুয়াই,—সদ্দার—সদ্দার—টুংরাকে ওরা নিয়ে গেল; জেল—ফাঁসি—দ্বীপান্তর,—কালাপানি—কালাপানি, টু

অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফলে আদালতের বারান্দায় মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লো টুয়াই মাঝি। রাবণ মাঝি চাদরের খুঁট দিয়ে টুয়াই মাঝিকে হাওয়া করতে করতে তার কানের কাছে ডাক দিতে লাগলো। —উস্তাদ—উস্তাদ !

টুংরা মাঝি বন্দী অবস্থায় হেঁটে চলেছে পুলিস পাহারার মাঝখানে। দেওয়ানী অদালতে আরদালীর হাঁক চলছে তখনো,—রাজারাম মাহাতো হাজি—র,—রাজারাম মাহা—তো— !

টুংরা হঠাৎ তাকালো একবার পিছন ফিরে। মোহন আর দুলালী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার ঠিক সামনে, একদৃষ্টে ওরা করুণ ভাবে চেয়ে আছে টুংরার দিকে। থাক—এও ভাল, এর বেশি আর চায় কি টুংরা ! কিন্তু দুলালী যদি একটু হাসতো,—টুংরার দিকে চেয়ে একটি বার শুধু একটুখানি হাসতো !

টুংরা এগিয়ে চললো। প্রকাণ্ড বটগাছটার সামনে গিয়ে থমকে একটু দাঁড়ালো টুংরা। বট গাছের শিকড়ের সঙ্গে লোহার চেন দিয়ে বাঁধা ভালুকটার দিকে চোখ পড়তেই টুংরার চোখ দুটো যেন ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো ; অতি করুণ ভাবে একটা ডাক দিলে টুংরা,—ঝাবড়ু !

আদালতের সেপাই পিছন দিক থেকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, —চলো।